কাশগড়
কতো-না অশ্রুজল
মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন

এটি কাশগড় কতো না অশ্রুজল বইয়ের অফিশিয়াল পিডিএফ। বাজারে মোটামুটি চাহিদা থাকার পরেও বই প্রকাশের প্রায় দেড় বছরের মাথায় বইটির পিডিএফ উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ ।

উইঘুর মুসলিমদের উপর চীন শতাব্দীর ভয়াবহতম গনহত্যা চালাচ্ছে। কিন্তু পুরো বিশ্ব এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করছে। এমন অবস্থায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আল্লাহর ইচ্ছায় আগ্রাসী চীনের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন ও উইঘুর মুসলিমদের মুক্তির ব্যাপারে কিছুটা হলেও সচেতনতা সৃষ্টি করবে এই আশা রাখি।

এই পিডিএফ একেবারে ফ্রি না। এর জন্য কিছু মূল্য দিতে হবে। তবে সেটা টাকা পয়সা না। পিডিএফ ডাওনলোড করে ফেলে রাখবেন না। আপনি এই পিডিএফটি নিজে পড়বেন, আরও অন্তত ১০ জনকে পড়াবেন এবং উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরির কার্যক্রম হাতে নেবেন- এটাই এ পিডিএফের মূল্য!

পিডিএফ প্রকাশের প্রস্তাব দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাওয়ায় Ilmhouse Publication কে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ। আল্লাহ্ তাঁদের কাজগুলো কবুল করে নিক। আমীন।

উইঘুর মুসলিমদের জন্য এবং এই বইয়ের সাথে জড়িত সকলের জন্য দুয়ার দরখাস্ত রইল।

ওয়াস সালাম,

মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন

রমাদান,৭, ১৪৪৩ হিজরী।

কাশগড়

কতো-না অশ্রুজল

কাশগড়

কতো-না অশ্রুজল

মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন

সম্পাদনা

আসিফ আদনান

উৎসর্গ...

বরফে জমে মারা যাওয়া দুই বছরের রহমাতুল্লাহ শিরবাকি

‘...শীঘ্রই মানুষ তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য একে অন্যকে আহ্বান করবে,
যেভাবে মানুষ খাবার খাওয়ার জন্য একে অন্যকে আহ্বান করে।’

‘তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হব?’

‘না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত;
কিন্তু তোমরা হবে সমুদ্রের ফেনার মতো হবে...
আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন
আর তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দেবেন।’

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল-ওয়াহ্হান কী?

‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।’

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

জেনোসাইড বা গণহত্যা কী?

জাতিসংঘের জেনোসাইড কনভেনশন (The Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide) অনুযায়ী, জেনোসাইড হল–

কোন নির্দিষ্ট জাতি, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে চালানো কার্যক্রম।

এই সংজ্ঞানুযায়ী জেনোসাইডের ৫টি বৈশিষ্ট্য আছে –

ক) হত্যা।

খ) গুরুতর শারীরিক কিংবা মানসিক ক্ষতিসাধন।

গ) জীবনযাত্রার ওপর এমন কোন শর্তারোপ যা ঐ গোষ্ঠীকে ধ্বংস কিংবা বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাবে।

ঘ) উক্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রজনন ও জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ ও বাধাগ্রস্ত করা।

ঙ) উক্ত গোষ্ঠীর শিশুদের জোরপূর্বক অন্য কোন গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেয়া।

ওপরের কোন একটি বৈশিষ্ট্য থাকলেই সেটা জেনোসাইড বা গণহত্যা বলে বিবেচিত হবে। উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীন সরকারের চালানো ধ্বংসযজ্ঞে ওপরের সবগুলো

বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুরদের ওপর চীনা যুলুমের ইতিহাস অনেক পুরনো। এ আগ্রাসনের সর্বশেষ অধ্যায়ও চলছে কমসেকম ৭০ বছর ধরে। কিন্তু গত চার-পাঁচ বছরে নতুন মাত্রা পেয়েছে এই আগ্রাসন। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ উইঘুর ও কাযাখ মুসলিমকে। সবচেয়ে রক্ষণাত্মক হিসেব অনুযায়ী ক্যাম্পে বন্দীর সংখ্যা দশ লক্ষ। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে গত কয়েক বছরে বন্দীর মোট সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশি[১]।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতন, ধর্ষণ আর মগজধোলাইয়ের শিকার হচ্ছে বন্দীরা। বন্দীদের বাধ্য করা হচ্ছে মুসলিম-উইঘুর পরিচয় এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করতে, পাশাপাশি সমাজতন্ত্র, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের স্তুতি গাইতে। রীতিমতো নিয়ম করে প্রতিদিন কাল্পনিক অপরাধের স্বীকারোক্তি আর প্রশংসা সঙ্গীত আওড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে বন্দীদের।

যারা তুলনামূলক ভাগ্যবান, তাদের শ্রমদাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে। উইঘুরদের রক্ত আর অশ্রু মাখা শ্রমে তৈরি হচ্ছে নাইকি, অ্যাপল, অ্যাডিডাস, ক্যালভিন ক্লাইন, গ্যাপ, ফক্সওয়াগ্যানের মতো বিশ্ববিখ্যাত অসংখ্য কোম্পানীর ঝা চকচকে পণ্য।

বাকিদের শিকার হতে হচ্ছে ইলেকট্রিক শক, ওয়াটারবোর্ডিং, 'টাইগার চেয়ার', স্ট্রেস পযিশানসহ নানা ধরণের নির্যাতনের। ব্যাপক মাত্রায় চলছে যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ। চালানো হচ্ছে বিভিন্ন মেডিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। দেয়া হচ্ছে অজানা ইঞ্জেকশান। নারীদের জোরপূর্বক গর্ভপাত করানো হচ্ছে। নারী ও পুরুষ,উভয়ে শিকার হচ্ছে জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ ও নির্বীজনের (sterilization)। হিসেবী নিষ্ঠুরতায় বন্দী উইঘুরদের শরীর থেকে ছিনিয়ে নেয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে চীন গড়ে তুলেছে অর্গান ট্রেডের এক বিশাল, রমরমা মার্কেট।

যারা কোনমতে বন্দীত্ব থেকে এখনো বেঁচে আছেন তাঁদেরও নানাভাবে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সুক্ষ ও সুবিস্তৃত এক পুলিশি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে চীন। নজরদারীর আওতায় আনা হয়েছে উইঘুরদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি উচ্চারণ। রাস্তার মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট থেকে শুরু করে মোবাইলে ফোনে অ্যাপ ডাউনলোড কিংবা বিদেশে ফোন করার মতো বিষয়েও চলছে কঠোর নজরদারী। উইঘুরদের ঘরেও নজরদারীর ব্যবস্থা করেছে চীন। এক লক্ষের

---

[১] Leaked Chinese documents give unprecedented insight into how Muslim detention centers in Xinjiang control detainees' every move. Business Insider. November 27th, 2019.

বেশি হান চাইনিযকে 'আত্মীয়' হিসেবে পাঠানো হয়েছে উইঘুরদের ঘরে। আক্ষরিক অর্থেই উইঘুরদের বেডরুমে ঢুকে নজরদারী করছে চীন। পরিবারের পুরুষরা যখন ক্যাম্পে বন্দী, তখন তাদের স্ত্রীদের বাধ্য করা হচ্ছে হান চাইনিজদের সাথে একই বিছানায়, একই চাদরের নিচে শুতে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চলছে উইঘুর নারীদের ধর্ষণ।

এটুকুতেই ক্ষান্ত দেয়নি চীন। আক্রমণ করেছে ইসলামের ওপরও। অসংখ্য উইঘুরকে বন্দী করা হয়েছে নামায, রোযা, হজ পালন কিংবা কুরআন শেখার 'অপরাধে'। ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে হাজার হাজার মাসজিদ, ধ্বংস করা হয়েছে অসংখ্য কবরস্থান। এমনকি মৃতদের দাফন করার সময় জানাযার নামায পড়তেও বাধা দিচ্ছে প্রশাসন। মসজিদের ইমামদের বাধ্য করা হচ্ছে সুরের তালে তালে ক্যামেরার সামনে নাচতে। দাড়িটুপি কিংবা হিজাব তো দূরের কথা, নারীদের পোশাক শুধু কোমরের নিচে গেলেই রাস্তায় পুলিশ এসে বাড়তি অংশ কেটে দিচ্ছে। ঘোষণা দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে রমাদ্বানে সিয়াম পালন। কোন উইঘুর রোযা রাখছে কি না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খেয়াল রাখছে সরকার এবং হান চাইনিযরা। মদ, কিংবা শূকরের মাংশ খেয়ে উইঘুরদের প্রমাণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, তাঁরা সন্ত্রাসী না, উগ্রবাদী না।

ব্যাপক ও বিস্তৃত এই আগ্রাসনের উদ্দেশ্য সোজাসাপ্টা:

উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে ফেলা। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিচয় মুছে ফেলা।[২]

পরিপাটি এ নিষ্ঠুরতার কথা অবিশ্বাস্য মনে হলেও খোদ চীনা সরকারের নিজস্ব দলিল দস্তাবেজেই স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে এর প্রমাণ। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কর্মচারীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে উইঘুরদের 'বংশ, শেকড়, সম্পর্ক এবং উৎস ভেঙ্গে দেয়ার'[৩]। চীনের নিজস্ব সূত্র ব্যবহার করে এই জেনোসাইডের প্রমাণ তুলে এনেছেন বেশ কিছু গবেষক। পিয়ার রিভিউড রিসার্চে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চীনের সরকারী নির্দেশনা, দলিল-দস্তাবেজ, প্রতিবেদন, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, পাবলিক কন্সট্রাকশন প্রকল্প, নিরাপত্তা খাতে চাকরির বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ, এবং সরকারী মিডিয়ার বক্তব্য থেকে গবেষকরা প্রমাণ করেছেন পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের ওপর চালানো চীনের এই জেনোসাইডের কথা। প্রমাণ করেছেন উইঘুর ভুক্তভোগীদের বক্তব্যের সত্যতা।[৪]

---

[২] THE XINJIANG PAPERS - 'Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims. The New York Times, November 16th, 2019.

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] Adrian Zenz, Rian Thum এবং Darren Byler এর কাজ উল্লেখযোগ্য। অ্যাড্রিয়ান

এগুলো ইতিহাসের পুরনো কোন অধ্যায়ের কথা না। এগুলো আমাদের বর্তমানের কথা। এই গণহত্যা চলছে আজকের পৃথিবীতেই। আমরা আধুনিক, সভ্য আর মানবিক হবার বড়াই করি। কিন্তু এই আধুনিক, সভ্য, মানবিক পৃথিবীর মানুষরাই নির্বিকারভাবে মেনে নিয়েছে এই গণহত্যা। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, মুক্ত বিশ্ব, মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর শাসকগোষ্ঠী, আমজনতা - সবাই দেখেও না দেখার ভান করে যাচ্ছে।

উইঘুরদের নিয়ে বিচিত্র খেল দেখিয়েছে পশ্চিমা শক্তি আর মিডিয়াগুলো। চীনের সাথে চলা বাণিজ্য যুদ্ধের প্রয়োজনে কখনো আলোচনার টেবিলে উইঘুরদের গুটি হিসেবে আনছে, আর বেমালুম উপেক্ষা করে যাচ্ছে বাদবাকি সময়। হরহামেশা গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর স্বাধীনতার বুলি আওড়ানো পশ্চিমের এ আচরণ প্রমাণ করেছে এই বুলিগুলো আসলে অন্তঃসারশূন্য। সব সময়ই তাই ছিল। প্রয়োজনের সময় সাদা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বৈধতা উৎপাদন ছাড়া এই গালভরা শব্দগুলোর আর কোন ভূমিকা নেই।

অন্যদিকে জেনোসাইডের সংজ্ঞার অংশটুকু ছাড়া পুরো ব্যাপারটায় জাতিসংঘের ভূমিকা শূন্য। ফিলিস্তিন, সাবরা-শাতিল্লা, সেব্রেনিৎচা, সিরিয়া আর আরাকানের পর পূর্ব তুর্কিস্তানেও বরাবরের মতোই অল্পস্বল্প কিছু বিবৃতিবাজি ছাড়া স্রেফ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। জেনোসাইডের সবগুলো বৈশিষ্ট্য থাকার পরও উইঘুরদের ওপর চলা গণহত্যাকে জাতিসংঘ জেনোসাইড বলতে নারাজ। উল্টো জাতিসংঘের ৫৪টি সদস্য রাষ্ট্র চীনের এ জেনোসাইডের পলিসিকে সমর্থন জানিয়েছে, প্রশংসাও করেছে।

আধুনিক পৃথিবীর এক অদ্ভূত প্যারাডক্সে পুঁজিবাদী স্বার্থপরতা ও লালসার সবচেয়ে কদর্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক চীনকে কেন্দ্র করে। বিলিয়নের বেশি ভোক্তার বাজার, সস্তা শ্রম আর বিনিয়োগের লোভের নিচে চাপা পড়ে গেছে পূর্ব তুর্কিস্তানের আড়াই কোটি উইঘুরের আকুতি।

মুসলিম ভূখণ্ডের শাসক এবং তাদের অনুগত আলিমদের অবস্থা আরো খারাপ। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দাবি তো দূরে থাক, চীনা বিনিয়োগের লোভে গণহত্যার সাফাই গেয়ে যাচ্ছে তারা নিয়মিত। সৌদি আরব থেকে শুরু করে তুরস্ক, পাকিস্তান থেকে শুরু করে ইরান – উইঘুর মুসলিমদের পক্ষে বলা তো দূরে থাক, খোলাখুলি চীনের

যেনযের নিচের গবেষণাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে -

A Zenz (2019), ‘Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude’: China’s political re-education campaign in Xinjiang. Central Asian Survey 38 (1), 102-128.

‘শিনজিয়াং পলিসি’র পক্ষে বক্তব্য দিয়েছে এসব শাসকেরা। আবারো প্রমাণ করেছে ইসলাম এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বিশেষ কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। এগুলো নিছক রাজনৈতিক বুলি। নির্বাচনে জেতা, জনসমর্থন কেনা কিংবা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন মতো ব্যবহার করলেই হয়।

আর পৃথিবীর ছাপোষা সাধারণ মানুষেরা সন্তুষ্ট ঘুম, খাওয়া, প্রজনন, ভোগ, বিনোদন, ঘুম...এর চক্রেই। কোথায় কে মরছে, কীভাবে মরছে, অতোশতো চিন্তার সময় আমাদের নেই।

সবাই উইঘুরদের ত্যাগ করেছে। স্বার্থ ও সন্তুষ্টির ক্যালকুলাসে মূল্যহীন প্রমাণিত হয়েছে উইঘুরদের কষ্ট, রক্ত, অশ্রু আর জীবন।

কাশগড়: কতো-না অশ্রুজল বইতে উইঘুরদের ওপর চলা উপেক্ষিত গণহত্যার কথা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি চীনা আগ্রাসনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা তুলে ধরার। নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তুলে আনতে চেয়েছি, যাতে করে আধুনিকতা আর মানবতার বড়াই করা এই বিশ্বব্যবস্থার সত্যিকারের কদর্য চেহারা নিয়ে পাঠকের মনে কোন ভুল ধারণা না থাকে। আত্মপ্রবঞ্চনার কোন সুযোগ যেন আর না থাকে। অকার্যকর হয়ে যাওয়া এ পৃথিবীতে আমাদের নিষ্ক্রিয়তার মূল্য কী, পাঠক যেন তা উপলব্ধি করতে পারেন প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। প্রায় এক বছর ধরে একের পর এক প্রতিবেদন, গবেষণা, সাক্ষাৎকার পড়ার পর আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, এই নৃশংসতা এবং সামগ্রিক নিষ্ঠুরতার প্রকৃত মাত্রা শব্দের গাঁথুনিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব না। তবু আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আর কিছু না হোক, কমসেকম ‘আমি জানতাম না’, বলে দায় এড়ানোর সুযোগ যেন আমাদের না থাকে।

সমাধান খোঁজার আগে সমস্যাকে চিনতে হয়। মুক্ত হবার আগে জেনে নিতে হয় বন্দীত্বের মাত্রা আর খাঁচার পরিধি। উইঘুরদের ওপর চলা নির্বিঘ্ন জেনোসাইড ফাঁস করে দিয়েছে আজকের পৃথিবীর সত্যিকারের চেহারাটা। নিজেদের রক্ত আর সম্মান দিয়ে উইঘুর মুসলিমরা আবারো প্রমাণ করেছে এই বিশ্বব্যবস্থা ভেঙ্গে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে। পশুর পচে যাওয়া, ফুলতে শুরু করা, দুর্গন্ধ ছড়ানো মৃতদেহের কাছ থেকে যতোটুকু পরিবর্তন, যতোটুকু বিচার আশা করা যায়, এই বিশ্বব্যবস্থার কাছে আশা করা যায় ততোটুকুই। বন্দীত্ব, নির্যাতন ও হত্যার কবল থেকে উইঘুরসহ অন্যান্য নির্যাতিত মুসলিমদের বাঁচাতে এ ব্যবস্থা শুধু ব্যর্থ না, বরং এই বিশ্বব্যবস্থা আগ্রাসন ও যুলুমকে দীর্ঘায়িত করে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতি রাষ্ট্রের সীমানা এবং মুসলিম

ভূখণ্ডগুলোর শাসকগোষ্ঠী ঐ আন্তর্জাতিক কাঠামোর অংশ, যা এই নির্যাতন ও হত্যার প্রেক্ষাপট তৈরি করে, একে জিইয়ে রাখে। ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে পূর্ব তুর্কিস্তান– পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিম ভূখণ্ডগুলো এই তিক্ত বাস্তবতার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

এ অনাচার এবং যুলুম কাঠামোগত। তাই এই কাঠামো আর ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এই অন্যায় থামবে বলে আশা করা যায় না। হয়তো সময়ের সাথে অত্যাচারিতের নাম বদলাবে, স্থান বদলাবে, কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন আসবে না। যুলুমের এ ধারা চলতে থাকবে। যেমনটা গত দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। দেয়ালের লিখনী স্পষ্ট। সময়ের দাবি পরিষ্কার। দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে নিরব নিভৃত বিড়ালপ্রবণতায় হয়তো জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো আমরা, কিন্তু ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। বিচার ও জবাবদিহিতার সেই ভয়ংকর দিনে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগও হয়তো আমাদের থাকবে না।

আজ হোক, কাল হোক, নিঃসন্দেহে পরিবর্তন আসবেই। কিন্তু সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হলে বদলাতে হবে এই বিশ্বব্যবস্থা ও কাঠামোকে। বদলাতে হবে বিদ্যমানতাকে। চিন্তা করতে হবে যুলুমকে টিকিয়ে রাখা নিয়মতান্ত্রিকতার ছকের বাইরে গিয়ে। মাযলুমের প্রতিরোধ এবং অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই কখনো যালিমের বেঁধে দেয়া নিয়মে হয় না। আমরা আশা করি, এ সত্যের উপলব্ধিতে বইটি সাহায্য করবে।

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সত্য দ্বীনসহ এবং এ দ্বীনের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

আসিফ আদনান
মুহাররাম ১৪৪২, সেপ্টেম্বর ২০২০

পূর্বকথা

হাতছানি দিয়ে এক কোণে ডাকলেন বৃদ্ধা। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘এসো বাবা এদিকে একটু এসো।’

স্থির পদক্ষেপে বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গেল বেন মাউক। সাংবাদিক। লেখক। আতাজুরতের[৫] অফিসে আছে ও। অফিসের একটা দেয়ালে থরে থরে সাজানো মানুষের ছবি।

ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেন। বেশির ভাগ সময় মানুষ ছবি তোলে হাসি হাসি মুখ করে। এরাও তা-ই। তবে দু-একজন মুখ গম্ভীর করে তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। নানান বয়সের, নানান পেশার মানুষ ওরা–কেউ বৃদ্ধ, কেউ যুবক, কারও মাথাভর্তি ঘনকালো চুল, কারও মাথায় টাক। রাজ্যের সরলতা চোখেমুখে নিয়ে তাকিয়ে আছে এক কিশোর। ওপরের কোণের ওই মায়াভরা যুবকের চোখ কত তরুণীর ঘুম কেড়ে নিয়েছে কে জানে। লাল পোশাকের এক অসম্ভব রূপবতীর চোখমুখ হাসিতে ঝিকমিক করছে–এ রকম মেয়েদের দিকে আড়চোখে তাকিয়েই বুঝি যুবকের দল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তরুণীর পাশেই সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ, দেখলেই কেমন জানি শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে। ডান পাশে নিচের দিকে ফোকলা দাঁত বের করে হাসছে স্কার্ফ মাথায় বৃদ্ধা। এই বয়েসীদের দেখলেই বলতে ইচ্ছে করে, ‘নানু, একটা গল্প বলো তো!’

নানান বয়সের নানান পেশার মানুষ ওরা।

কেউ কৃষক, কেউ ব্যবসায়ী, দিনমজুর, রেস্তোরাঁর ওয়েটার, ম্যানেজার, মসজিদের

---

[৫] Atajurt Kazakh Human Rights, কাযাখস্তানের একটি স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার সংস্থা। ফেইসবুক পেইজ - https://www.facebook.com/kazakhrights/

ইমাম, মুয়াজ্জিন, গায়ক, সরকারি কর্মচারী, মেষপালক, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট কর্মী, আইনজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, পাড়ার ছোট ভাই, অথবা স্রেফ গৃহিণী! পৃথিবীর নাট্যশালায় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে সবাই একবিন্দুতে মিলেছে আজ।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ওদের অভিনয় আপাতত শেষ! অথবা অজানা।

ওরা সবাই নিখোঁজ!

হারিয়ে গিয়েছে!

কেউ ওদের কোনো খবর জানে না।

এতগুলো জলজ্যান্ত মানুষ স্রেফ হারিয়ে গেছে!

অজস্র মানুষ ছবি হয়ে ঝুলছে আতাজুরতের অফিসের দেয়ালে। জানালা দিয়ে আসা বাতাসে মাঝে মাঝে দুলছে।

বৃদ্ধার কথায় কল্পনার সুতো কেটে গেল বেনের। কান্নাচাপা গলায় বৃদ্ধা বললেন, 'বাবা, এই যে এরা আমার পরিবারের লোক।' দেয়ালে পাশাপাশি ঝুলানো কয়েকটা ছবি দেখালেন। 'আর এই যে ওরাও, ঐপাশের ওরাও...।'

ঝাপসা চোখে চলে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না বেন। শেষমেশ ওখান থেকে সরে এসে বসল এক কোনায় পেতে রাখা বেঞ্চে। বৃদ্ধা বেনের পাশে এসে বসলেন। শুরু করলেন তার জীবনের কাহিনি বলা...

'আমার নাম খালিদা। পূর্ব তুর্কিস্তানের ইলি কাযাখ অঞ্চলের[৬] একটা গ্রাম কারাগাশে আমার জন্ম। আমাদের ওইদিকটা পশুচারণভূমির জন্য বিখ্যাত। আর অসম্ভব সুন্দর! সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা উপত্যকা, চোখ জুড়ানো পাইনের সারি, বরফে মোড়ানো নীলাভ পাহাড় চূড়া, কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী—মাটির পৃথিবীতেই একটুকরো জান্নাত।

মাকে হারিয়েছি দুই বছর বয়সে, বাবাকে কোনো দিন দেখিইনি। শুনেছিলাম

---

[৬] চীনের সবচেয়ে বড় আর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদেশ হলো পূর্ব তুর্কিস্তান (চাইনিযরা যাকে শিংজিয়াং বলে থাকে)। ইউরোপের যেকোনো দেশের চাইতে আয়তনে বড়। স্বাধীন দেশ হলে পূর্ব তুর্কিস্তান হতো আকারে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রের মধ্যে আঠারোতম। ২৪ মিলিয়ন (২ কোটি ৪০ লাখ) মানুষের বসবাস এখানে। প্রায় অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে এই সুবিশাল ছবির মতো সুন্দর এলাকায় বসবাস করে আসছে বিভিন্ন গোত্রের মুসলিমরা—উইঘুর, কাযাখ, মঙ্গোল, কিরগিয। উইঘুররা সংখ্যাগরিষ্ঠ—কাযাখ, মঙ্গোল, কিরগিয এরা যাযাবর জাতি। চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হান'দের (মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগ হলো হান চাইনিয) চেয়ে ভাষা বা সংস্কৃতির দিক দিয়ে উযবেকিস্তান বা তুর্কির মানুষদের সাথে উইঘুরদের মিল বেশি।

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। এর বেশি কিছু আর জানি না বাবার সম্পর্কে। মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বিয়ে করেন। একেবারে ভুলে যান আমাকে। মানুষ হতে থাকি মামার বাড়ির আত্মীয়দের কাছে। পাঁচ বছর বয়সের পর অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে গেলাম ওখানে। ছাড়তে হলো ওই বাড়িও। ওই অতটুকুন বয়সে নামতে হলো পৃথিবীর পথে। এখানে-সেখানে, এর বাড়ি ওর বাড়ি—জীবনস্রোতে খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে বড় হতে থাকলাম। পড়াশোনার ধারেকাছেও যাওয়ার সুযোগ হলো না—এতিম মেয়ের আবার কিসের পড়াশোনা!

১৯৭৫ সাল। ২১ চলছিল আমার। ভালোবাসা খুঁজে পেলাম। আমার স্বামীও ছিল আমার মতোই একজন এতিম। এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ওর পরিবার চীনে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেটা ওর জন্মের আগের কথা। দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামলে নিয়ে একসময় কাযাখস্তানে ফিরে যায় ওর পরিবার। ওকে একলা ফেলে রেখে যায় চীনে।

গত সেপ্টেম্বরের (২০১৮) ৯ তারিখে মারা গেছে ও! ওর নাম ছিল রাখিমবারজান কিত্তিবাই। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে ৮ বার গর্ভধারণ করি আমি। একবার যমজ বাচ্চাও ছিল। দুঃখের বিষয়, প্রথম পাঁচ সন্তানের সবাই মারা যায়। চার ছেলে আর এক মেয়ে—সবাইকেই হারিয়ে ফেলি আমরা।

তারপর জন্ম নেয় আমাদের ছেলে...ওর নাম রাখলাম তক্তীগুল। তক্তীগুল মামেতযঝানকিযি (Toktygul Mametzhankyzy)। তক্তীগুল মরল না। আল্লাহর ইচ্ছায় তক্তীগুলের পর আমাদের যতগুলো সন্তান হলো সবাই জীবিত রইল।

বারোতে পা দেবার আগ পর্যন্ত তক্তীগুলকে সব সময় আগলে রাখতাম আমরা। আমার স্বামী তো ওকে চোখের আড়ালই করত না। মা মুরগি যেমন করে বাচ্চাদের ডানার মধ্যে আগলে রাখে, ওকে সেভাবেই আগলে রাখত আমার স্বামী। কোলে নিয়ে থাকত, ঝুলিয়ে রাখত পিঠে, ঘাড়ে। এমনকি খাবার সময়ও।

এর আগে পাঁচ পাঁচজন সন্তানের লাশ কবরে শোয়ানোর অসীম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। কিছুতেই এই সন্তানকে হারাতে রাজি ছিলাম না। ছেলেকে নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটত আমাদের!

বড্ড দুঃসময় জড়িয়ে নিয়েছিল বিয়ের প্রথম কয়েকটা বছর। কঠোর পরিশ্রম করতে হতো আমাদের। বর্গা চাষ করতাম। গম পেষা বা ভুট্টার খেতে কাজ করার সময় পালা করে ছেলেকে পিঠে ঝুলিয়ে রাখতাম আমি আর আমার স্বামী। খাটতে হতো দিন রাত এক করে। ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ। দিনশেষে মনে হতো, হাত- পায়ের জোড়া না আবার খুলে যায়!

কিছুদিন পরে দ্বিতীয় সন্তান হলো। তখন করতাম কী, ওদের দুই ভাইকে খেতের মধ্যে কোনো খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতাম। মানুষ ছাগল বা ভেড়া বেঁধে রাখে না? ওই রকম করে। যেন এদিক-সেদিক চলে গিয়ে কোনো বিপদে না পড়ে। আসলে ওদের হারানোর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতাম। কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি তখন।

নব্বইয়ের দশকে এসে আমাদেরকে চাষের কিছু জমি দিলো সরকার। ভাগ্য বদলাতে শুরু করল। খিদে নিয়ে রাতে ঘুমুতে যাবার দিন শেষ হলো। গম, ভুট্টা, আখ, সয়াবিন ইত্যাদি বুনতাম আমরা। কাজ করতে ভালোই লাগত। ঝিরিঝিরি বাতাসে এদিক-ওদিক দুলত গমের ছড়া। সেদিকে তাকিয়ে মন ভরে যেত।

এত মায়া! এত মমতা! আমাদের নিজেদের শস্য! একদম নিজেদের জমিতে! আহ্! কী আনন্দ!

কাযাখ সীমান্ত খুলে দেয়ার পর আমার স্বামী কাযাখস্তান গেল। বাবা-মা, পরিবারকে খোঁজার এক বুক অনিশ্চিত স্বপ্ন নিয়ে। কিছুদিন পর ওদিক থেকে ভালো খবর পেলাম। আমার স্বামী ওর মাকে খুঁজে পেয়েছে—ওর বাবা অবশ্য এরই মধ্যে মারা গেছে।

এতদিন পর মাকে খুঁজে পেয়েছে—তার সেবা করার জন্য কাযাখস্তানে থেকে গেল ও। মাঝেমধ্যে কিছুদিনের জন্য চীনে আসত। সপ্তাহখানেক আমাদের সঙ্গে থেকে আবার মায়ের কাছে ফিরে যেত। ছেলেদের আমি তখন একা হাতেই মানুষ করছিলাম। আমার শাশুড়ি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। ২০০৭ সালে যখন মারা যান তখন তার বয়স ১০৩!

আমার বড় তিন ছেলে পিঠেপিঠি বয়সের। ওরা কাজ করে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে। আমরা পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে কাযাখস্তানে চলে গেলাম। কিন্তু উইঘুর মেয়েদের বিয়ে করে পূর্ব তুর্কিস্তানেই স্থায়ী হলো তিন ছেলে।

আসলে চাইলেও কাযাখ[৭] মেয়েদের বিয়ে করতে পারত না ওরা! কাযাখ মেয়েদের বিয়ে করতে হলে অনেক টাকা দেনমোহর দিতে হয়। আমরা দিন আনি দিন খাই। এত টাকা কোথায় পাব? কিন্তু উইঘুর মেয়েদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। একে একে আমার তিন ছেলেই উইঘুর মেয়ে বিয়ে করে ফেলল। কোনো দেনমোহর দেয়া ছাড়াই! শুধু বিয়ের পোশাকটা কিনতে হলো! এতেই ওরা খুশি!

ধরপাকড়ের প্রথম প্রহরেই আমার বড় তিন ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল চাইনিযরা।

---

[৭] কাযাখস্তানের নয়; বরং কাযাখ জাতির মেয়েদের কথা বলা হচ্ছে। কাযাখরা উরাল পর্বতমালা, মধ্য এশিয়ার দেশ (যেমন : কাযাখস্তান, পূর্ব তুর্কিস্তান, উযবেকিস্তান, মঙ্গোলিয়া) ইত্যাদি অঞ্চলে বসবাস করে।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে। খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি পুলিশকে। কেননা, ওরা তিন ভাই পাশাপাশি থাকত কুনিসের এক গ্রামে। পুলিশ এল, একসাথে তিনজনকে ধরে বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

মেজো ছেলের বউ, আমাকে ফোন করে জানাল, 'মা, ওদের তিন ভাইকেই পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে!'

পরের দিন আবার ফোন করল, 'মা, ওরা ভাবিকেও ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

তক্তীগুল, আমার সোনা মানিক, আমার নাড়িছেঁড়া ধন, আমার কলিজা...। কত কষ্ট করে ওকে আগলে রেখেছিলাম। বারো বছর বয়স পর্যন্ত কোলে-পিঠে নিয়ে রাখতাম। চোখের আড়াল হতে দিতাম না। আমাদের কত সাধনার ফল। সেই তক্তীগুলকে হঠাৎ এক রাতে ওরা ধরে নিয়ে গেল! ওর বউকেও নিল। নিয়ে গেল ওর ছেলেমেয়েকেও। আজ ওরা কেমন আছে, কোথায় আছে, কীভাবে আছে আমি জানি না!'

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিলেন। সান্ত্বনা দেবার অনেক কথা মাথার মধ্যে ঘুরছিল বেনের। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বের হলো না। নীরব বেদনায় টনটন করে উঠল বুকটা। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ও।

দীর্ঘ সময় পর মুখ তুললেন বৃদ্ধা। জলভরা চোখে বেনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ম্লান হাসি। ব্যথাভরা হাসি।

'আমার বৃদ্ধ স্বামীর দুর্বল শরীর এ খবর নিতে পারল না। তীব্র মাইগ্রেনে আক্রান্ত হলো সে। পরের দিন যখন খবর এল বড় বউমাকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন একেবারে ভেঙে পড়ল।

ওকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করলাম, 'এখনই এত ভেঙে পোড়ো না। দেখা যাক শেষমেশ কী হয়।'

এক এক করে চলে গেল ত্রিশ দিন। ছেলে, ছেলের বউ কারও কোনো খোঁজ নেই।

যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম কারাগাশের প্রসাশনের সাথে। ফোনে এক লোককে পেলাম। নাম বলল নুরলীবেক।

'আমার ছেলেকে কেন ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ছেলে, ছেলের বউ এরা কোথায় আছে?' একটু রাগী ও অধৈর্য গলায় জানতে চাইলাম আমি।

'ওরা রিএডুকেশন ক্যাম্পে আছে', মুখস্থ উত্তর আউড়ে গেল নুরলীবেক। 'পড়াশোনা করছে সেখানে। আপনার মেজো এবং সেজো ছেলের বউদেরও ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, খবর পাননি বোধহয়। ওদেরকেও পলিটিকাল সায়েন্স পড়তে হবে।' শেষের দিকে নুরলীবেকের গলায় বিদ্রুপের রেশ শুনতে পেলাম।

'আমার ১৪ জন নাতি-নাতনি আছে। ওদের বাবা-মা সবাইকে তো ধরে নিয়ে গেছেন, এখন কে ওদের দেখাশোনা করবে?'

'চিন্তা করবেন না। ওদেরকেও পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়েছে।'

ফোন কেটে যাবার খুটখুট শব্দ আমার বুকে যেন ছুরি বসিয়ে দিলো।

আমার স্বামীর হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গেল ফোনালাপের দিন। সোজা বিছানা নিল সে। হাঁটতে পারে না, কোথাও যেতে পারে না। দিন দিন দুর্বল হতে থাকল। কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলল।

এত বড় ঝড় বয়ে গেল আমাদের পরিবারের ওপর...। আমার সব ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনিকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হলো; কিন্তু তবুও কাউকে কোনো কথা জানাতে পারলাম না। বুকে পাথর বেঁধে পার করে দিলাম কয়েকটা মাস।

সেপ্টম্বরের ৯ তারিখ।

আমার স্বামীর মধ্যে কী জানি একটা ভর করল। যে লোক কথাই বলতে পারে না সে হঠাৎ করে চিৎকার করে তিন ছেলেকে ডাকল—সাতাইবালদি, ওরাযহান, তক্তীগুল!

আমার দিকে পাশ ফিরল।

জড়ানো গলায় বলল, 'আমার তিন ছেলের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে দিলাম। আর খালিদা, তুমি ওদের দেখো। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে।'

বিকেল ৫ টায় মারা গেল ও!

ধু ধু বাড়ি।

শুধু আমি।

কোথাও কেউ নেই।

অসীম শূন্যতা, বিষণ্ণতা বুকে নিয়ে পড়ে আছে ঘরদোড়। ঘরময় ঘুরে বেড়াই...। স্থির হয়ে বসতে পারি না। ছেলেদের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে পারলাম না। দিন দশেক ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, তক্তীগুলদের খুঁজতে বের হব আমি!

শেরিকযাহানের[৮] সঙ্গে দেখা করার জন্য আসলাম আতাজুরতে। আগেই বলেছি আমি নিরক্ষর। আমার হয়ে অন্যরা বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি শুরু করল,

'খালিদার তিন তিনজন ছেলেকে, তাদের পরিবারকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। শোক সামলাতে পারেনি খালিদার স্বামী। ক'দিন আগে মারা

---

[৮] স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার সংস্থা আতাজুরতের প্রধান।

গেছে বৃদ্ধ।'

কিন্তু কোনো লাভ হলো না। আমার শূন্য ঘর শূন্যই থেকে গেল।

ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি সবাইকেই তো ক্যাম্পে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্বামীও মারা গেছে। এখন পরিবারে বাকি আছে কেবল ছোট ছেলে। ওই শুধু কাযাখস্তানে আছে। বিয়ে করেছে কিছুদিন আগে। টুনোটুনির সংসার ওদের। এক এপার্টমেন্টে গাদাগাদি করে থাকতে কষ্ট হয়। তাই আলাদাভাবে আমি একা থাকি।

বয়স্ক ভাতা-টাতা কিছু পাই না, এই বুড়ো বয়সে এসেও কাজ করতে হচ্ছে। ছোট ছেলের অবস্থাও খুব একটা ভালো না, টেনেটুনে সংসার চালায়; কিন্তু তারপরও আমার দেখাশোনার অনেক চেষ্টা করে। আরও অনেকের সঙ্গে মিলে ট্রাক ভাড়া করে চীনে সবজি কিনতে যায় ও। ফিরলে ওদের কাছ থেকে নিয়ে বাজারে সবজি বিক্রি করি আমি। দোকান ভাড়া নিয়ে বসার মতো পয়সা আমার নেই। সবজির দোকান নিয়ে বসে যাই ফুটপাতে। এই বৃদ্ধ বয়সে ২০ জনের মতো স্বজন হারানোর ব্যথা আর আর্দ্রতা বুকে নিয়ে ফুটপাতের এক কোণে বসে সবজি বিক্রি করি আমি।

শসা, টমেটো, গাজর, লেটুস...![৯]

এমন লক্ষ লক্ষ খালিদা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে। গুম, খুন, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ যাদের নিত্যসঙ্গী।

বাহ! কত সহজেই বাক্যদুটো বলে ফেললাম। সংবাদপত্রে রিপোর্ট লেখার মতো। সাংবাদিকরা একের পর এক খবর লিখে যান, কিন্তু খবরের বাস্তবতা তাদের স্পর্শ করে না বেশির ভাগ সময়ই। হয়তো আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হতো। আমিও লিখে যেতাম উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের নির্যাতনের কথা কোনো ভাবাবেগ ছাড়াই। কিন্তু তা হয়নি। হতে দেয়নি নির্যাতনের ভয়াবহ মাত্রা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে নিজের সাথে। এখন তো বটেই, বই লেখার সময় একটু পরপর নিজেকে অবেচতন মনেই প্রশ্ন করতাম, কেন লিখতে বসলাম আমি উইঘুর-

---

[৯] ২০১৯ সালের মে মাসে লেখক বেন মাউককে দেয়া খালিদা আখিতাকানকিযির (৬৪) সাক্ষাৎকার অবলম্বনে। Weather Reports: Voices From Xinjiang, Untold Stories From China's Gulag State, Ben Mauk. The Believer, Issue One Hundred Twenty-Seven, October/November 2019 - https://tinyurl.com/yxszsrkc

Atajurt Kazakh Human Rights, কাযাখস্তানের একটি স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার সংস্থা। ফেইসবুক পেইজ - https://www.facebook.com/kazakhrights/

কাযাখ মুসলিমদের কাহিনি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? নাকি পাগল হবার হাত থেকে বাঁচার জন্যই রাজি হয়েছিলাম উইঘুরদের গল্প বলতে? যা কিছু শুনেছি-জেনেছি-পড়েছি-দেখেছি পর্দার এপাশ থেকে, প্রতিনিয়ত যে দগদগে ঘায়ের মতো নতুন নতুন ক্ষত তৈরি হয়েছে হৃদয়ের খোপে খোপে, সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই বোধহয় রাজি হয়েছিলাম লিখতে। এ ছাড়া বোধহয় আর কোনো উপায় ছিল না। কষ্টের ভার সয়ে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে থাকার কোনো রাস্তা ছিল না। হিকমাহর দোহাই টেনে 'ছাপোষা' গৃহপালিত জীবনটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বোধহয় সম্ভব ছিল না কোনোমতেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীদের গণহত্যার মতো একই কাহিনি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তানে। সেই একই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, শ্রমদাসত্ব, মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট, জাতিসত্তার শেকড় উপড়ে ফেলা...। তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি চাইনিয বর্বরতাকে এমন এক মাত্রা দিয়েছে যা হয়তো ছুঁতে পারেনি খোদ নাৎসি বাহিনীও। কিন্তু এতকিছুর পরেও পুরো বিশ্ব নীরব। এই নীরবতা আরও পাগল করে তুলত আমাকে। দায়িত্ব আর কর্তব্যের বোঝা আরও শক্ত হয়ে চাপত ঘাড়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, নিজেকে যতই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিই না কেন, আমাকে বলতেই হবে! আমাকে বলতেই হবে পূর্ব তুর্কিস্তানের আড়াই কোটি মানুষের কথা। আমাকে জানাতেই হবে কীভাবে চীন সকল শক্তি বিনিয়োগ করেছে এই আড়াই কোটি মানুষকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। আমাকে অবশ্যই শোনাতে হবে আব্দুওলী, সাইরাগুল, আব্দুল আযিয, ইমিন, মেরিপেত, আয়নুরারা, মিহিরগুলদের হৃদয়ভাঙা গল্প। বাবা-মা হারিয়ে বরফে জমে মরে যাওয়া ২ বছরের রহমাতুল্লাহ বা বোর্ডিং স্কুল নামক কারাগার থেকে বাবাকে লেখা ৮ বছরের ছোট্ট মেয়ের ঠিকানাবিহীন চিঠির গল্প। না শোনালে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না কোনো দিন। দেশহারা লক্ষ লক্ষ উইঘুর রিফিউজি, আমাদের নেতাদের পল্টিবাজি, আমাদের কাপুরুষতা, নিষ্ক্রিয়তা—এসব না বললে বিবেক কোনো দিন ক্ষমা করবে না আমাকে।

অনেক কিছুই বলার ছিল। আছে। কিন্তু সে কথাগুলো বলার ভাষা কি আদৌ আমাকে শেখানো হয়েছে? মানুষের এত নিষ্ঠুরতা, এত নির্যাতন, এত দীর্ঘশ্বাস, এত চোখের জল, এত অশ্রুকে কালো কালির হরফে ভাষা দেবার ক্ষমতা কি আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষকে দেওয়া হয়েছে?

দিনের পর দিন গিয়েছে, কেটেছে রাতের পর রাত, যে বই শেষ হতে পারত এক মাস, বড়জোর দেড় মাসে—সেই বই শেষ হয়নি! সম্পাদক বিরক্ত হয়েছেন, কড়া করে

বকেছেন... কিন্তু আমি নিরুপায়। বই শেষ করতে পারিনি।

অতিথি শব্দরা হুড়মুড়িয়ে এসেছে, আত্মবিশ্বাসী গলায় জানিয়েছে,

'আমাকে... আমাকে বেছে নাও। আমি পারব আবেগের ভার বহন করতে।'

শুকনো হেসেছি আমি।

'তোমরা কি পারবে সেই মেয়ের দুঃখের কথা বলতে, ২০০ জন মানুষের সামনে যাকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল? গণধর্ষণ দেখতে বাধ্য হওয়া ২০০ জন মানুষের আক্ষেপ, নিষ্ফল ক্রোধ ফুটিয়ে তুলতে পারবে তোমরা?

তোমরা কি পারবে সেই ছেলের মনের দহন তুলে ধরতে, নিজের মাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল যে?

পারবে?

পারবে তোমরা?'

মাথা নিচু করে পরাজয় মেনে নিয়েছে শব্দেরা। বিদায় নিয়েছে একে একে!

চুপচাপ টেবিলে বসে থেকেছি আমি। অসহায় অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে দুগাল বেয়ে।

তথ্য- উপাত্ত,কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে বিশ্বের খ্যাতনামা সংবাদমাধ্যম, অ্যাকাডেমিকদের গবেষণা, উইঘুর অ্যাক্টিভিস্টদের পরিচালিত ওয়েবসাইট, চীনের নাগপাশ থেকে পালিয়ে আসা হতভাগ্য উইঘুর,কাযাখদের জবানবন্দী ইত্যাদি থেকে। আমরা চেষ্টা করেছি সবজায়গাতেই বিশুদ্ধ তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করার। প্রতিটি স্থানেই তথ্যসূত্র যোগ করা হয়েছে। আমরা পাঠককে তীব্রভাবে উৎসাহিত করছি তথ্যের উৎসগুলো যাচাই বাছাই করে নেবার। বইয়ের কলেবর ছোটো রাখার জন্য এবং আমাদের ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক করুণ কাহিনী আমরা তুলে আনতে পারিনি। এই সুযোগে পাঠক সেগুলো সম্পর্কে ধারণা পাবেন। সাহিত্যমান বজায় রাখার জন্য আমরা কিছুটা স্বাধীনতা নেবার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বক্তব্য পরিষ্কার করার জন্য তৃতীয় পুরুষে (Third Person) বর্ণিত কাহিনী,তথ্য-উপাত্ত প্রথম পুরুষে (First Person) রূপান্তর করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বক্তব্য সংক্ষেপ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি যোগ করা হয়েছে। এসবকিছু করা হয়েছে বইয়ের বিষয়গুলো পাঠক যেন যেন অনুধাবন করতে পারেন সেই বিষয়টি সামনে রেখে। তবে এই সাহিত্যিক স্বাধীনতা কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়নি। আমরা যে তথ্য বিশুদ্ধ উৎস থেকে পেয়েছি সে তথ্যগুলোই সরাসরি বইয়ে উপস্থাপন করেছি।

উইঘুর এবং হান চাইনিজদের নাম প্রতিবর্ণীকরণের জন্য আমরা নির্ভর করেছি

আন্তর্জাতিক গনমাধ্যমের (মূলত ইংরেজি) ওপর। আন্তর্জাতিক গনমাধ্যম যেভাবে উইঘুর এবং চাইনিজদের নাম লিখেছে আমরা সেভাবেই লিখার চেষ্টা করেছি। তথ্যসূত্র যোগ করা সহ সকলক্ষেত্রেই আমরা আন্তরিক এবং সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। এরপরেও কোনো ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুনা। এমন কিছু পাঠকের চোখে পড়লে তা প্রকাশনীর ফেইসবুক পেইজ বা মেইলে জানানোর অনুরোধ রইলো। উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ওপর চলা নির্যাতনের আরো আপডেট ও লেখা পেতে চোখ রাখতে পারেন নিচের ফেইসবুক পেইজে -

কাশগড়-কতো না অশ্রুজল

https://web.facebook.com/kashgarkotonaoshrujol/

এই বইয়ের লেখক (ইশ! যদি আমাকে লেখা না লাগত! যদি এসব কখনো না ঘটত!) হিসেবে আপনাকে সাবধান করে দেওয়া দায়িত্ব মনে করছি। এমন গল্প আপনি আগে শোনেননি নিশ্চিত। পাঠক, আপনি এমন কিছু মানুষের গল্প শুনতে যাচ্ছেন, যাদের প্রায় প্রতি পরিবার থেকে কমপক্ষে একজনকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। যেখানে ৩৫ বছরের নিচের নারীপুরুষ-নির্বিশেষে সবাইকেই ধর্ষণ করা হয়।

আপনি এমন কিছু মানুষের গল্প শুনতে যাচ্ছেন, যাদের পুরুষশূন্য ঘরে ঢুকেছে ১০ লাখ কামোন্মত্ত হান পুরুষ!

যাদের ৫ লাখ শিশুকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে!

যাদের জীবন্ত শরীর থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে!

পাঠক, আমাদের সময়ে ঘটে যাওয়া এই নির্মম ট্র্যাজেডি সহ্য করতে পারবেন কি না জানি না। জানি না, আপনি আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন কি না। মনের গহিনে কিছু বীভৎস স্মৃতি জমা হয়ে থাকবে বোধহয় চিরদিনের জন্য। যে স্মৃতি চিরকাল ফুটিয়ে যাবে যন্ত্রণার ধ্রুপদি হুল।

এ পর্যন্ত পড়ার সাহস যখন করেছেন, তাই এতবার সতর্ক সংকেত দেবার পরেও স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে।

গণচীনের মানচিত্র

ইনার মঙ্গোলিয়া, তিব্বত এবং পূর্ব তুর্কিস্তান—এই প্রদেশগুলো বাদ দিয়ে চীনের বাকি অংশ চায়না প্রপার বা ইনার চায়না বলা হয়ে থাকে। চায়না প্রপারের বাইরের অঞ্চলগুলো গণচীনের দখল করা।

পূর্ব তুর্কিস্থানের মানচিত্র

বর্তমানে গণচীনের অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে বড় আর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদেশ পূর্ব তুর্কিস্তান। চীনারা বলে 'শিংজিয়াং' (Xinjian)। চীনা দখলদারিত্বের প্রতীক শিংজিয়াং নামটিকে উইঘুররা প্রত্যাখ্যান করে। স্বাধীন দেশ হলে পূর্ব তুর্কিস্তান হতো আকারে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রের মধ্যে আঠারোতম। প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষের বসবাস এখানে। প্রায় অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান।

শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে এই সুবিশাল ছবির মতো সুন্দর এলাকায় বসবাস করে আসছে বিভিন্ন গোত্রের মুসলিমরা–উইঘুর, কাযাখ, মঙ্গোল, কিরগিয। উইঘুররা সংখ্যাগরিষ্ঠ–কাযাখ, মঙ্গোল, কিরগিয এরা যাযাবর জাতি। চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হান'দের (মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগ হলো হান চাইনিয) চেয়ে ভাষা বা সংস্কৃতির দিক দিয়ে উযবেকিস্তান বা তুর্কির মানুষদের সাথে উইঘুরদের মিল বেশি।

আমাকে কাঁপিয়ে তোলে
রাতের দীর্ঘশ্বাস
হৃদয়ে একত্রিত হয়
তীব্র যাতনার ছায়াগুলো

আমাকে কাঁদায়
বিধবার আর্তচিৎকার
বন্দী ও শৃঙ্খলিতদের ঘিরে
বেড়ে চলা কান্নার রোল

আমাকে পোড়ায়
সন্তানহারা মায়েদের চাহনি
উপর্যুপরি আঘাত
আর নিঃস্ব শিশুর নির্বাক অশ্রু

হে সময়ের পালতোলা নৌকা
তুলে নাও আমায়
নিয়ে চলো আশা ভরসার কোনো দেশে
চারিদিকে যার আলোকিত উজ্জ্বল

- আরবি কবিতার ভাবানুবাদ
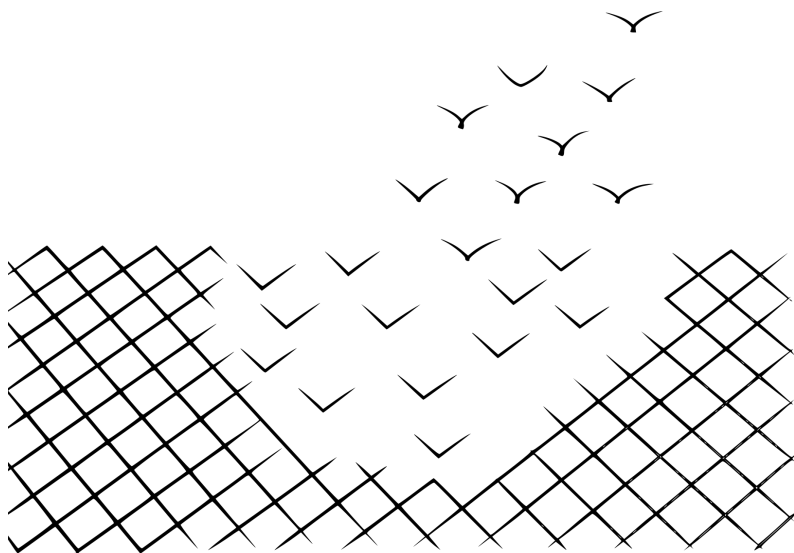
কাশগড়...
কতো-না অশ্রুজল

রহস্য
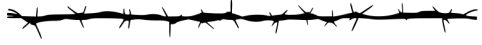
২০১৭। এপ্রিলের শেষ।

দিনটা ছিল শুক্রবার। কাশগড়ের বিখ্যাত ঈদগাহ মসজিদ—অন্যান্য শুক্রবার লোকারণ্যে পরিণত হয়। এ শুক্রবার একটু অন্য রকম। মুয়াজ্জিন অন্তর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া সুরে সবাইকে আহ্বান জানায়নি—নামাযের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো। আর্মার্ড ক্যারিয়ারের ইঞ্জিনের গম্ভীর শব্দে থম মেরে আছে চারপাশ। একে একে আসছে ওরা প্রাগৈতিহাসিক দানবের মতো। টরেট থেকে উঁকি দিচ্ছে হেভি মেশিনগানের কুৎসিত চকচকে নল। সারিবেঁধে গিয়ে থামছে পিপলস স্কয়ারে।

ছাদখোলা লরিতে বোঝাই হয়ে আসছে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অগণিত সৈনিক। লাল এবং হলুদ প্রোপাগ্যান্ডা ব্যানার ধরে রেখেছে ওদের অনেকেই।

‘একতা, স্থিতিশীলতা আশীর্বাদ! বিচ্ছিন্নতাবাদ সমাজের জন্য অভিশাপ!’

একটা ব্যানারে বড় করে লেখা।

লাল কালিতে লেখা আরেক ব্যানার হুমকি দিচ্ছে,

‘জনগণের বিপক্ষে যাবার দুঃসাহস দেখানো সকল সন্ত্রাসীদের কচুকাটা করা হবে!’

অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো অতিথি যেন মিলিটারি মার্চে এসে ছন্দপতন ঘটাতে না পারে তাই ৫ লক্ষ অধিবাসীর এই শহর পুরোপুরি লকডাউন করে দিয়েছে পুলিশ। ‘আমরা প্রত্যেকটা রোড ব্লক করে রেখেছি’, আড়াআড়িভাবে ঝোলানো কারবাইনের ট্রিগারে আঙুল রেখে গর্বিত স্বরে জানাল এক পুলিশ। ঈদগাহ মসজিদের ঠিক বাইরেই ডিউটি পড়েছে ওর।

তিন দিন আগে কাশগড়ের মতোই চাইনিয আর্মিকে মিলিটারি প্যারেড করতে দেখা গেছে পূর্ব তুর্কিস্তানের রাজধানী উরুমচিতে। মার্চ করতে করতে আর্মড ট্রুপস গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিয়েছে, 'পার্টি এবং জনগণের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে আমরা প্রস্তুত। দেশবাসী আপনারা নিশ্চিত থাকুন। 'পিপলস লিবারেশন আর্মি' এর প্রত্যেকটি সৈনিক শপথ করছে, সন্ত্রাসীদের নির্মূল করেই ছাড়ব আমরা। পালাবার পথ খুঁজে পাবে না সন্ত্রাসীরা।'

পূর্ব তুর্কিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের শহর আকসুতে মিলিটারি শোডাউন চলল তিনদিন ধরে। সংবাদপত্রে লেখা হলো, 'হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে সাইরেন বাজল, চারপাশ থেকে তীব্র গতিতে ছুটে এল অসংখ্য আর্মার্ড ভেহিকল। মনে হলো খাপ থেকে যেন তলোয়ার টেনে বের করেছে কেউ।'

কাশগড় থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণের এক গ্রামে চৌরাস্তার মোড়ে ডিউটি দিচ্ছে মিলিশিয়ার এক সদস্য। খুব সতর্ক সে। যেকোনো সময় আক্রমণ এলে পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুত। পিপলস প্যারামিলিটারি আর্মড পুলিশের সবুজ, সাদা মিশেলের আর্মার্ড কার সাইরেন বাজাতে বাজাতে ছুটে গেল ওর পাশ দিয়ে। প্রাচীন সিল্ক রোডের আকর্ষণে পূর্ব তুর্কিস্তান এসেছিল ইউরোপিয়ান এক ট্যুরিস্ট। চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। অজান্তেই মুখ থেকে বের হয়ে গেল, 'এত রোড ব্লক এর আগে কখনো কোথাও দেখিনি আমি, তবে ইস্রাইলের হেবরনে[১০] মনে হয় এ রকম অবস্থা ছিল!'

আরও দক্ষিণে তাশকুরগানের রাস্তায় ডামি অস্ত্রের সাহায্যে বেসামরিক হান নারী-পুরুষদের প্রশিক্ষন দিচ্ছে পুলিশ। হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছে আততায়ীদের কীভাবে সংক্ষিপ্ততম সময়ে মাটিতে পেড়ে ফেলা যায়।

ওয়ান, টু, থ্রি...

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রণহুংকার দিয়ে এক একজন নারী বা পুরুষ অসংখ্য কল্পিত শত্রুকে 'খালাস' করে দিচ্ছে হাতের ডামি অস্ত্র দিয়ে।

'সবকিছু সীমার বাইরে চলে গেছে', দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে করুণ মুখে বলছিলেন স্থানীয় এক উইঘুর মুসলিম। 'এত প্যারেড, এত ট্রেইনিং–এসব কিসের জন্য?

হানরা আসলে কী চায়? যুদ্ধ শুরু করতে চায়?'[১১],[১২]

---

[১০] ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের একটি শহর

[১১] In China's far west the 'perfect police state' is emerging, Tom Phillips. The Guardian, June 23rd, 2017. https://tinyurl.com/y7cvp6mo

[১২] China 'anti-terror' rallies: thousands of troops on streets of Urumqi, Tom

ঠিক একই প্রশ্ন বোধহয় অনেকক্ষণ থেকেই আপনার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—পূর্ব তুর্কিস্তানে কী হচ্ছে এসব? কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে চীন?

Phillips. The Guardian, February 28th, 2017. https://tinyurl.com/jf77eqv

পরিপাটি আগ্রাসন

চীনের পশ্চিমাঞ্চল—পূর্ব তুর্কিস্তান। সুবিশাল মরুভূমি, পর্বত, উপত্যকা, গ্রাম আর শহরের আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্যাটেলাইট। একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর বেইস স্টেশনে ছবি পাঠাচ্ছে। এমনই একটা ছবিতে দেখা গেল, বিশাল ধূসর বালিময় প্রান্তর। খাঁ খাঁ করছে। জনবসতি বা প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। মঙ্গল গ্রহ বা চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি যেন। একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। দিনটা ছিল জুলাইয়ের ১২ তারিখ। ২০১৫ সাল।

তিন বছর পর, ২০১৮ সালের ২২ এপ্রিলে বেইস স্টেশনে ঠিক একই জায়গার ছবি পাঠাল স্যাটেলাইট। এবারের ছবিটা আগের মতো বৈশিষ্ট্যহীন নয়। উল্লেখযোগ্য অনেক কিছুই চোখে পড়ল।

ধু ধু প্রান্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বিল্ডিং। ২ কিলোমিটার দীর্ঘ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ১, ২, ৩... মোট ১৬টি ওয়াচ টাওয়ার। নিরাপত্তার বহর দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে ভেতরে গোপন কিছু চলছে। কিছু আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।[১৩]

গুগল আর্থ সফটওয়্যারের সাহায্যে এ রকম অসংখ্য স্থাপনার খোঁজ পাওয়া গেল পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে।[১৪]

এগুলো কী?

---

[১৩] China's hidden camps, What's happened to the vanished Uighurs of Xinjiang? John Sudworth. BBC, October 24th, 2018. https://tinyurl.com/y6bwoamx

[১৪] East Turkistan National Awakening Movement. অফিশিয়াল ওয়েবসাইট - https://tinyurl.com/ybbuv8jf, এখানে নিয়মিত আপডেট পাবেন

কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

নিরাপত্তার এত কড়াকড়ি কেন?

আগস্টে জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস প্যানেল দাবি করল এগুলো আসলে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প[১৫]। চীন সরকার পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে শত শত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করেছে। প্রায় ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে এসব ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে। জাতিসংঘের Elimination of Racial Discrimination কমিটির সদস্য ম্যাকডোগালের মতে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। ২০ লাখের মতো। আবার অনেকেই দাবি করেছেন এই সংখ্যা ৩০ লাখ।[১৬]

চীন প্রথমে একদম অস্বীকার করে বসল। না! এমন কোনো স্থাপনাই নেই! পরে অবশ্য বলল এগুলো রিএডুকেশন সেন্টার বা ভোকেশনাল সেন্টার। এখানে উইঘুরদের হাতেকলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাদের চাকরির বাজারের জন্য যোগ্য করে তোলা হয়। সেই সাথে যাদের চিন্তাভাবনায় কিছুটা সমস্যা আছে, তাদের সমস্যার সমাধান করা হয়। ব্রেনের ভাইরাস দূর করা হয়।[১৭]

কিন্তু বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ চিৎকার করে প্রকাশ করে দিলো বীভৎস নির্মম এক সত্য। রিএডুকেশন সেন্টার বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প যা-ই বলা হোক না কেন, এগুলোতে চরম নির্যাতন করা হয় বন্দী উইঘুর ও কাযাখ মুসলিমদের ওপর। ব্রেইনওয়াশ করা হয়। মুসলিম পরিচয় ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার ঠিক সেগুলোই করা হয়। চীন একেবারে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে উইঘুর, কাযাখ মুসলিম সত্তাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।[১৮]

---

[১৫] Human Rights Watch বলছে ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাচ্ছে চীন। China: Free Xinjiang 'Political Education' Detainees. Human Rights Watch, September 10th, 2017. https://tinyurl.com/y8g8epmx

[১৬] China holds one million Uighur Muslims in concentration camps, Khaled A Beydoun. Al Jazeera, September 13th, 2018. https://tinyurl.com/yayyo95p

পূর্ব তুর্কিস্তানের কৃষি অধিদপ্তরের ফাঁস হয়ে যাওয়া একটা প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, চীন সরকারের পরিকল্পনা হলো গণহারে সবাইকে ক্যাম্পে পাঠানো। 'বাদ যাবে না কোনো সক্ষম মানুষ' এই হলো তাদের নীতি। বাড়িতে থাকবে শুধু শিশু, অতিবৃদ্ধ মানুষ, অসুস্থ বা দুর্বল মহিলারা।

'We're a people destroyed': why Uighur Muslims across China are living in fear, Gene A Bunin. The Guardian, August 7th, 2018. https://tinyurl.com/yccvp8b8

[১৭] China's Jaw-Dropping Family Separation Policy, Sigel Samuel. The Atlantic, September 4th, 2018. https://tinyurl.com/yalnebm6

[১৮] লিকড হয়ে যাওয়া চীন সরকারের ৪০০ পৃষ্ঠারও বেশি গোপন এই ডকুমেন্ট বেশ শক্তিশালী একটি প্রমাণ 'Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How China Organized

১৯৪৯ সালের দিকে একটি বই প্রকাশিত হয়। লেখক জর্জ অরওয়েল। বইয়ের নাম '১৯৮৪' (Nineteen Eighty-Four: A Novel)। এই বইয়ে বলা হয় ভবিষ্যতের এক সর্বগ্রাসী পুলিশি রাষ্ট্রের কথা–BIG BROTHER.

BIG BROTHER সার্বক্ষণিক নজরদারি চালায়। সব কথা শোনার, সবকিছু দেখার চেষ্টা করে। কেউ BIG BROTHER-এর মতের বিরুদ্ধে গেলেই আযাব নেমে আসে তার ওপর।

অরওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তবে ১৯৮৪ সালে না; ২০২০ সালে। চীনে। পাঠক, যে বর্ণনা আপনি শুনতে যাচ্ছেন তা হয়তো সায়েন্স ফিকশনের মতো লাগবে, কিছুটা অবিশ্বাস্য ঠেকবে। কিন্তু এর পুরোটাই সত্যি!

নিরাপত্তার চাদরে একেবারে মুড়ে ফেলা হয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তানকে। তাদের অগোচরে একটা পাখিও যেন এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে চায় চীনের কমিউনিস্ট সরকার।

পূর্ব তুর্কিস্তানে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে বিস্তৃত ক্যামেরা সারভেইলেন্স বা নজরদারি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে চীন। বিবিসির ভাষায় পূর্ব তুর্কিস্তানে চীন এক 'All seeing State' তৈরি করেছে। পুরো পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে লাগানো হয়েছে ফেসিয়াল রিকগনিশন ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭ কোটি সিসিটিভি ক্যামেরা! অফিশিয়াল ডাটা বলছে ২০২০ সালে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের পর্যবেক্ষণ করার কাজে চীন ব্যবহার করতে চলেছে প্রায় ৬৩ কোটি সিসি ক্যামেরা! চিন্তা করতে পারেন একবার! যেখনে উইঘুর কাযাখদের জনসংখ্যা আড়াই কোটির কাছাকাছি সেখানে সিসি ক্যামেরার সংখ্যা ৬৩ কোটি! কী একটা অবস্থা![১৯]

এই সিসি ক্যামেরাগুলো যে কী করতে পারে না সেটাই এক রহস্য! সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রত্যেক পথচারীর চেহারা চিহ্নিত করে ফেলতে পারে। আরও কম সময়ে বলে দিতে পারে এই পথচারীর আইডি নম্বর, নাম। কার সাথে চেহারার মিল আছে, কোন গোত্রের, ধর্ম কী, আত্মীয় কারা, কাদের

Mass Detentions of Muslims, Austin Ramzy & Chris Buckley. The New York Times, November 16th, 2019. https://tinyurl.com/vavm8d3

[১৯] China: "the world's biggest camera surveillance network". BBC News, December 25th, 2017. https://tinyurl.com/y86ff6ne

Beyond Orwell's Worst Nightmares: How China Uses Artificial Intelligence to Commit Genocide. Konstantin Salomatin and Shura Burtin. Byline Times, November 18th, 2019. https://tinyurl.com/vchgu3y

সাথে ওঠাবসা করে, গত এক সপ্তাহে কোথায় কোথায় তাকে দেখা গেছে, এখন সে ঠিক কোন জায়গায় আছে—বলে দিতে পারে নাড়িনক্ষত্র সব।

যদি কোনো পথচারী জোরে হাঁটে বা আস্তে হাঁটে, যদি কারও চেহারার এক্সপ্রেশন স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন কিছু হয়, যদি কোনো পথচারী ভুল জায়গায় চলে যায়, কারও গতিবিধি একটু যদি অস্বাভাবিক মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বরত পুলিশের কাছে তথ্য চলে যাবে। ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে ভেসে উঠবে সেই পথচারীর চেহারা—খুঁটিনাটি সব তথ্যসহ। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে হতভাগাকে ঘিরে ধরবে পুলিশ।[২০]

সবগুলো গাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে জিপিএস ইন্সটল করিয়েছে পুলিশ। ক্যামেরার পুরো কন্ট্রোল পুলিশের হাতে, চাইলেই তারা ক্যামেরা চালু কিংবা বন্ধ করতে পারে। ইচ্ছেমতো ঘোরাতে পারে চারিদিকে। রাস্তায় বসানো ডিপ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-সমৃদ্ধ সিসি ক্যামেরা চাওয়ামাত্র জানিয়ে দেবে ড্রাইভারের নাম-পরিচয়, কত স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে, হুটহাট করে গতি কমবেশি করছে কি না, নো পারকিং জোনে পারকিং করছে কি না... সব।

শুধু তাই না, ক্যামেরার সাহায্যে যেকোনো জায়গায় ভার্চুয়াল ফেন্স তৈরি করা যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কেউ ভার্চুয়াল বেড়ায় ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। ফনা তোলা সাপের মতো ছুটে আসবে পুলিশ। রেফারেন্সের ভিডিওগুলো দেখলে পরিষ্কার ধারণা পাবেন, চীন সরকার কী ব্যাপকমাত্রায় নজরদারি করছে সিসিটিভি দিয়ে :

China: “the world’s biggest camera surveillance network” - BBC News- https://tinyurl.com/y86ff6ne

Chinese Street surveillance. Object / Face Recognition-https://tinyurl.com/y85sg47b

Life Inside China’s Total Surveillance State- https://tinyurl.com/y7rvnpvn

A Surveillance State Unlike Any the World Has Ever Seen-https://tinyurl.com/tevpymk

যত ধরনের নতুন প্রযুক্তি আছে সবকিছু পূর্ব তুর্কিস্তানে নিয়ে এসে পরীক্ষা করছে চীন। টাকা খরচ করছে জলের মতো।[২১]

---

[২০] A Surveillance State Unlike Any the World Has Ever Seen, Bernhard Zand. Der Spiegel, July 26th, 2018. https://tinyurl.com/tevpymk

[২১] This Is What A 21st -Century Police State Really Looks Like, Megha

পূর্ব তুর্কিস্তানে গেলে মনে হবে পথ ভুল করে বোধহয় কোনো যুদ্ধের ফ্রন্টে চলে এসেছেন। একটু পরপরই দেখবেন গম্ভীর ভঙ্গিতে রাস্তায় বিশ্রাম নিচ্ছে চাইনিয 'টাইপ ৯৯ এ' ট্যাংক। আর্মার্ড কার, পুলিশ ভেহিকলের সাইরেনে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে এলাকা। ওপরের ফাঁকা জায়গাতে শিল্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে মাল্টি ব্যারেল মেশিনগানের ট্রিগারে হাত রেখে কড়া চোখে পথচারীদের মাপছে মিলিটারি! পুলিশ, সোয়াট, মিলিটারি, প্যারামিলিটারিতে একেবারে গিজগিজ করছে। পা ফেলার জায়গা যেন নেই। আগাগোড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকে ওরা–রায়ট গিয়ার, ফুল ইউনিফর্ম, হেলমেট, চেস্টগার্ড, হাতে ট্রেডমার্ক এসাল্ট রাইফেল QBZ-95!

২০১৫ সালের চাইতে ৬ গুণ বেশি পুলিশ নামানো হয়েছে এখন। পূর্ব তুর্কিস্তান বিশেষজ্ঞ আদ্রিয়ান যেনয জানাচ্ছেন, 'আগের ৭ বছর ধরে যত অফিসার নিয়েছিল পূর্ব তুর্কিস্তান পুলিশ, তার দ্বিগুণ অফিসার নিয়েছে এই দুই বছরে!'

'পুলিশি রাষ্ট্রের' একদম পারফেক্ট উদাহরণ হলো চীন। হিটলারের পতনের আগে জার্মানিজুড়ে এমনই পুলিশি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল নাৎসিরা। কিন্তু নজরদারির দিক থেকে অতীত-বর্তমানের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে চীন। নতুন সহস্রাব্দে চীন নতুন মাত্রা দিয়েছে ফ্যাসিজমকে।[২২]

রাস্তায় প্রতি ১০০ মিটার পরপর রোডব্লক তৈরি করে রেখেছে পুলিশ। চেকপয়েন্টগুলোতে হাত এবং বডি স্ক্যানার দিয়ে তল্লাশি করা হয় আপাদমস্তক। আইডি কার্ড স্ক্যান করা হয়, বাদ যায় না আইরিসও (চোখের মণি)।

পাবলিক ফ্যাসিলিটিতে (যেমন : হাসপাতাল, ব্যাংক, পার্ক, শপিংমল) ঢোকার আগে কিংবা মটর সাইকেল বা গাড়িতে তেল নেয়ার সময়ও উইঘুর, কাযাখদের মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। দুটো আলাদা চেক পয়েন্টে ওদের তল্লাশি করা হয়। পুরো ব্যাপারটা সমন্বয় করা হয় IJOP (Integrated Joint Operations Platform) নামের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার দিয়ে।

Rajagopalan. Buzzfeed News, October 17, 2017. https://tinyurl.com/wo78pex

AP Exclusive: Digital police state shackles Chinese minority, Gerry Shih. Associated Press, December 17th, 2017. https://tinyurl.com/strpg3e

[২২] A Surveillance State Unlike Any the World Has Ever Seen, Bernhard Zand. Der Spiegel, July 26th, 2018. https://tinyurl.com/tevpymk

In China's far west the 'perfect police state' is emerging, Tom Phillips. The Guardian, June 23rd, 2017. https://tinyurl.com/y7cvp6mo

China: facial recognition and state control | The Economist. October 24th, 2018. https://tinyurl.com/t3qz28o

২০১৭ সাল থেকে ১২-৬৫ বছরের সব মুসলিমের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ডিএনএ টেস্ট। চেহারা এবং শরীরের ছবি তোলা হয়েছে বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে। রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে, করা হয়েছে রেটিনা স্ক্যান। বাদ যায়নি চুল এবং ভয়েস রেকর্ডিং স্যাম্পল নেয়াও।

প্রত্যেকটা চেক পয়েন্টে এআই সিস্টেম থ্রিডি ছবি তোলে, আইডি স্ক্যান করে, স্ক্যান করে ব্যক্তির সাথে থাকা সব জিনিসপত্র। খুঁটিনাটি সকল তথ্য যাচাই-বাছাই করার পর ফলাফল দেখায় ডিসপ্লেতে–'এ ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নিরাপদ, একে যেতে দেয়া হোক', অথবা 'এ ব্যক্তি ঝুঁকিপূর্ণ'। ঝুঁকির মাত্রার ওপর নির্ভর করে পুলিশকে বলে দেয়া হয় কী করতে হবে–তাৎক্ষণিক জিজ্ঞাসাবাদ, আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ইন্টারোগেশন রুমে নিয়ে যাওয়া, নাকি গ্রেফতার করে একেবারে কারাগারে পাঠানো।

সব মুসলিম নাগরিককেই বাধ্যতামূলকভাবে তাদের স্মার্টফোনে জিংওয়াং নামের একটা অ্যাপ ইন্সটল করতে হয়েছে। ব্যবহারকারীদের সকল তথ্য (কন্ট্যাক্ট লিস্ট, ফোনে কী কী পড়া হলো, কী কী লেখা হলো, কোথায় কোথায় ফোন করা হলো, ব্যবহারকারীর অবস্থান কোথায় ইত্যাদি) সংগ্রহ করে IJOP সফটওয়্যারে পাঠিয়ে দেয় এই অ্যাপ। এই অ্যাপ ছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অ্যাপ আনইন্সটল বা স্লিপ মোডে রেখে দেয়া বা অন্য কারও মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৩৬টা কাজকে সন্দেহজনক লেবেল দিয়ে কোড করা হয়েছে এই অ্যাপে। সেই 'সন্দেহজনক' কাজগুলোর কিছু নমুনা শুনবেন?

খুব বেশি বই পড়া, বেশি বেশি খাবারের অর্ডার করা, সাধারণের তুলনায় বেশি ইলেকট্রিক বিল আসা ইত্যাদি!

যখন তখন বাসে বা ট্রেনে উঠে কিংবা রাস্তায় উইঘুর ও কাযাখদের থামিয়ে মোবাইল চেক করে স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ, প্যারামিলিটারি বা মিলিটারির সদস্যরা। মোবাইলে জিংওয়াং অ্যাপ না থাকলে ধরে নিয়ে যায়। সেই সাথে ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ভিপিএন টাইপের কোনো অ্যাপস আছে কি না চেক করে। এগুলো থাকলে কোনো কথা ছাড়াই চালান করে দেয় কারাগারে। চীনে শুধু উইচ্যাট[২৩] ব্যবহার করার অনুমতি আছে। উইচ্যাটে কেউ পলিটিক্স বা ইসলাম নিয়ে কিছু লিখেছে কি না সেটাও চেক করা হয়। চেক করা হয় ফোনে ইসলামী কন্টেন্ট, নারী আত্মীয়ের হিজাব পরা ছবি, বিদেশি কারও ফোন নম্বর সেইভ করা আছে কি না। কোন কোন সাইটে ভিজিট করা হয়েছে দেখা হয় সেটাও।

---

[২৩] চীনের একটি সামাজিক যোগাযোগ ও মেসেজিং অ্যাপ

উইঘুরদের বাসার ভেতরেও সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে চীন সরকার। পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট এলাকায় রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়েছে প্রত্যেক উইঘুরদের। এর বাইরে কোথাও যেতে হলে অবশ্যই পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। নির্ধারিত এলাকার বাইরে কেবল ৩০০ মিটার গেলেই খবর চলে যায় পুলিশের কাছে। উইঘুরদের জন্য ২৭টি মুসলিম দেশে ভ্রমণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ![২৪],[২৫]

জীবনযাত্রা একেবারে গতি হারিয়েছে। সারাক্ষণ অজানা এক ভয় ও অস্বস্তিতে ভোগে প্রত্যেক উইঘুর।

নিরাপত্তার এই কড়া ব্যবস্থায় হাঁপিয়ে উঠেছে খোদ হান চাইনিযরাও; যাদের হাতে উইঘুররা নির্যাতিত হচ্ছে বলে দাবি করছে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মীরা।

মদের দোকানদার লি কিয়াং মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলছিল, ‘এখানকার অবস্থা আসলেই খুব টাইট। কারোরই কোনো কিছু করার আগ্রহ নেই। পুলিশ এতবার আমার আইডি চেক করে যে, আমি বাইরে বের হতেই চাই না। বাজার করা বাদ দিয়ে দিয়েছি।’

মদের গন্ধভরা নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরোল লি কিয়াং এর বুক থেকে। ঝরে পড়ল খানিক অবসাদ।[২৬]

হান চাইনিযদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে কাযাখ ও উইঘুর মুসলিমদের কী অবস্থা হতে পারে ভাবুন একবার!

একদম আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে উইঘুরদের! জর্জ অরওয়েলের সেই উপন্যাসের মতোই–

BIG BROTHER is watching you!

এই বেঁধে ফেলা যে কতটা ব্যাপক, কতটা সর্বগ্রাসী তা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকবে পাঠকের কাছে।

---

[২৪] Beyond Orwell’s Worst Nightmares: How China Uses Artificial Intelligence to Commit Genocide. Konstantin Salomatin and Shura Burtin. Byline Times, November 18th, 2019. https://tinyurl.com/vchgu3y

[২৫] This Is What A 21st -Century Police State Really Looks Like, Megha Rajagopalan. Buzzfeed News, October 17, 2017. https://tinyurl.com/wo78pex

[২৬] Life Inside China’s Total Surveillance State, Wall Street Journal. December 20th, 2017. https://tinyurl.com/y7rvnpvn

রক্তগোধূলি
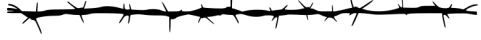
পাথুরে এক গলি ধরে হেঁটে যাচ্ছি ১০ মিনিট যাবৎ।[২৭] গলির দুপাশ ধরে বহুতল ভবনের গা-জুড়ে ঝুলছে বহুরঙা নিয়ন সাইনবোর্ড। রেস্টুরেন্টগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ফুটপাতে। সিল্কগাছের ছায়ায় ছায়ায় বেঞ্চ পাতা। শূন্য বেঞ্চ অবাক করল আমাকে। চোখ বন্ধ করে এক বছর আগের দৃশ্য মনে করার চেষ্টা করলাম– শোরগোল, টুকরো টুকরো হাসি, শ্লেষ মেশানো মন্তব্য, শিশুর কচি গলায় আদুরে আবদার, হঠাৎ হঠাৎ তীক্ষ্ণ কোনো শোরগোল ছুট শব্দ, নাকে সজোরে ধাক্কা দেয়া চা আর কাবাবের সুঘ্রাণ। বেশ জমজমাট, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিল জায়গাটা। এখন দেখে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত কোনো নগরী। অসীম শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথ।

জায়গাটাতে আমি আসতাম মাঝে মাঝেই। এখানকার কবুতরের কাবাব আর দুধ চায়ের স্বাদ এখনো জিবে লেগে আছে। শেষ এসেছিলাম এক বছর আগে। দোকানদার অভিমান ভরা গলায় অনুযোগ জানিয়েছিল, 'আপনি তো আমাদের ভুলেই গেছেন। আর আসেন না।' জি, ঠিকই ধরেছেন, খুবই আন্তরিক এখানকার লোকেরা। হাসিখুশি চমৎকার সব মানুষ।

এক বছর পরে আবার এখানে আসলাম। অনেক কিছু বদলে গেছে এই এক বছরে।

---

[২৭] Gene A Bunin একজন লেখক,অনুবাদক, গবেষক। পূর্ব তুর্কিস্তানে উইঘুরদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন ২০০৮ সাল থেকে। বর্তমানে কাযাখস্তানের আলমাটি শহরে থেকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইংরেজি পত্রিকা *The Gurdian* এ প্রকাশিত তার 'We're a people destroyed': why Uighur Muslims across China are living in fear- https://tinyurl.com/yccvp8b8 প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা হয়েছে এই লেখাটি।

সবচেয়ে বেশি বদলেছে বোধহয় উইঘুর মুসলিমদের জীবন। রেস্টুরেন্টগুলোর বেশির ভাগ কর্মীকে বাধ্য করা হয়েছে দেশের বাড়ি চলে যেতে। কাউকে কাউকে রিএডুকেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে, আর কারও ওপর ঝুলছে শহর ত্যাগ না করার নিষেধাজ্ঞা। বিষণ্ণ কণ্ঠে এক দোকানমালিক জানালেন, স্টাফরা চলে যাওয়ায় কবুতরের কাবাব আর দুধ চা আগের মতো আর সুস্বাদু হয় না। 'উইঘুর বাবুর্চি এখন আর পাওয়াই যায় না। আর ওদের মতো অন্য কেউ রাঁধতেও পারে না। কী একটা অবস্থা দেখুন। ওরা চলে যাওয়ার পর কাস্টোমার আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।'

এতদিন পর এখানে আসা শুধু খাবারের লোভে না; আমি করিমকে খুঁজতে এসেছি। এক বছর... না, আরেকটু বেশি হবে বোধহয় করিমের সঙ্গে আমার পরিচয়ের। করিম, একজন উইঘুর মুসলিম। রেস্তোরাঁর মালিক। চায়না প্রপারের[২৮] শহরগুলো যেমন ধরুন বেইজিং, সাংহাই, গুয়ানঝোতে উইঘুরদের দেখা খুব কমই পাওয়া যায়। এখানকার ৯০ শতাংশ মানুষ হান গোষ্ঠীর। উইঘুর মুসলিমরা তাদের ঘাঁটি পূর্ব তুর্কিস্তান ছেড়ে চায়না প্রপারের শহরগুলোতে এসে চাকরি বা ব্যবসার সুযোগ তেমন একটা পায় না। এক দশকের বেশি সময় ধরে উইঘুরদের ভাষার ওপর গবেষণা করছি আমি। কাজটা আনন্দের, কিন্তু আনন্দের কাজও লম্বা সময় নিয়ে করলে একঘেয়েমি চলে আসে। অমৃতে অরুচি ধরে। স্বাদ বদলানোর জন্য তাই ভাবলাম উইঘুরদের খাবার নিয়ে কিছু কাজ করা যাক। রান্নাবান্নায় উইঘুরদের খ্যাতি প্রবাদতুল্য।

কিন্তু চায়না প্রপারে আদৌ উইঘুরদের রেস্তোরাঁ আছে কি না বা থাকলেও কয়টা, তা নিয়ে সন্দিহান ছিলাম। এমন সময় করিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো আমার। আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম যেন।

চায়না প্রপারের ৫০টা শহরে প্রায় ২০০টা উইঘুর রেস্টুরেন্টে গিয়েছি আমি। মালিক, ম্যানেজার, ওয়েটার, বাবুর্চিদের সাথে আলাপ হয়েছে। আলাপ গড়িয়ে সখ্য হয়েছে। কিন্তু করিমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব একটু বেশিই গাঢ় ছিল।

উফ! রাঁধতে পারে বটে করিমের বাবুর্চি! সেই কবে ওর রেস্তোরাঁয় পোলাও আর লাগমান নুডুলস খেয়েছিলাম। এখনো তার স্বাদ লেগে আছে জিবে!

করিম খুবই হাসিখুশি, আন্তরিক, মিশুক মানুষ। দেখলেই ভালো লাগে এমন কিছু মানুষ থাকে না? করিম ও রকমই একজন। ওর রেস্তোরাঁয় যখনই গেছি হাসিমুখে বুকে টেনে নিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। খাবার খেতে খেতে কত কথা হতো ওর সাথে।

---

[২৮] ইনার মঙ্গোলিয়া, তিব্বত এবং পূর্ব তুর্কিস্তান এই প্রদেশগুলো বাদ দিয়ে চীনের বাকি অংশ। চায়না প্রপারকে ইনার চায়নাও বলা হয়ে থাকে অনেক সময়।

আলাপ করে আরাম পেতাম। ওর সেন্স অফ হিউমার খুব ভালো।

এমন অনেকবারই হয়েছে, তাড়াহুড়োর মাঝে খেতে গেছি ওর ওখানে। যাব, খাব আর চলে আসব—এই ছিল প্ল্যান। খাবার সময় করিম পাশে এসে বসল। আলাপ জুড়ে দিলো। ব্যস শুরু হলো আড্ডা। দুই-তিন ঘণ্টা ফুড়ুৎ করে কোথায় উড়ে যেত টেরও পেতাম না।

করিমের রেস্তোরাঁ যেন এক চুম্বক। টেনে ধরে রাখত আমাকে। কোনো কাজ না থাকলেও স্রেফ আড্ডা দেবার জন্যেই যেতাম ওর ওখানে।

আড্ডা জমে উঠেছে একদিন। এ কথা সে কথা হতে হতে আলোচনা মোড় নিল চায়না প্রপারের শহরগুলোতে উইঘুররা কতটা বৈষম্যের শিকার হয় সে দিকে। রাতের খাবার খেতে আসা বেশ কয়েকজন উইঘুর মুসলিম বললেন, 'জানেন, হোটেলগুলোতে আমাদের রুম ভাড়া দেওয়া হয় না প্রায়ই। বলা হয়, হোটেলে নাকি ঘর খালি নেই। অথচ হোটেলে এন্তার খালি ঘর পড়ে থাকে।'[২৯]

'আরে, সেদিন এক উইঘুর পুলিশ অফিসারকে পর্যন্ত এই অজুহাত দেখিয়ে ঘর ভাড়া দেয়নি হোটেলের ওরা!' শুকনো, কষ্টের একটা হাসি হেসে বললেন আরেক কাস্টোমার।

গলা খাঁকারি দিয়ে নড়েচড়ে বসল আমাদের করিম। সবার চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। কেলো একটা হাসি দিয়ে কথা শুরু করল, 'এভাবে কেউ হোটেল রুম চায় নাকি? এসো আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে রুম ভাড়া করতে হয়। ভাবসাব নিয়ে রিসেপশনে যাবে। তারপর চোস্ত ইংরেজিতে বলবে আপনাদের এখানে ঘর ফাঁকা আছে? দেখবে, হুজুর হুজুর করতে করতে তোমাকে ঘর ভাড়া দেবে ওরা। তবে...'

'আপনার কাগজপত্র যখন চেক করতে চাইবে তখন কী করবেন? আইডি কার্ড দেখে ঠিকই তো বুঝে ফেলবে আপনি উইঘুর।' ত্যাঁদড় ছোকরা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় করিমকে।

ওস্তাদি হাসিটা মুছে ফেলে করিম বলল, 'কাগজ দেখতে চাইলে অবশ্য আর কোনো উপায় নেই। বেশ কয়েকটা হোটেলে রিসেপশনের ওরা আমার ইংরেজি শুনে তব্দা খেয়ে স্যার স্যার করতে করতে ঘর ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু যেই না কাগজপত্র চেক করে বুঝে ফেলল আমি উইঘুর, সঙ্গে সঙ্গে বুকিং ক্যান্সেল করে দিলো।' করিম অভিনয় করে দেখাল, '...অন্য হোটেলে দেখতে পারেন, এখানে ঘর খালি নেই।'

---

[২৯] Tibetans, Uyghurs 'Blacklisted' at Hotels in Chinese Cities. Radio Free Asia. May 14th, 2015. https://tinyurl.com/wohokur

করিমের অভিনয়ে হাসির রোল উঠল সবার মধ্যে।

শুকনো, প্রাণহীন, কষ্টের ব্যথাতুর হাসি!

চায়না প্রপারে উইঘুরদের যে বৈষম্যের শিকার হতে হয় এটা তার খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ। বলতে পারেন হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

২০১৭ এর বসন্তে চায়না প্রপারে বসে করিমরা যখন এসব বৈষম্যের ব্যাপারে আলোচনা করে চায়ের কাপে ঝড় তুলছে, তখন তাদের নিজেদের প্রদেশ পূর্ব তুর্কিস্তানে নরক গুলজার করে ছাড়ছে চীন সরকার। সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে উইঘুরদের ওপর। গালভরা নাম দিয়েছে এই আগ্রাসনের–'ধর্মীয় উগ্রবাদ আর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। নারকীয় এই মহাযজ্ঞের মাস্টারমাইন্ড হলো চেন চোয়াংগোয়া পূর্ব তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি। লোকটা পুরোনো পাপী। তিব্বতেও এর আগে একইভাবে মানুষের চোখের জল ঝরিয়েছিল সে।

চীন সরকার বারবার দাবি করেছে, পূর্ব তুর্কিস্তানে চালানো তাদের সকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো চীনের মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদের শেকড় উপড়ে ফেলা। তবে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, পূর্ব তুর্কিস্তানে উইঘুরদের সাথে চীন যা কিছু করছে তার কেবল একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে–জাতিগত নিধন! উইঘুরদের শেষ চিহ্নটুকুও পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা...

পরিত্যক্ত পাথুরে রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘোরাফেরার পর শেষমেশ করিমের খোঁজ মিলল।

করিম মারা গেছে!

চীন সরকার নিজ হাতে খুন করেছে ওকে!

একদিন ট্রাকভর্তি পুলিশ আসে করিমের রেস্তোরাঁয়। আরও অনেক উইঘুরের মতো হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ধরে নিয়ে যায় ওকেও। বিনা বিচারে জেল দেয়া হয়। কারাগারের অমানুষিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। মারা যায় করিম।

'ধর্মীয় উগ্রবাদ আর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে' চীনা সরকারের যুদ্ধের বলি হতে হয়েছে আমার বন্ধু করিমকে। হাসিখুশি, ভালোমানুষ করিম।

করিম মারা যাবার বছরটাতেও বসন্ত ঠিকই এসেছিল পূর্ব তুর্কিস্তানে। চেরী ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল পথঘাট, বসন্তের অলস বাতাস উপত্যকা থেকে বয়ে নিয়ে এসেছিল ল্যাভেন্ডারের সৌরভ, মাতাল হয়ে গান গেয়েছিল পাখি, আদিগন্ত ভালোলাগায়

ভরেছিল চারপাশ। কিন্তু সে আনন্দে, সে ভালোলাগায় উইঘুরদের কোনো ভাগ নেই–সব হারানোর শুরুটা শুরু হয়েছে তাদের এই বসন্তে! কী হারায়নি ওরা?

প্রিয়জন? আত্মপরিচয়? স্বাধীনতা? বেঁচে থাকার অধিকার? হারিয়েছে এর চেয়েও অনেক বেশি!

ঘন বিষাদের চাদর মুড়ি দিয়ে আছে সারা শহর। পথঘাট নির্জন, সুনসান, নিথর। বাতাসে থমথমে একটা ভাব। মহাপ্লাবন আসার ঠিক আগের পরিস্থিতি যেন। উইঘুর ব্যবসায়ীরা সবাই শামুকের মতো আড়ষ্টতার খোলসে ঢুকে গেছে।

'দিনকাল কেমন যাচ্ছে', 'কেমন আছেন'–এ রকম প্রশ্নের উত্তরে উইঘুর মুসলিমরা কখনো জীবন নিয়ে অনুযোগ জানায় না। এ রকম করা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। যতই সমস্যা থাকুক, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে এক গাল হাসি নিয়ে দরাজ গলায় উত্তর দেয়, 'খুব ভালো আছি'।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে আমূল। আমি নিজের কানেই অজস্রবার শুনলাম উইঘুররা বলছে, 'খুব একটা ভালো দিন যাচ্ছে না, ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ'।

রাস্তায় হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল পুরোনো এক ট্যুর গাইডের সঙ্গে। গত বছর ওর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। ওকে দেখে চমকে উঠলাম। হাড্ডিসার হয়ে গেছে, পাণ্ডুর মুখে যেন হতাশা ঝুলে আছে। 'এত শুকিয়ে গেলে কেন?' ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ওর ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'এই এক বছরে আমরা সবাই আসলে শুকিয়ে গিয়েছি' খুকখুক করে একটু কেশে নিয়ে ও বলল।

সবাই কেমন যেন ভীতসন্ত্রস্ত। সতর্ক। আড়ষ্ট। পুলিশি নির্যাতনের অজানা আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে তরুণ উইঘুর ওয়েটার বা বাবুর্চিরা। এই বুঝি তাদের ওপর অলঙ্ঘনীয় হুকুম চলে এল–বাক্স-পেটরা গুছিয়ে বাড়ির পথ ধরো...

২৪/৭ প্রসাশনের কড়া নজরদারির ভয়ে সুর কেটে গেছে উইঘুরদের হাসিখুশি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা জীবনযাত্রার। একবার এক রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের সাথে গল্প করছিলাম আমি। নানান বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। আলাপ বেশ জমে উঠেছে। কথায় কথায় উইঘুরদের প্রতি বৈষম্যের প্রসঙ্গ চলে এল। পূর্ব তুর্কিস্তানে উইঘুরদের ওপর চালানো অত্যাচারের কথাও এল। হাসিখুশি সদালাপী ম্যানেজারের অস্বস্তি টের পেতে শুরু করলাম। 'জানেন, আমার এক বন্ধুকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বেচারার অপরাধ ছিল ভুল বই (কুরআন, ধর্মীয় বই) নিজের কাছে রাখা।' আমার কথা

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের মুখের সব রক্ত সরে গেল। 'জেল' শব্দটা শোনামাত্র সাপ দেখার মতো চমকে উঠলেন যেন। ফ্যাকাশে চেহারায় ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার পেছনে একজন পুলিশ অফিসার বসা।' এটুকু বলেই সটান উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেলেন রেস্টুরেন্ট থেকে।

নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক উইঘুর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উইচ্যাট (চীনে ফেইসবুক নেই) থেকে সব বিদেশি বন্ধু কিংবা বিদেশে থাকা আত্মীয়দের নম্বর মুছে দিয়েছে। বিদেশি নম্বর ফোনে থাকা খুবই বিপজ্জনক। পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করল খুব। ও আমাকে এর মধ্যেই উইচ্যাট থেকে ডিলিট করে ফেলেছে। একটা প্রক্সি অ্যাপ ব্যবহার করে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, তারপর আমন্ত্রণ জানালাম দেখা করার।

দেখা না হলেই ভালো হতো বোধহয়। টেবিলের দুইপ্রান্তে মুখোমুখি বসে নিঃশব্দে খাচ্ছিলাম আমরা। অস্বস্তিকর নীরবতা ঝুলছিল আমাদের মাথার ওপর। বুকের মধ্যে কত কথা যে ঘাই মারছিল, কত কিছু যে বলার ছিল—কিছুই বলতে পারছিলাম না। অজানা আতঙ্কে, অজানা ভয়ে সবকিছুই নিষিদ্ধ মনে হচ্ছিল। মুখে নেওয়া যাবে না, কথা বলা যাবে না। কেউ আমাদের দেখছিল না, কিন্তু আতঙ্কের ছকে বাঁধা অভ্যস্ত জীবনযাপন করে আসা আমার বন্ধু স্বাভাবিক হতে পারছিল না। উদ্বিগ্ন মুখে টানটান হয়ে বসে থাকল পুরোটা সময়। কিছু বই ওর দিকে এগিয়ে দিলাম আমি। মৃদু কণ্ঠে জানালাম, 'এগুলো নিয়েই এখন কাজ করছি আমি।' বইগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল সে। ছুঁয়েও দেখল না। ছোট্ট করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আচ্ছা'।

আমাদের দুজনেরই পরিচিত আরেক বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুর কথা জানতে চাইলাম ওর কাছে। মুখের রং বদলে গেল ওর। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল 'কার কথা বলছ তুমি? ওকে আমি চিনি না। এই যে আমার সামনে বসে আছো তুমি। এখন থেকে আমি তোমাকেও চিনি না। তুমি কে ভাই? কী চাও আমার কাছে?'

উইঘুরদের সাথে পরিচয় থাকার কারণে নজরদারি আর হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বিদেশিদেরও। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। কাশগড়ে ছিলাম আমি তখন। মরুভূমির কোলঘেঁষে বেড়ে ওঠা এই শহরটা কিরগিস্তান, তাজিকিস্তান এবং পাকিস্তান এই তিন দেশেরই সীমান্তের কাছে। হোটেল থেকে আমাকে প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো ওরা। কথা নেই বার্তা নেই একদিন হুট করে হোটেল বন্ধ হয়ে গেল। বলা হলো ফায়ার সেইফটির জন্য নাকি হোটেল বন্ধ!

মালপত্র নিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লাম আমি। থাকার সম্ভাব্য সকল জায়গা থেকে ফিরিয়ে দেয়া হলো আমাকে। বুঝে ফেললাম এরই মধ্যে মেসেজ চলে এসেছে ওদের সবার কাছে। ব্ল্যাকলিস্টে উঠে গেছে আমার নাম। পূর্ব তুর্কিস্তান ছাড়তে হলো।

ইইউতে চলে আসলাম। চীনের পূর্বে উপকূলবর্তী একটা অঞ্চলে। জায়গাটা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুবই বিখ্যাত। পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের পশ্চিমাঞ্চলে আর ইইউ পূর্বাঞ্চলে। প্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার ব্যবধান। এতদূর চলে আসলাম, তবু পিছু ছাড়ল না টিকটিকির দল। দুবার আমাকে ডেকে সতর্ক করল ওরা (পড়ুন শাসালো) 'চীনের আইনকানুন মেনে চলুন'। উইঘুরদের সাথে মাখামাখি করতে যাবেন না। ওরা 'দুষ্টু' লোক।

জীবনের সেরা ১৮টা মাস কাটিয়েছিলাম এই 'দুষ্টু' লোকদের সাথেই। পূর্ব তুর্কিস্তানে অথবা চায়না প্রপারের শহরগুলোতে। রেস্তোরাঁর ওয়েটার, বাবুর্চি, ম্যানেজার, বড়-ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ী, ফুটপাতে খাবার দোকান সাজিয়ে বসা হকার, তাদের পরিবার... বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন ঘরানার কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো আমার গত ১৮ মাসে। এই 'দুষ্টু' লোকগুলো মিলেই আমাকে উপহার দিয়েছে জীবনের অন্যতম সেরা কিছু স্মৃতি।

পূর্ব তুর্কিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে এখন আর কেউ খোলাখুলি কথা বলে না। স্বাভাবিক নানা শব্দের আড়ালে অস্বাভাবিকতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে। যেমন এখানে একটু পরপরই আপনার কানে একটা শব্দ আসবে–'ইয়োক'–'এখানে নেই'।

'এই তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কী বলছি? ওই লোক আর এখানে নেই। নতুন একটা বাসায় গিয়ে উঠেছে', আমার এক বন্ধু এভাবেই একজনের রিএডুকেশন ক্যাম্পে যাবার সংবাদ দিলো। ফোনে কথা বলার সময়ও সরাসরি কেউ তাদের 'এখানে নেই' স্বজনদের ব্যাপারে কথা বলে না। সংকেত ব্যবহার করে–'আবহাওয়া কেমন আজকের? খাবার খেয়েছ?'... ইত্যাদি। রিএডুকেশন ক্যাম্পের কথা মুখে আনতেও মানুষ ভয় পায়।

গত এক বছরে 'আদেম ইয়োক' (সবাই চলে গেছে) এই কথাটা বোধহয় সবচেয়ে বেশি শুনেছি। কোনো স্টাফ, ক্রেতা বা সাধারণ কোনো মানুষের অনুপস্থিতি বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। আপনাকে কেউ যদি বলে অমুক লোক দেশের বাড়ি চলে গেছে, তাহলে বুঝবেন সেই লোক হয় হাউস এরেস্ট হয়ে আছে, অথবা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে গেছে বা এর চাইতেও খারাপ কোনো পরিণতি বরণ করেছে।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পকে কেউ সরাসরি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বলার সাহস দেখায় না। কার ঘাড়ে দুইটা মাথা? কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাওয়া বন্দীদের ব্যাপারে বলা হয়—ওরা পড়াশোনা করতে গেছে, স্কুলে গেছে, কারিগরি প্রশিক্ষন নিতে গেছে।

যুলুম, অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য... এই শব্দগুলো কেউ ভুলেও মুখে আনে না। পূর্ব তুর্কিস্তানের সামগ্রিক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়—'অবস্থা খুব একটা ভালো না', 'এখানে সবকিছুর বেশ কড়াকড়ি', ইত্যাদি।

এত রূপক, এত সাংকেতিক কথাবার্তার পরেও আড়াল করা যায় না পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রকৃত অবস্থা। ভুলে থাকতে চাইলেও, এড়াতে চাইলেও আপনি কোনোমতেই পারবেন না। শোষণ, যুলুম, হাহাকার, মৃত্যু, অশ্রু, রক্ত, স্বপ্নভঙ্গ সবকিছু উইঘুরদের জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে।

আমি পূর্ব তুর্কিস্তানের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় সর্বোচ্চ চেষ্টা করতাম রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো এড়িয়ে চলতে। রাজনীতি নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আমার ছিল না কখনোই। প্রাত্যহিক গৃহস্থালি জীবনের টুকিটাকি কথা, সুখ-দুঃখ নিয়ে আলাপ করতে চাইতাম। কিন্তু হান চাইনিযদের হাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওরা এমনভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে যে, ঘরোয়া আলাপের মধ্যেই সদর্পে, অমোঘ নিয়তির মতোই হাজির হতো রাজনীতি। উইঘুরদের ওপর চাইনিযদের চালানো যুলুমের কথকতা। বৈষম্যের কথা।

দুই-একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, আমি কোনো উইঘুর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বন্ধু,আজ সারাদিন কী কী করলে?'

গোমড়া মুখে সে বলল, 'কমিউনিস্ট পার্টির মিটিঙে ছিলাম সারাদিন। সব উইঘুরদের জন্য সেখানে থাকা বাধ্যতামূলক।'

দেখলেন তো কীভাবে চলে এল যুলুমের কথা।

আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজকাল অবসরে কোন কোন বই পড়ছ?'

উত্তর পাই, 'তোমার কি মাথাটাতা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বই পেলেই পুলিশ আমাদের সন্দেহ করবে। ওসব পড়া অনেক আগেই বাদ দিয়েছি। জীবনেরই নিশ্চয়তা নেই, এর মধ্যে বই পড়া বিলাসিতা। বই পড়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ।'

অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবলে হে? কী করবে তুমি?'

ওই বন্ধুর চোখের মণিজোড়া দপ করে জ্বলে ওঠে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে। 'আমি আসলে সারাজীবন ধরে মনেপ্রাণে চেয়েছি তুর্কি খাবারের বাবুর্চি হতে। তারপর ধরো একদিন

নিজেই একটা রেস্তোরাঁ খুলে ফেললাম। কিন্তু এখন তো আর সেটা সম্ভব না বন্ধু।'
ওর চোখের দীপ্তি নিভে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে শ্লেষাত্মক গলায় জানাল, 'এই কাজ এখন করতে চাইলে সরকার আমাকে সোজা পড়াশোনা করতে (কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে) পাঠিয়ে দেবে। উইঘুর মুসলিমদেরকে বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায় সরকার। বিদেশি কোনো মুসলিমের সাথে যোগাযোগের প্রমাণ থাকা মানেই সোজা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। কোনো কথা নেই... ডিরেক্ট ক্যাম্পে'।

শব্দ প্রচণ্ড শক্তিশালী, ক্ষমতাবান। শব্দের একটু হেরফের অনেক সময় তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। তবে কখনো কখনো এমন কিছু ঘটনা ঘটে, প্রচণ্ড শক্তিশালী শব্দরাও এসে মাথা নিচু করে পরাজয় বরণ করে নেয় তার কাছে। হাতজোড় করে জানিয়ে দেয়—ঘটনার ভার বহন করতে আমরা অক্ষম! উইঘুরদের যে অবস্থা আমি দেখেছি তা বর্ণনা করার কোনো শব্দ আমার কাছে নেই।

যদি কখনো উইঘুরদের স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় তখন হয়তো পৃথিবীবাসী বুঝতে পারবে কতটা অশ্রু ঝরেছে তাদের চোখে!

বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যারা এতটাই নিঃস্ব ও রিক্ত, কোনো কিছুই এদের কাছ থেকে কোনো কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। কোনো কিছুতেই এদের আর কিছু যায় আসে না। জীবনের কাছ থেকে তাদের সব দাবি শেষ হয়ে গেছে। ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে সময়ের স্রোতে খড়কুটোর মতো। গত শরতে প্রথম এ রকম এক লোকের সঙ্গে কথা হয়েছিল।

কাশগড়ে। এক ক্যাফেতে।

নিরাপত্তা সংস্থার লোক সে। খুব সম্ভবত উইঘুর। দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কিস্তানের নিচু র‍্যাংকের অফিসার। সাদা পোশাকে ছিল সে। বিকেলে ডিউটি ছিল না, মেডিকেল চেকআপ থেকে ফিরে চা খেতে ক্যাফেতে ঢুকেই আমার সাথে দেখা।

পুলিশ অফিসারের স্নায়ুচাপ বোঝা যাচ্ছিল খুব সহজে। হাতের আঙুল মটকাচ্ছিল, সরাসরি চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না।

অস্থির, কম্পিত কণ্ঠে আমার কাছে জানতে চাইলো সেই পুরোনো প্রশ্নের উত্তর, 'আচ্ছা! মানুষ হিসেবে উইঘুরদেরকে আপনার কেমন মনে হয়?'

অসংখ্যবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আমি। উইঘুররা কেমন মানুষ, তাদের সাথে যা করা হচ্ছে সেটা ঠিক কি না—আদিমতম বিবেকের এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর মেলাতে

ব্যর্থ হয়েই ওরা বোধহয় বাইরের মানুষের কাছে সাহায্য চায়। জানতে চায় কীভাবে বোঝাপড়া করব বিবেকের সঙ্গে।

উইঘুররা মানুষ হিসেবে কেমন—এই প্রশ্নের আসলে কনক্রিট কোনো উত্তর আমার জানা নেই। অনেকটা কূটনৈতিকভাবে উত্তর দিলাম। '...উইঘুররা অন্য মানুষদের মতোই। ভালো-খারাপ সবকিছু নিয়েই তারা অন্যসব মানুষের মতোই মা...'।

ট্রাফিক সার্জেন্টের মতো হাত তুলে কথার মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিলো পুলিশ অফিসার। অনুযোগের সুরে বলল সে, 'আপনি আসলে কথা লুকোচ্ছেন।' দুই সেকেন্ড বিরতি নিল অফিসার। তারপর ব্যথাতুর কণ্ঠে—যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে—বলল, 'আপনি নিজের চোখেই দেখছেন সবকিছু। আমরা আসলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। নিজেদের এপিটাফ আমরা নিজেরাই লিখেছি।'

চীনের সাদা পোশাকের পুলিশদের আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি কখনো। সেই মুহূর্তে পুলিশ অফিসারের কথার পিঠে কিছু বলার খুঁজে পেলাম না। আর যাই হোক ওদের সাথে রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা বলা চলে না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস লোকটি মন থেকেই কথা বলছিল। বিবেকের দংশনে প্রতিনিয়ত দংশিত হতে হতে ধৈর্যের সীমা সে অতিক্রম করে ফেলেছিল বহু আগেই।

কাশগড়ের রাত্রিকালীন বাজারের কাছেই সেই অফিসার ডিউটি করত। আমার সাথে তার এই কথোপকথনের কয়েকদিন পর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কেউই তাকে সেখানে দেখেনি এর পর। স্রেফ ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল যেন সে!

চায়না প্রপারের এক শহরে এ রকম আরেকটা ঘটনা ঘটল। ওই রেস্টুরেন্টে আমি এর আগে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। বারবার যাওয়াতে ওয়েটারদের সঙ্গে আমার বেশ খাতির জমে গিয়েছিল। এবারে শুধু পুরোনো একজনের দেখা পেলাম। পুরোনো স্টাফদের কেউই আর 'এখানে নেই' (!)। আমাকে দেখামাত্রই ওয়েটারের হাসি এ কান ও কান ছড়িয়ে পড়ল, যদিও সেই হাসিতে প্রকটভাবে ফুটে উঠল বিষাদের চিহ্ন। সব ফেলে ছুটে এল আমার কাছে। মুখোমুখি বসে গল্প শুরু করল।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই তাকে বললাম, 'জানো, আমাকে কাশগড় থেকে বের করে দিয়েছে ওরা।'

ওয়েটারের নিষ্পাপ, সরল চোখজোড়ায় আগুন জ্বলে উঠল। চাইনিযদের প্রতি রাগে। ঘৃণায়। এরপর একের পর এক সে আমাকে বলে গেল সেখানকার পরিস্থিতি। ওই সত্যগুলো যেগুলোর গলা চেপে ধরে রেখেছে চীনা সরকার। যেগুলোর ব্যাপারে

কেউই মুখ খোলার সাহস দেখায় না...

প্রায় ৩০ লক্ষ উইঘুরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছে তাদের ওপর। ১৫ বছরের পুরোনো পোকাধরা, নষ্ট হয়ে যাওয়া চালের ভাত খেতে বাধ্য করা হয় তাদের।

আমাদের এই শহরের উইঘুরদের অবস্থা ভয়াবহ। কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংগুলোতে আমাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। খুব শীঘ্রই পলিটিক্সের ওপরে, যেমন ধরুন ঊনবিংশ শতাব্দীর কংগ্রেস পার্টির ওপর আমাদের পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সোজা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।

একটানে কথাগুলো বলে দম নিল সে। ঢোক গিলে জিহ্বা দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট চেটে পুনরায় কথা শুরু করল সে...

পুলিশ আমাদের সব বিষয়েই সন্দেহ করে। সব বিষয়ে।

তুমি কি সিগারেট খাও? তুমি কি মদ খাও?

কেন খাও?

খাও না? কেন খাও না?

তুমি কি নামায পড়ো? বিদেশে যাবার কোনো ইচ্ছে আছে তোমার?

তোমার কি পাসপোর্ট আছে?

নেই? কেন নেই?

আছে? পাসপোর্ট কেন বানিয়েছ? কী দরকার তোমার পাসপোর্টের?

ধরুন, পুলিশ অফিসারের চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি কথা বলছেন। ওরা আপনাকে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করবে, 'আমাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলছিস কেন, চোখ নামা।' আবার মাটির দিকে তাকিয়ে যদি কথা বলেন, তাহলে কুত্তাগুলো আপনাকে বলবে, 'এই তোর মনে পাপ আছে, তুই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বল। কী লুকাতে চাচ্ছিস আমাদের কাছ থেকে?'

ওয়েটারের মুখে এভাবে খই ফুটছে। আমি ওকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওর চোখেমুখে অবশ বেপরোয়া একটা ভাব ফুটে ছিল। যা হবার হোক, আমাকে বলতেই হবে–এমন ভাব। অথবা খুব সম্ভবত সে বুঝে ফেলেছিল, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে তার। হয়তো পরের বন্দী তালিকায় উঠে যাবে তার নাম।

আত্মীয়স্বজনের অনেকেই নিখোঁজ, ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

এই না জানি আমার পালা এল, এই বুঝি আমাকে ধরে নিয়ে গেল—এই ভয় পাগল করে ফেলেছে সবাইকে। জেঁকে বসেছে হতাশা আর নৈরাশ্য। আর এই হতাশা আর নৈরাশ্যই বন্দী হবার ভয়টাকে আরও হৃষ্টপুষ্ট করে তুলছে। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে ভয়, আতঙ্ক। একেকটা সেকেন্ড যেন এক একেকটা ঘণ্টা, একেকটা রাতে যেন পার হয়ে যায় একটা পুরো জীবন। দরজায় কড়া নাড়লেই চমকে ওঠে মানুষ। ভাবে শেষমেশ ওরা এল আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার জন্য! সিন্দাবাদের ভূতের মতো ভয় চেপে বসেছে ঘাড়ে, কিছুতেই তাকে ভুলে থাকা যায় না।

কয়েকজন বন্ধু জানাল সবকিছু ভুলে থাকার একটা উপায় ওরা বের করেছে—ব্যবসা বা চাকরিতে ফোকাস করা। জীবিকা উপার্জনের চিন্তা আর কাজে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলা। সারাদিন কাজের মাঝে নিজেকে আটকে ফেলো, যেন 'অন্যকিছু' মাথায় না আসে।

তোমার ছেলে আছে?

ওকে ফাইন, ছেলেকে মানুষ করায় মন দাও।

তোমার ছেলে নেই?

বেশ বেশ, দেখো তো টাকা জমিয়ে একটা গাড়ি বা বাড়ি কেনা যায় কি না। বা দেখো তো এই সেমিস্টারে রেসাল্ট কীভাবে ভালো করা যায়...

পরিস্থিতি এড়ানোর উপায় নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে সব ভুলে থাকার এই নাটক কতটা কাজ করে—ওরাই ভালো জানে!

খুবই ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু ভাবলেশহীন মুখে জানাল, 'আমার ব্যবসায় লাল বাত্তি জ্বলতে আর খুব বেশিদিন নেই। সেদিন হয়েছে কি, পুলিশ এসে আমার দোকানের র‍্যাকভর্তি জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। বিদেশ থেকে আমদানি করা এসব পণ্যে চাইনিয লেবেল ছিল না—এটাই নাকি আমার অপরাধ! পুরো দোকানই সাবাড় করে ফেলত ওরা! আমার শরীর ভালো লাগছে না, আপনারা দয়া করে একটু আসুন, দোকান বন্ধ করব—এসব ভুজুংভাজুং বুঝিয়ে মাথামোটাদের বিদায় করলাম।'

'জীবন আমাকে অনেক কিছুই দেখাল' মলিন হাসি হাসল সে। 'পুলিশ যদি আমাকে গ্রেফতার করতে চায়, করুক। আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। যা হবার হোক, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমাদের এখানকার উইঘুররা এতটাই ভীত যে, উইচ্যাটে কোনো বিদেশিকে তারা তাদের ফ্রেন্ডলিস্টে রাখে না! আমি এসবের ধার ধারি না।

এভাবে ভয়ে ভয়ে থেকে আর কতদিন? এভাবে বেঁচে থাকাকে কী বেঁচে থাকা বলে?'

নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠল বন্ধুর চোখেমুখে। 'দেখো, তুমি যদি পুরো মুসলিম উম্মাহর দিকে তাকাও দেখবে সব জায়গায় মুসলিমরা মার খাচ্ছে, সব জায়গাতেই মুসলিমদের রক্ত ঝরছে। সিরিয়া, ইরাক, কাশ্মীর, আরাকান...। উম্মাহ একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তো সবই দেখছেন। তিনি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। এখন ধৈর্য ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে আমাদের এই পরীক্ষার সময়টুকু পার করতে হবে।' একটানে কথাগুলো বলে দম নেবার জন্য থামল সে।

যাক, একেবারেই হাল ছেড়ে দেয়নি বন্ধু। আশা কিছুটা হলেও বুকের মাঝে অবশিষ্ট আছে, ভাবলাম আমি।

'জানোই তো, এখানে (চায়না প্রপারে) উইঘুরদের নামায পড়া একেবারেই নিষেধ। প্রশাসন কাউকে নামায পড়তে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। সোজা ক্যাম্প।' বিদ্রুপের একচিলতে হাসি ফুটে উঠল বন্ধুর ঠোঁটের কোনায়। 'আমি অবশ্য প্রশাসনকে ঘোল খাইয়ে ঠিকই নামায পড়ে যাচ্ছি। চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে ইশারায়, অথবা গাছের চিপায় চাপায়!'

আশা পুরোপুরি মরে যায়নি। চাইনিয বুটের তলায় পিষ্ট হয়েও ধুঁকে ধুঁকে কিছু আশা বেঁচে আছে উইঘুরদের মনে।

হৃদয়ের খোপে খোপে।

এখনো অনেকেই স্বপ্ন দেখে। আশায় বুক বাঁধে।

একদিন সুদিন আসবেই, দেখবেন—মাঝে মাঝেই শুনি এমন কথা। কথার মাঝপথে কথা থামিয়ে উইঘুর বন্ধুরা আমাকে বলে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে আমার। পারি না। ওরা নিজেরাও হয়তো বিশ্বাস করে না।

কীভাবে সুদিন আসবে? কীভাবে সবকিছু হয়ে যাবে ঠিক আগের মতো? বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা ওরা দিতে পারে না।

'অনেক দিন ধরেই তো ক্যাম্পে আছে, এবার আমার মা/বাবা/ভাই/আত্মীয় ছাড়া পেয়ে যাবে'—এই আশায় নিজেকে ভুলিয়ে ঘুমুতে যায় ওরা। ভাবে, যখন 'সন্ত্রাসবাদ' পরাজিত হবে তখন আবার আগের মতো হয়ে যাবে সবকিছু। আবার আকাশ হবে আকাশের মতো নীল, উদাস হাওয়াই ঢেউ উঠবে ল্যাভেন্ডারে ছাওয়া উপত্যকায়, মিষ্টি সুরে গান গাইবে রবিন পাখি। রেস্তোরাঁর ম্যানেজাররা সান্ত্বনা দেয় নিজেদের—আর কয়েকদিন পরেই আমি পেয়ে যাচ্ছি আমার পুরোনো স্টাফদের। ক্যাম্পের পড়াশোনা তো শেষ হলো বলে, শিগগিরই চলে আসবে ওরা আবার এখানে!

দিন যায়, মাস যায়। ওরা আর আসে না। ওদের আর আসা হয় না।

দিন দিন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের জনসংখ্যা বাড়ে, পাল্লা দিয়ে কমে রেস্তোরাঁর স্টাফ আর কাস্টোমার।

দিন যায়। সুদিন আসে না। যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ।

মাঝে মাঝে আমারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে সুদিন আসছে। ভাবি–যা হচ্ছে, যা হয়েছে, যা দেখছি, যা দেখেছি–সবই ঘুমের ঘোরে দেখা দুঃস্বপ্ন। ঘুমিয়ে আছি আমি। ঘুমিয়ে থেকে ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভাঙলেই ভোজবাজির মতো সব অদৃশ্য হয়ে যাবে। এত বোঝানোর চেষ্টা করি মনকে, মন বোঝে না! বাস্তবতা নির্মম ছুরি হয়ে আঘাত হানে বুকের ঠিক মাঝখানটাতে।

তবু তো স্বপ্ন থাকে, থাকে আশা, ভালোবাসা–মৃত্যুহীন। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করি আবার ফিরে গেছি করিমের রেস্তোরাঁয়। চারিদিকে প্রাণ যেন উছলে পড়ছে। এত হাসি, এত আনন্দ, এত আলো, এত রং, এত রূপ! এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে চরকির মতো ঘুরছে করিম। হাসিমুখে কাস্টোমারদের সঙ্গে কথা বলছে, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করছে, ওদের রসিকতায় দুগাল ভরে হাসছে, খাবারের ব্যাপারে মন্তব্য শুনছে মনোযোগ দিয়ে, একে ওকে ডেকে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ।

স্যালুটের জবাব দিয়ে দারোয়ানের বাড়িয়ে দেয়া দরজা দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আসছেন কোনো নতুন অতিথি। করিম, কাছে গিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছে নির্দিষ্ট টেবিলে!

যন্ত্রের ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতায় এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে খাবার পরিবেশন করছে করিমের স্ত্রী। পুতুলের মতো দেখতে ছোট্ট এক মেয়ে পায়ে পায়ে ঘুরছে রেস্তোরাঁময়। অতিথিদের কেউ কেউ আদর করে গাল টেনে দিচ্ছে খুকিটার। পিচ্চিটা করিমের ছোট মেয়ে, সবে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয়েছে। মাকে সাহায্য করতে এসেছে পুতুলটা। সাহায্যের বদলে ঝামেলাই বরং বাড়াচ্ছে–এই তো এইমাত্র ভুল টেবিলে নিয়ে গেল খাবারের ট্রে। হাসির গুঞ্জন উঠল টেবিলের অতিথিদের মধ্যে। কাছে টেনে ওকে চুমু খেলেন এক ভদ্রমহিলা।

'ওস্তাদ খাবার রেডি' কিচেনের ওপাশের কাউন্টার থেকে শোনা গেল উইঘুর বাবুর্চির বাজখাঁই গলা। চমকে উঠল করিমের প্রাইমারী পড়ুয়া ছেলেটা। সেও এসেছে রেস্তোরাঁয়, ছোট বোনকে দেখে রাখার জন্য!

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে আবলিজ—এখানকারই এক ব্যবসারী। ‘জানো তোমরা, আব্দুওলী আজ পাসপোর্ট ফেরত পেয়েছে। পরের সপ্তাহে অ্যামেরিকার ভিসার আবেদন করবে সে!’

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল আরেকজন স্থানীয় ব্যবসায়ী মেমেত। ‘ধুর! পুরোনো খবর! নতুন খবর স্টকে থাকলে ছাড়ো। উইঘুরদের বিদেশ যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা তো তুলে নিয়েছে সরকার, চাইলেই বিদেশে যাওয়া যায়। গত সপ্তাহেই আমার দশ দশজন বন্ধু পাসপোর্ট ফেরত পেল।’

‘কী শোনাইলা মিয়ারা’, ওদের সঙ্গে যোগ দিলো করিম, ‘সেই একটা অবস্থা তো। এর পরে কী শোনাইবা? প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন একজন উইঘুর?’

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই!

তারপর...

তারপর হুট করে নিভে যায় সব আলো। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে চোখ খুলি। চারপাশে বিষাদের গাঢ় অন্ধকার। সেই জমাটবাঁধা অন্ধকারে হাহাকার করে ওঠে পৃথিবী। হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় করুণ সুরের একটা বাচ্চার কান্না! কালো মহাকাশ নির্বাক ঝুলে থাকে শূন্যতা বুকে নিয়ে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে মুখ লুকোয় নক্ষত্রের দল।

মানবতার অধঃপতন দেখে!

মানুষের দুঃখে!

কাঁদে ওরা!

ব্ল্যাকআউট

আইলিতি সালিয়েভ, আছে পূর্ব তুর্কিস্তানের সহকারী বৈদেশিক জনসংযোগ পরিচালকের পদে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অফিশিয়াল এক পত্রিকা 'পূর্ব তুর্কিস্তান ডেইলি'তে কলাম লিখে সে দাবি করছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মুসলিমদের বাস নাকি পূর্ব তুর্কিস্তানে! ট্যুরিস্টদের আমন্ত্রণও জানিয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তানে এসে পরিস্থিতি দেখে যেতে—আসুন আমাদের এখানে, দেখুন আমাদের ঐক্য-সম্প্রীতি-ভালোবাসা ও সুখ-শান্তি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেন না...![৩০]

পূর্ব তুর্কিস্তানে আসলেই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মুসলিমরা থাকে কি না, তা সবচাইতে ভালো বলতে পারত সেখানকার মুসলিমরাই। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, তাদের কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেয়া হয়েছে।[৩১] সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার কোনো সুযোগ সেখানে নেই। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমরা সাক্ষাৎকার দিতে একেবারেই রাজি হয় না। ভয়ে। আর অনেক বলে কয়ে কাউকে যদি রাজি করাতে পারেনও, তবু একেবারে সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সরকারের ভয়ে আপনাকে ওরা সত্যিটা বলবে না। পেটে সত্য কথা লুকিয়ে, মুখে অন্য কথা বলবে! আসলে সবারই প্রাণের ভয় আছে! জলে থেকে তো আর কুমিরের সাথে লড়াই চলে না!

চীনের বাইরে যেসব উইঘুর সাংবাদিক কাজ করেন তাদের অবস্থা বোধহয় সবচেয়ে

---

[৩০] 'We're a people destroyed': why Uighur Muslims across China are living in fear, Gene A Bunin. The Guardian, August 7th, 2018. https://tinyurl.com/yccvp8b8
[৩১] 'পরিপাটি আগ্রাসন' দ্রষ্টব্য

বেশি খারাপ। বাইরের পৃথিবীর সামনে চীনের মুখোশ উন্মোচনের যে যুদ্ধ তারা চালিয়ে যাচ্ছেন তার মাসুল গুণতে হয় তাদের পরিবারের সদস্যদের। এই তো গত ফেব্রুয়ারিতে রেডিও ফ্রি এশিয়ার চার সাংবাদিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের পাঠানো হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। ওয়াশিংটন পোস্ট জানাচ্ছে, 'আত্মীয়দের বন্দী করে উইঘুর সাংবাদিকদের এক কড়া হুমকি দিচ্ছে চীন সরকার–আমাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি থামাও, নইলে...!'

উইঘুরদের ওপর অত্যাচারের কারণে যারাই চীনের সমালোচনা করতে চেয়েছে তাদেরই টুঁটি চেপে ধরার ব্যবস্থা করেছে চীন সরকার। চীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হুয়া চুইং জোর গলায় আপত্তি জানিয়ে বলে, 'উইঘুরদের কারণে চীন সরকারের যে সমালোচনা বিশ্ব করছে তা একেবারেই অন্যায্য, অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের সমালোচনা চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৩২]

অন্যদিকে আইলিতি সালিয়েভ বড় গলায় ট্যুরিস্টদের আমন্ত্রণ জানাল পূর্ব তুর্কিস্তানের ঐক্য, সম্প্রীতি, মানবাধিকার নিজের চোখে দেখার জন্য। চীন সরকারের অন্যান্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও বারবার আহ্বান জানানো হয়েছে চীনে এসে প্রকৃত অবস্থা দেখে যাবার।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথাও জোর গলায় অস্বীকার করেছিল চীন। বলেছিল এগুলো রিএডুকেশন সেন্টার। যার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় খুব আনন্দের সাথে পড়াশোনা করে। কারিগরি প্রশিক্ষণ নেয়। যারা চীনের নামে মিথ্যে অপবাদ ছড়াচ্ছে তাদের আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। সাংবাদিকদের জন্য চীনের দরজা সব সময় খোলা। যেকোনো সময় যে কেউ চাইলে পূর্ব তুর্কিস্তানে এসে ঘুরে দেখে যেতে পারে আসল অবস্থাটা কী।[৩৩]

চীনের আহ্বান শুনে সিএনএন ডাক দিলো তাদের বিশেষ প্রতিনিধি ম্যাট রিভারসকে। জন সাডওয়ার্থের ডাক পড়ল বিবিসিতে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ডাকলো জশ চিনকে। আর ওদিকে বেইজিংয়ের প্লেনে উঠল স্কাই নিউজের এশিয়া প্রতিনিধি টম চেশার।

পূর্ব তুর্কিস্তানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো ওদের!

---

[৩২] 'We're a people destroyed': why Uighur Muslims across China are living in fear, Gene A Bunin. The Guardian, August 7th, 2018. https://tinyurl.com/yccvp8b8
[৩৩] In the dark: To search for Xinjiang's missing children is like looking into the gloom. Tom Cheshire. Sky News, October 2nd, 2019. https://tinyurl.com/yyyaum32
China tries to thwart CNN investigation into detention camps. CNN, May 28th, 2019. https://tinyurl.com/vylo7bf

সাংবাদিকরা ল্যান্ড করার আগেই বিশেষ 'ওয়েলকাম পার্টি' নিয়ে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল চীনা পুলিশ আর সরকারি লোক। সাংবাদিকরা যে ক'দিন পূর্ব তুর্কিস্তানে থাকল, সে কয়দিন একেবারে আঠার মতো পিছে লেগে থাকল ওরা। বাস, ট্রেন, রাস্তা, রেস্টুরেন্টে এমনকি হোটেলে পর্যন্ত। স্নিকার, জিন্স, মাস্ক পরা টিকটিকিরা কখনো মোবাইল টেপে, কখনো পত্রিকা পড়ে, কখনো চুমুক দেয় কোল্ডকফি বা জুসে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সাংবাদিকদের বিশ ফিটের বেশি দূরে যায় না। সাংবাদিকরা পথচারী বা সাধারণ মানুষ যাদের সাথেই কথা বলুক না কেন, সাদা পোশাকের এই টিকটিকিগুলো পরে ঠিকই জিজ্ঞাসাবাদ করে ওদের। কী কী প্রশ্ন করেছে একে একে জেনে নেয় সব। পরিচয় গোপন করার কোনো চেষ্টাই করে না ওরা। যেন সাংবাদিকদের বোঝাতে চেয়েছে, দেখো তোমাদের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে, কাজেই উল্টাপাল্টা কিছু করে বোসো না।

হোটেলে পাশের রুমে ঘর ভাড়া নিয়েছে চাইনিয গোয়েন্দারা। গভীর রাতে সিএনএন-এর সাংবাদিক ম্যাট রিভারসের ঘরে হাজির হয়েছে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেখতে চেয়েছে পাসপোর্ট। ৬ দিন পূর্ব তুর্কিস্তানে ছিল সে। এর মাঝে ৫০ বারেরও বেশি ম্যাটের আইডি চেক করেছে পুলিশ।

যখনই কোনো হোটেল বুক করেছে ম্যাট, যখনই কোনো ট্রেনের টিকেট কেটেছে– আগে থেকেই জেনে গেছে ওরা। স্টেশনে নেমে ম্যাট দেখেছে পুলিশ অপেক্ষা করছে তার জন্য। সুন্দরী চাইনিয সরকারি অফিসার ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, আপনি একাকী ঘোরাঘুরি করছেন। এর চাইতে বরং আমরা আপনার সঙ্গে আসি, আপনার ভালো লাগবে। নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনো টেনশন করতে হবে না।

রাস্তায় বের হলেই চার-পাঁচটা গাড়ি ওদের অনুসরণ করে গেছে ছায়ার মতো। পিছু ছাড়েনি এক সেকেন্ডের জন্যেও। ভিডিও করতে, ছবি তুলতে বাধা দিয়ে গেছে সব সময়। ভিডিও বা ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা বের করতে না করতেই বারবার হাজিরে হয়েছে পুলিশ। কড়া গলায় হুমকি দিয়েছে, ভিডিও বা ছবি তুললে খবর হয়ে যাবে।[৩৪] ছবি ডিলিট করিয়েছে জোর করে। একটা উটের ছবি তুলেছিল নিয়ইয়র্ক টাইমসের এক সাংবাদিক। এই উটের ছবিটা মুছতেও বাধ্য করেছে পুলিশ!

গুগল ম্যাপসে যেসব জায়গায় রিএডুকেশন ক্যাম্পের ছবি দেখেছিল সাংবাদিকরা,

---

[৩৪] পাঠক দেখুন কীভাবে ক্যামেরার সামনেই সিএনএন এর সাংবাদিককে মারধোর করছে, ক্যামেরা ভেঙে ফেলছে চীনের পুলিশ - CHINA: Police Attack CNN Crew (ON CAM!). CNN, April 26, 2016. https://tinyurl.com/spzq5rt

তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেয়া হয়নি ওদের। যখনই ওরা কোনো রিএডুকেশন সেন্টারের উদ্দেশে বের হয়েছে, হুটহাট করে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেছে সোয়াটের গাড়ি। বলেছে, 'এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাস্তা বন্ধ। আপনারা আর এগুতে পারবেন না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।'

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সাংবাদিকরা দেখেছে আশেপাশে কোথাও অ্যাক্সিডেন্টের সামান্যতম কোনো চিহ্ন নেই। অন্য পথে কিছুদূর এগোনোর পরে আবারও পড়তে হয়েছে পুলিশের রোডব্লকের মুখে। 'সামনে মিলিটারি ট্রেইনিং চলছে, কাজেই এই রুট বন্ধ। আপনারা গাড়ি ঘুরিয়ে নিন'—যন্ত্রের মতো কৈফিয়ত আওড়ে গেছে ট্রাফিক পুলিশ।

আরেকটা রুট ধরে কিছুটা এগোনোর পর আবার দেখা হয়েছে পুলিশের সাথে। রোডব্লকের কারণ হিসেবে এবার ওরা বলেছে ইলেকট্রিক দুর্ঘটনার কথা। 'এই রাস্তা নিরাপদ নয়। আপনারা আমাদের অতিথি। কীভাবে আপনাদের যেতে দিতে পারি এই রাস্তা দিয়ে, বলুন?'

কোনো কোনো রোডব্লকের কারণ হিসেবে পুলিশ এও বলেছে, 'গরমের চোটে রাস্তার পিচ গলে গেছে, তাই রাস্তায় গাড়ি চালানো নিরাপদ নয়। রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

মজার একটা ঘটনা ঘটে স্কাই নিউজের সাংবাদিক টম চেশারের সাথে। একবার রোডব্লকের কারণ হিসেবে তাকে বলা হয়, 'রাস্তায় জরুরি সংস্কার কাজ চলছে'। মাটি খোঁড়ার একটা ক্যাটারপিলার পুরো রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে আগানোর উপায় নেই। একইসাথে কৌতূহলী এবং চরম বিরক্ত হয়ে ক্যাটারপিলারের ড্রাইভারের সাথে কথা বলার জন্য আগায় টম। ওকে দেখেই ক্যাটারপিলার থেকে লাফ মেরে হাওয়া হয়ে যায় ড্রাইভার। বিস্মিত টম আবিষ্কার করে, একেবারে ভালো রাস্তাই আবার খোঁড়াখুঁড়ি করছিল ড্রাইভার লোকটা!

সাংবাদিকদের এভাবে হেনস্থা করা, কাজ করতে না দেয়া, হুমকি-ধামকি, ভয়-ভীতি দেখানোর ব্যাপারে অভিযোগ করা হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। বরাবরের মতোই অস্বীকার করা হয় সবকিছু, বাজাতে থাকে সেই একই রেকর্ড—সাংবাদিকতা করার জন্য পূর্ব তুর্কিস্তান একদম উপযুক্ত একটা জায়গা![৩৫]

---

[৩৫] China's hidden camps, What's happened to the vanished Uighurs of Xinjiang? John Sudworth. BBC, October 24th, 2018. https://tinyurl.com/y6bwoamx
China's Uighur muslims: The search for lost children. Sky News, September 29th, 2019. https://tinyurl.com/yx49tcup

জন সাডওয়ার্থের ভাগ্য তুলনামূলক কিছুটা ভালো। চীনা কর্তৃপক্ষ তাকে সুযোগ করে দিলো একটা রিএডুকেশন ক্যাম্পের ভেতরটা ঘুরে দেখার। তবে অবশ্যই চীনা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে। ঘুরে ঘুরে দেখল জন, সবকিছু ঠিক যেমন দেখা গিয়েছিল গুগল আর্থে ঠিক তেমন–উঁচু উঁচু ওয়াচটাওয়ার, কাঁটাতারের বেড়া, সিসিক্যামেরা, ভারী অস্ত্রধারী গার্ড। নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় কোনো ফাঁকফোকর নেই।

রিএডুকেশন ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকতেই হাই ভলিউমের গান স্বাগত জানাল ওদেরকে। একটা হলরুমে জিন্স, টিশার্ট আর স্নিকার পরে দলবেঁধে নাচছে উইঘুর যুবক যুবতিরা। কড়াচোখে ওদের দিকে তাকিয়েছে সাদা পোশাকের চীনা পুলিশ। মুখে ঝুলিয়ে রেখেছে এক টুকরো মেকি হাসি।

ঠিক একই রকম দৃশ্য দেখা গিয়েছিল রিএডুকেশন সেন্টার নিয়ে চীনের সরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত একটা ভিডিওতে–উইঘুররা মনের আনন্দে চীনা ভাষা শিখছে, নারী পুরুষ একসাথে মিলে নাচগান করছে, আর ধন্যবাদ দিচ্ছে কমিউনিস্ট সরকারকে।

এক যুবককে জন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছেন?'

'হ্যাঁ, নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি। আমার চিন্তাভাবনা একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। উগ্রবাদ আমাকে প্রভাবিত করেছিল, তাই নিজের চিন্তাভাবনা বদলাতে এখানে এসেছি।' ডানচোখের আশপাশে পুরোটা জুড়ে কালশিটে নিয়ে (সম্ভবত ঘুষি খাবার ফলাফল) মুখস্থ উত্তর বলে গেল উইঘুর যুবক।

জনকে এরপর নিয়ে যাওয়া হলো স্পোর্টস কম্পাউন্ডে। যেখানে উইঘুর যুবকেরা বাস্কেট বল খেলছে, নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করছে।

ছায়ার মতো জনের পাশে লেগে রইল পুলিশ। এক সেকেন্ডের জন্যেও আলাদা হলো না ওর কাছ থেকে। প্রত্যেকটা ইন্টারভিউ নেবার সময় পাশে দাঁড়িয়ে রইল–এক সেকেন্ডের একটা ভিডিও পর্যন্ত স্বাধীনভাবে করতে দিলো না।[৩৬]

এর আগে অজানা উৎস থেকে একটা ড্রোন ফুটেজ ছাড়া হয় ইউটিউবে। বলা হয় এটাই চীনের রিএডুকেশন ক্যাম্পের ভেতরের দৃশ্য। বিবিসির সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে রিএডুকেশন ক্যাম্পের ভেতরে যে দৃশ্য চীন সরকার দেখাল তার সাথে কোনো

China tries to thwart CNN investigation into detention camps. CNN, May 28th, 2019. https://tinyurl.com/vylo7bf

How China Turned A City Into A Prison. Chris Buckley, Paul Mozur and Austin Ramzy. The New York Times, April 4th, 2019. https://tinyurl.com/y5dwmlyj

[৩৬] Rare look inside China's internment camps holding more than 1 million Muslims. CBS News, June 18th, 2019. https://tinyurl.com/tb9uucl

মিল নেই এই ভিডিওর। পুরো অন্য জিনিস দেখাচ্ছে এটা!

ভিডিওতে দেখা গেল, একটা বিশাল কমপাউন্ডে কালো ইউনিফর্ম পরা অসংখ্য পুলিশ সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে বসে আছে কিছু লোক। সবার মাথা কামানো, চোখ বাঁধা, হাত হ্যান্ডকাফে মুড়ে পেছনে বাঁধা। কিছুক্ষণ পর এসব মাথা কামানো চোখবাঁধা লোকদের দুপাশ থেকে ধরে ফ্রেইমের বাইরে নিয়ে গেল পুলিশ। তখন বোঝা গেল, ওদের পা-ও শেকল দিয়ে বাঁধা।

এক টেলিভিশন লাইভে এই ভিডিও দেখিয়ে যুক্তরাজ্যের চীনা রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্ন করেছিল এক সাংবাদিক। চীনা রাষ্ট্রদূত ইনিয়ে-বিনিয়ে চেষ্টা করলেও সরাসরি বলতে পারেনি ভিডিওটা বানানো বা মিথ্যা।[৩৭]

Australian Strategic Policy Institute's International Cyber Policy Centre এর গবেষক নাথান রাসারোর মতেও এই ভিডিও জেনুইন।[৩৮]

The Great U.S.-China Tech War and Losing South Korea বইয়ের লেখক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ গর্ডন চ্যাং-ও এই ভিডিওকে জেনুইন বলেছেন। ফক্স নিউসে দেয়া সাক্ষাৎকারে গর্ডন চ্যাং বলেছেন, 'খুব সম্ভবত এই শেকলে বাঁধা উইঘুররা শ্রমদাস। চীনা সরকার এদের দিয়ে জোরপূর্বক বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কাজ করিয়ে নেয়।'[৩৯]

তবে গর্ডন চ্যাং এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করছেন ড. ইরকিন সিদিক। ড. সিদিক একজন অপটিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং 'উইঘুর প্রজেক্টস ফাউন্ডেশন' নামক অ্যাক্টিভিস্ট সংস্থার প্রেসিডেন্ট। ভদ্রলোক এই ভিডিওকে জেনুইন বলেছেন। কিন্তু তিনি বলছেন, 'এই উইঘুরেরা শ্রমদাস নয়। চীনা কমিউনিস্ট সরকার উইঘুর শ্রমদাসদের অনেক ভিডিও লিক হতে দিয়েছে। কিন্তু এই ভিডিওর কার্যক্রম ছিল খুবই গোপন। সরকারের ভেতরের কারও মাধ্যমে এই টপ সিক্রেট অপারেশনের ভিডিও লিক হয়েছে। Bitter Winter রিপোর্ট করেছে কমপক্ষে পাঁচ লাখ উইঘুরকে অত্যন্ত গোপনে হান অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে স্থানান্তর করা হয়েছে। আমি সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাছ থেকে জেনেছি, এই পাঁচ লাখ উইঘুরদের অনেক বড় একটা অংশকে চীন সরকার

---

[৩৭] Chinese Ambassador to UK pressed on purported drone video of Uighur prisoners being herded into trains, Greg Norman. Fox News, July 20th, 2020. https://tinyurl.com/y62y9hwd

[৩৮] Chilling drone footage shows Chinese cops moving hundreds of blindfolded and shackled Muslim prisoners to 're-education camps'. Frank Chung. The Sun, September 21st, 2019. https://tinyurl.com/srdf2oy

[৩৯] Dr. Erkin Sidick, On Twitter. July 23rd, 2020. https://tinyurl.com/y4q6l7c4

ব্যবহার করছে অর্গান হারভেস্টিং কিংবা বায়োলজিক্যাল উইপেন (জীবাণু অস্ত্র) বানানোর গবেষণায়।'[৪০]

বিবিসির জন সাডওয়ার্থের মতো একটা সাক্ষাৎকার নেবার অভিজ্ঞতা হলো স্কাই নিউজের টম চেশারের এর।

বেচারার ভাগ্য খুব খারাপ। যেখানেই যেতে চেয়েছে সেখানেই পুলিশ তার পথ আটকেছে। পায়েহেঁটে যাবার চেষ্টা করলে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে সাদা পোশাকের কঠিন চেহারার যুবকেরা। বাধ্য করেছে ছবি, ভিডিও ডিলিট করতে। আকসুতে[৪১] গেল, কেবল একটা দরজায় নক করেছে ওমনি এসে হাজির হলো আর্মড পুলিশ। এসকোর্ট করে (বাংলা ভাষায় বললে 'ঘাড় ধরে') এলাকার বাইরে নিয়ে গেল। অবশ্য একটা দুর্লভ উদারতাও দেখাল। বলল, তুমি যদি এভাবে ভিডিও করা বন্ধ করো, তাহলে আমরা তোমাকে রিএডুকেশন সেন্টার থেকে পাস করে বেরিয়ে আসা একজন উইঘুরের কাছে নিয়ে যাব।

উইঘুর লোকটা নিজের নাম বলল আইনি ইয়াসিন। চীনা পুলিশ আর টমের সাথে তরমুজ খেতে খেতে কথা বলল ইয়াসিন। 'গ্রাম প্রশাসনের অফিসার আমাকে বলল ট্রেইনিং করবে নাকি ইয়াসিন? আমি রাজি হলাম। ট্রেইনিং নেবার পরে আমার চীনা ভাষার ওপর দক্ষতা বেড়েছে। আইনকানুন সম্পর্কে আগের চাইতেও অনেক বেশি জানি আমি। ট্রেইনিং একেবারে ফ্রি, সেখানকার সবকিছুই আসলে ফ্রি ছিল। পার্টি এবং সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ!

তরমুজে বড়সড় একটা কামড় বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল টম 'ট্রেইনিং সেন্টার কি কারাগারের মতো ছিল?'

প্রতিবাদ জানাল ইয়াসিন, 'আরে না! কারাগার হতে যাবে কেন? ট্রেইনিং সেন্টার অনেকটাই ইউনিভার্সিটির মতো ছিল। আমরা খুব মজা করে পড়তাম সেখানে। যখন ইচ্ছে বাড়ি চলে আসতে পারতাম।'

প্রত্যেকটা কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করল টম। যেভাবে বিশ্বাস করেছে রাস্তা বন্ধ করে দেবার পরে পুলিশের ব্যাখ্যা–ট্রাফিক এক্সিডেন্ট, ইলেকট্রিক ফল্ট, রোদে পিচ গলে যাওয়া, আর রাস্তা মেরামতের অজুহাত।[৪২]

---

[৪০] প্রাগুক্ত

[৪১] পূর্ব তুর্কিস্থানের দক্ষিণাঞ্চলের একটি শহর

[৪২] In the dark: To search for Xinjiang's missing children is like looking into the gloom. Tom Cheshire. Sky News, October 2nd, 2019. https://tinyurl.com/yyyaum32

চীনা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল বিবিসির জন সাডওয়ার্থ। তবে ভাগ্যক্রমে আলী নামে (ছদ্মনাম) এক উইঘুর যুবকের সাক্ষাৎকার নেয়ার সুযোগ পায় কোনো কর্মকর্তার উপস্থিতি ছাড়াই। আলীকে রিএডুকেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারণ তার ফোনে হিজাব পরা এক মেয়ের (আলীর আত্মীয়) ছবি খুঁজে পায় পুলিশ। আলী জনকে শুনিয়েছে বুকভাঙা এক গল্প।

‘ক্যাম্পের মাঠে বন্দীদেরকে ব্যায়াম করতে বাধ্য করা হতো। এ রকম এক ব্যায়াম চলাকালীন উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তার গাড়ি এসে হর্ন বাজায় মেইন গেটে। খুব অল্প সময়ের জন্য দরজা খোলা হলো অফিসারের গাড়ি ভেতরে প্রবেশ করতে দেবার জন্য। এরই ফাঁকে এক উইঘুর শিশু ঢুকে পড়ে ক্যাম্প কমপাউন্ডে। তার মা আমাদের সাথে মাঠে দৌড়াচ্ছিল। মাকে দেখতে পেয়ে মা মা চিৎকার করে ছুটে আসে সে। ছেলের ডাক শুনে চমকে ওঠে মা, দুহাত বাড়িয়ে ছেলের দিকে দৌড় দেয় সেও। পিচ্চি বাবুটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মায়ের কোলে। অঝোরে কাঁদতে থাকে দুজনে।

নিমিষেই মা-ছেলের কাছে পৌঁছে যায় পুলিশ। চুলের গোছা ধরে টান দিয়ে ছেলের কাছ থেকে আলাদা করা হয় মাকে, ছেলেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ছুড়ে দেয়া হয় বাইরে! চিৎকার করে কাঁদছিল মা-ছেলে দুজনেই।’

অমানবিক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল আলী নিজেও। টপটপ করে অশ্রু ঝরছিল তার গাল বেয়ে।[৪৩]

আসলে সত্য কোনটা? আর্মড পুলিশের উপস্থিতিতে স্কাই নিউজের সাংবাদিককে দেওয়া রিএডুকেশন ক্যাম্পের সাবেক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নাকি কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে বিবিসির জন সাডওয়ার্থকে দেয়া আলীর সাক্ষাৎকার?

চীন সরকার দাবি করেছিল হান, উইঘুর, কাযাখ সকল গোষ্ঠীর মানুষ সুখে-শান্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে পূর্ব তুর্কিস্থানে। এটা কথা কি সত্য? যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে কেন উইঘুরদের সাথে সাংবাদিককের স্বাধীনভাবে কথা বলার কোনো সুযোগ দিতে চাচ্ছে না চীন সরকার? কেন রাস্তা বন্ধের নাটক করা হচ্ছে বারবার? কেন সাংবাদিকদের পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে রাখা হচ্ছে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা?

সাংবাদিকদের এত কিসের ভয়?

কী লুকাতে চায় ওরা?

---

[৪৩] China’s hidden camps, What’s happened to the vanished Uighurs of Xinjiang? John Sudworth. BBC, October 24th, 2018. https://tinyurl.com/y6bwoamx

চীন সরকারের দাবি অনুযায়ী এগুলো যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে এত কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা কেন? কেন 'শিক্ষার্থীদের' সাথে যোগাযোগ করতে পারে না পরিবার বা মিডিয়া? পুরো পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে কোটি কোটি ডলার খরচ করে হাইটেক টেকনোলজি দিয়ে কেন নজরদারি করা হচ্ছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ওপর? কেন মাপা হচ্ছে ওদের প্রত্যেক নড়াচড়া?

এত পুলিশ, মিলিটারি, প্যারামিলিটারি কেন মোতায়ন করা হয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তানে? কেন উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ডিএনএ স্যাম্পল নেয়া হচ্ছে? কেন মুসলিমদের বায়োমেট্রিক ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে?

দুইয়ে দুইয়ে চার হচ্ছে না? মিলছে না হিসেব?

কিছু একটা তো অবশ্যই হচ্ছে চীনে!

উইঘুর-কাযাখদের অত্যাচার-নির্যাতন করছে চীনারা!

কিন্ত সেই অত্যাচারের মাত্রাটা কেমন?

কতটা ভয়াবহ?

মরণখেলা
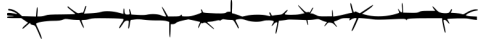
এক.

পাহাড়ের পাশে, চূড়ার কাছাকাছি উঠে এসেছে সূর্য। হোটেলের লবিতে বসে আছে স্টিভ চাও। আলজাজিরার সাংবাদিক।[৪৪] জানালা দিয়ে দেখা গেল জেগে উঠছে যংগুলডাক। বে-তে নোঙর ফেলেছে একটা যুদ্ধজাহাজ। আরও সামনে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা লাইনারের পেছন দিকটা। একজন ওয়েটারকে সামনে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে কফির অর্ডার দিয়েছিল স্টিভ—সে কফি ঠান্ডা হয়ে গেছে অনেক আগেই। স্পর্শই করেনি। ব্ল্যাক সীর নীলাভ সবুজ পানির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে ও গভীর মনোযোগ দিয়ে। এই দুনিয়ায় যেন আর নেই। কেউ দেখলে বলতেই পারবে না ভেতরে ভেতরে আসলে কৌতূহল আর উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সে। একজন গুপ্তচরের জন্য অপেক্ষা করে আছে স্টিভ।

চীনা গুপ্তচর!

কয়লা খনির জন্য নামকরা শহর যংগুলডাকে দেখা করতে চাওয়া একজন চীনা গুপ্তচরের জন্য অস্বাভাবিক। কিন্তু 'ব্ল্যাক সী'-ঘেঁষা তুরস্কের এই শহর ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চাচ্ছিল না চাইনিয স্পাই ইউসুফ আমাত। প্রথমে এই প্রস্তাব শুনে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল স্টিভ। কিন্তু কী ভেবে যেন পরে রাজি হয়ে যায় ও।

হোটলের লবিতে কখন ইউসুফ আমাত পা দিলো আর কখন এগিয়ে এল ওর দিকে,

[৪৪] Exposed: China’s surveillance of Muslim Uighurs. Steve Chao. Al Jazeera, February 1, 2019, অবলম্বনে। https://tinyurl.com/y9g4jjm8

তার কিছুই টের পেল না স্টিভ। উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষত্ব নেই ইউসুফ আমাতের চেহারায়। দেখতে আর দশজন উইঘুরের মতোই। আলাদা করার কোনো উপায় নেই। মাথায় উলের টুপি আর হুডি সোয়েটার গায়ে দিয়ে এসেছে সে। ফোলাফোলা দুচোখ, চোখের কোণে শুকনো জলের দাগ। কেউ দেখলে স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না এই ছেলেটা তার নিজের মা, বোন, ভগ্নিপতীসহ ১০ জনেরও বেশি আপনজনকে চীনা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য!

'নি হাও (হ্যালো)', ম্যান্ডারিন চাইনিযে স্টিভের উদ্দেশে বলল ইউসুফ আমাত। শান্ত, নরম কণ্ঠস্বর আমাতের। মুখে যদিও হালকা একটু হাসির আভাস দেখা দিলো, কিন্তু চোখদুটো তাতে সাড়া দিলো না। গভীর এক অপরাধবোধ ঝুলে থাকল দুচোখে। 'দুঃখিত আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, গ্যাস স্টেশনের কাজ শেষে বেশ কয়েকটা বাস পাল্টে আসতে হয়েছে আমার।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল স্টিভ। নি হাও... কেমন আছেন?

শুকনো মুখে জবাব দিলো ইউসুফ। তারপর শান্ত গলায় প্রথমে থেমে থেমে তারপর একনাগাড়ে কথা বলতে শুরু করল। শুরু হলো চরাচর ডুবে যাওয়া বিষণ্ণতামাখা এক কাহিনি...

'আমার কাজ হলো চীন সরকারকে তথ্য দেয়া। উইঘুরদের জীবনের সব খুঁটিনাটি তথ্য আমি সরকারকে সরবরাহ করি। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমুতে যাবার আগ পর্যন্ত উইঘুররা কী কী করে তার সব খবরই আমার হাত ঘুরে পৌঁছে যায় চীন সরকারের হাতে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমনকি নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেও স্পাইং করতে হয়েছে আমার।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কিছুদিন ক্লিনার হিসেবে কাজ করেছিলাম। যা দেখেছি তা বিশ্বাস করার মতো না। বন্দীদের চরমভাবে পেটাত ওরা। এভাবে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষ তো দূরে থাকুক, পশুকেও পেটাতে পারে না। ইলেক্ট্রিক কর্ড দিয়ে পেটানো হতো বন্দীদের। ভয়ংকরভাবে কাঁপত ওরা, যেন মহাপ্রলয় আঘাত হেনেছে। দুলে উঠেছে পাহাড়-পর্বত, আকাশ, সমুদ্র। বিশেষ করে আমার বয়সী তরুণী, যুবতিরা। অমানুষিক, অপার্থিব আওয়াজ বের হতো ওদের গলা থেকে। শুনলেই গা ছমছম করত। কলজে পর্যন্ত শুকিয়ে যেত ভয়ে। আর ছিল রক্ত... ছোপ ছোপ জমাটবাঁধা রক্ত। কালচে রক্ত, টকটকে লাল রক্ত। শুকনো রক্ত, তাজা রক্ত। দেয়ালে, মেঝেতে, টর্চার চেয়ারে, সবখানে। প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু জলজ্যান্ত ক্ষতচিহ্নের মতো স্মৃতিগুলো জ্বলতে থাকে মনের ভেতরে, সব সময়।

২০১২ সাল থেকে সরকারের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছি আমি। এই ক'বছরে আমার দায়িত্ব ছিল আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং তুরস্কে বসবাস করা উইঘুরদের কমিউনিটিতে অনুপ্রবেশ করে গোয়েন্দাগিরি করা। পুরো পৃথিবীজুড়ে এসপিওনাজ এজেন্টের জাল বিছিয়ে রেখেছে চীন সরকার। সব তথ্য ওদের চাই। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, উইঘুরদের নাগাল ওদের চাই-ই চাই। দেখুন, আমি এসেছি কারামে থেকে। খুব ছোট্ট একটা শহর কারামে। আমার শহরের অসংখ্য স্পাইয়ের মধ্যে আমি একজন। পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে আমার শহরের সমান আয়তনের শহর আছে ডজন ডজন। প্রত্যেকটা শহরে স্পাই গিজগিজ করছে। চীনের বড় শহরগুলো বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের বড় শহরগুলোর কথা বাদই দিলাম!

এসপিওনাজের আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে দিন দিন দুঃসাহসী হয়ে উঠছে চীন। বিদেশের মাটিতে বসে সেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে সমানে অপহরণ করে যাচ্ছে উইঘুরদের। হতভাগ্য উইঘুরদের পরিণতি কী হয় তা আর না-ই বা বললাম।

এই বর্বরতায় একটা ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি, এটা ভাবলেই নিজের প্রতি একদলা ঘৃণা উথলে ওঠে। প্রথম যেদিন স্পাইং করেছিলাম সেদিন বুকের মাঝে কী যে অসহ্য কষ্ট জমা হয়েছিল... বলে বোঝাতে পারব না! যেন আমার বুকের মধ্যে কেউ জ্বলন্ত পেরেক গেঁথে দিয়েছিল। গুপ্তচরবৃত্তির এই নোংরা খেলায় আমার অভিষেক হয়েছিল কীভাবে জানেন? আমার বোনের স্বামী, আমার তিন ভাগ্নে-ভাগ্নি আর বোনের শ্বশুরকে ধরিয়ে দিয়ে।'

ধীর-স্থির ও শান্তভাবে আমাতের কথা শুনছিল স্টিভ। এ পর্যায়ে এসে স্টিভ ওই প্রশ্নটাই করল যেটা এতক্ষণ ধরে আপনার মাথায়ও ঘুরছে—'নিজের স্বজাতি, স্বজনদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে রাজি হলেন কেন? কেন বেছে নিলেন এই পথ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আমাত। তারপর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো... সেই প্রাগৈতিহাসিক জবাব...

'বেঁচে থাকার জন্য...

আমি নিজেই বছর দেড়েক পুলিশের হাতে বন্দী ছিলাম। আমাকে ওরা প্রস্তাব দিলো, 'আমাদের হয়ে চরগিরি কর, তোকে ছেড়ে দেবো। চাকরি দেবো। যদি রাজি না হোস, তাহলে সোজা তোর মাকে ধরে নিয়ে আসব এখানে'। মাকে ধরে আনার কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ওদের একেকটার চেহারা জাত খুনীর মতো। চোখ কখনো হাসে না। অযথা হুমকি দেবার লোক নয় এরা। যা বলছে সেটা করবেই। নিজের মধ্যে

টানাপোড়েন শুরু হলো।

যখন থেকে বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি সব সময় নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছি– মাকে আগলে রাখতে হবে তোমার, তাঁকে দেখেশুনে রাখতে হবে। কিন্তু এদিকে আবার নিজের ঘরের লোক, নিজের জ্ঞাতিভাইদের বিরুদ্ধে স্পাইং করা... দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রহর শেষে শেষমেশ রাজি হয়ে গেলাম ওদের প্রস্তাবে। মাকে আমার অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, যেকোনো মূল্যে।

কিন্তু পারলাম কই? একদিন ওরা আমাকে বলল, চল তোর মায়ের সাথে দেখা করে আসি...

যা বোঝার তা বুঝে নিলাম আমি। আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়!

দুনিয়ার সবচেয়ে মধুরতম সম্পর্কের মধ্যে একটি হলো ভাইবোনের সম্পর্ক। ভালোবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা, খুনসুটি, মান-অভিমান, আড়ি দেয়া, ঝগড়া, মারামারি–সব মিলিয়ে কমপ্লিট এক প্যাকেজ! যার একটা বোন আছে দুনিয়ার অর্ধেক সুখের মালিক যেন সে। নানা ভূমিকায় অভিনয় করে চলে বোন–কখনো মায়ের ভূমিকায়, কখনো বন্ধু, কখনো বোন। যে কথাগুলো বাবা-মাকে বলার সাহস হয় না, সে কথাগুলো নির্দ্বিধায় বলা যায় বোনের কাছে। বয়স বাড়লে বাবা-মায়ের সাথে অদৃশ্য যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়, সেই দূরত্বের মাঝে সেতু হিসেবে কাজ করে বোন। অবলীলায় বোনের কাছে এমনসব আবদার করে ফেলা যায়, যেগুলোর একটাও বাবা-মাকে বললে হয়তো পিঠের ছাল উঠে যেত!

উইঘুর ভাইবোনের সম্পর্ক অন্য মাত্রার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় উইঘুরদের বাচ্চাকাচ্চার সংখ্যা অনেক। বাবা-মা হয়তো বড় দুই-এক ছেলেমেয়েকে একটু মনোযোগ দিয়ে মানুষ করল–পরের ছেলেমেয়েগুলোর আর তেমন খোঁজখবর নিতে হয় না। বড় ছেলেমেয়েগুলোই তাদের ছোট ভাইবোনদের কোলেপিঠে করে মানুষ করে। এক একজন বড় ভাই যেন আরেকজন স্নেহশীল বাবা, এক একজন বড় বোন যেন আরেকজন মমতাময়ী মা!

আমাদের এই ইউসুফ আমাত মমতাময়ী বোনের বিরুদ্ধে স্পাইং করেছে! স্পাইং করেছে দুলাভাই আর ভাগ্নে-ভাগ্নিদের বিরুদ্ধে! সে জানত তার দেয়া তথ্য ওদেরকে ক্যাম্পে পাঠাবে তারপরেও ইউসুফ আমাতকে এই জঘন্য কাজটা করতে হয়েছে! পাঠক, চিন্তা করুন, কতটা ঝড় বয়েছে আমাতের মনে! বুকে কতটা পাথর বেঁধে, কষ্ট লুকিয়ে দিন পার করতে হয়েছে তার!

পাঠক, আপনি একবার ইউসুফ আমাতের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করুন। টগবগে

এক যুবক আপনি। মা, বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নির প্রতি এক সিন্ধু ভালোবাসা আপনার বুকে। নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন ওদের। আপনার সামনে চীন দুটো পথ খোলা রেখেছে।

১) নিজের বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নির বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো (আপনি জানেন আপনাদের দেয়া তথ্য ওদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে)।

২) তোমার বৃদ্ধা মাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে!

তৃতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই। হয় এটা নয়তো ওটা!

পাঠক, কোনটা বেছে নিতেন আপনি? কাকে প্রাধান্য দিতেন? মাকে নাকি বোন, ভাগ্নে আর ভাগ্নিকে?

দুনিয়ার কঠিনতম প্রশ্নের মধ্যে এটি কি একটি নয়? আপনি কি বুঝতে পারছেন, কতটা আর্দ্রতা জমেছিল ইউসুফ আমাতের বুকে? আপনি কি অনুভব করতে পারছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার একটি দিতে হয়েছিল ইউসুফ আমাতকে?

এ রকম অবস্থায় পড়লে আপনি কী করতেন? কাকে দিতেন ভালোবাসার অগ্রাধিকার?

ইউসুফ আমাত বলেছিল সে একা নয়, তার মতো অসংখ্য চর নিয়োগ দিয়েছে চীন। নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দিয়েছে ওদের। বাধ্য করেছে। শাস্তি দিয়েছে! মানবতা জবাই হয়ে গেছে চীনে।

সিসি ক্যামেরা, অ্যাপ, আমাতের মতো স্পাই ছাড়াও আরেক ধরনের স্পাই আছে চীনের। উইঘুরদের ওপর নজরদারি করার জন্য। বড় নির্দয়, বড় নিষ্ঠুর সেই গুপ্তচরের দল!

দুই.

ছবির মহিলা দুজন হাসছে কিন্তু হালমুরাত ইদ্রিসের মনে হলো ছবি সত্য কথা বলছে না। কোথাও ঘাপলা আছে, বিশাল ঘাপলা!

মহিলাদের একজনকে সে চেনে। নামধাম ঠিকানা সব জানে, এমনকি বয়সও জানে– ৩৯ বছর! ভদ্রমহিলা ইদ্রিসের বোন। কিন্তু অন্য মহিলার ব্যাপারে তার কোনো ধারণা নেই।

আবার ছবির দিকে তাকাল ইদ্রিস। হাসি ঝুলে আছে দুজনের মুখে। তার বোনের হাসি অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত নয়, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় জোর করে হাসার চেষ্টা করছে সে।

অন্য মহিলাটা কে? ওর সাথে কেন ছবি তুলেছে ছোটবোন?

আবার ছবির দিকে তাকাল সে। চোখ গেল ছবির ক্যাপশনের দিকে। হাসির ইমোটিকন দিয়ে বোন লিখেছে, 'দেখো সবাই! আমার এখন একজন হান চাইনিয মা রয়েছে!'

মুহূর্তেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ইদ্রিসের কাছে। এই মহিলা একজন স্পাই। চীন সরকার তার পরিবারের লোকজনের ওপর নজরদারি করার জন্য এই নাটক সাজিয়েছে!

উইঘুরদের ঘরে নজরদারি করার জন্য 'বাবা', 'চাচা', 'ভাই' সাজিয়ে সরকারি লোক ঢোকানো হয়েছে। চীন সরকার নিজেরাই স্বীকার করেছে প্রায় ১০ লক্ষ হান চাইনিযকে ঢোকানো হয়েছে উইঘুরদের ঘরে।

দুই মাস পরপর হান চাইনিয আত্মীয়রা বেড়াতে আসে। পাঁচ থেকে ছয়দিন থাকে। এটা হলো রুটিন ওয়ার্ক। এ ছাড়াও হুটহাট যেকোনো সময় হাজির হয় ওরা। নামাযের সময়গুলো ওদের বেশি পছন্দ। ওই সময়ই আসে বেশির ভাগ 'আত্মীয়'। উইঘুরদের ডেকে নিয়ে যায় পার্টি মিটিঙে। যেতে না চাওয়া তো দূরে থাক, একটু ইতস্তত করলেই কোনো কথা নেই, সোজা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

উইঘুরদের নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত জেনে নেয় ওরা। পরিবারের কোনো সদস্য নামায পড়ল কি না, কুরআন পড়ল কি না, বিদেশে কারও সাথে যোগাযোগ করল কি না, মদ খেতে বা শূকর খেতে আপত্তি জানাল কি না, তার আয়ের উৎস কী, কোথায় কোথায় যায়, কার সাথে মেশে—সব দিকে নজর রাখে ওরা। বিয়েশাদি, দাফন-কাফন, নতুন শিশুর জন্ম ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে ওদের উপস্থিতি একদম শতভাগ। তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখে কোথাও কোনো 'ইসলামি' রীতিনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না। নামায পড়া তো দূরের কথা বাসায় জায়নামাজ পাওয়া গেলে, কুরআন বা হিজাব পাওয়া গেলে বা কেউ ভুলে কথার মাঝে কোনো ইসলামি শব্দ (সালাম, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ইত্যাদি) উচ্চারণ করলে আর রেহাই নেই—সঙ্গে সঙ্গে হান 'আত্মীয়রা' খবর পাঠিয়ে দেয় পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায় পুরো পরিবারের সবাইকে।

অনেক সময় হয় কি, হান আত্মীয়রা একেবারে পাকাপাকিভাবে উইঘুরদের বাসায় চলে আসে থাকার জন্য। বিশেষ করে যে বাসায় কোনো পুরুষমানুষ নেই (ক্যাম্পে বন্দী বা নিখোঁজ) সে বাসায় থাকতে এদের বিশেষ আগ্রহ। আব্দুযাহির ইউনুস ইস্তাম্বুলে পালিয়ে আসার আগে উরুমচিতে থাকত। ইউনুস জানাচ্ছে, 'আমার বাবা-মা এবং বড় ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পরে আমাদের বাড়ি পুরুষশূন্য হয়ে যায়। শুধু

আমার ভাবি আর আমার ৫ বছরের পিচ্চি ভাই বাড়িতে ছিল। সে সময় হান পুরুষ 'আত্মীয়' পাততাড়ি নিয়ে চলে আসে আমাদের বাড়িতে—সব সময় থাকার জন্য!' চীনা সরকারের কাছ থেকে যা ইচ্ছে করার লাইসেন্স পেয়ে এই হান পুরুষ 'আত্মীয়রা' একই বিছানায়, একই কম্বলের নিচে তাদের উইঘুর নারীদের সাথে শুয়ে থাকে। উইঘুর নারীদের বাঁধা দেয়ার কিংবা প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ থাকে না। কিছু বললেই সোজা পাঠিয়ে দেয়া হবে ক্যাম্প।

রেডিও ফ্রি এশিয়া গত জুলাইয়ে কথা বলেছিল হোতান এলাকার শহর এবং গ্রাম থেকে আসা দুজন উইঘুর নেতার সঙ্গে। দুই উইঘুর নেতাই জানিয়েছেন, তাদের বাড়িগুলোতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সরকার থেকে ঠিক করে দেয়া হান 'আত্মীয়রা' বেড়াতে আসে। চাইনিয ভাষা শেখায়, সরকারের পলিসির ব্যাপক প্রশংসা করে। খালি হাতে আসা কেমন দেখায় তাই 'উইঘুর আত্মীয়দের' দেখতে আসার সময় 'হান আত্মীয়রা' সাথে করে মদ আর শূকরের মাংস নিয়ে আসে। এগুলো উইঘুর আত্মীয়রা খেলে তারা যে খুব খুশি হবে এটা জানাতেও ভোলে না।

তখন আপনারা কী করেন? রেডিও ফ্রি এশিয়ার সাংবাদিকের এই প্রশ্নে মুখ কালো হয়ে যায় দুই নেতারই।

বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রাম থেকে আসা নেতা বলেন, 'আমরা এখনো ততটা পাগল হয়ে যাইনি যে হান আত্মীয়দের বলব আমরা মুসলিম, তাই তোমার আনা মদ আর শূকরের মাংস খাব না।'

এই সামগ্রিক বিকৃত আগ্রাসনকে খুবই মহৎ কর্তব্যবোধের মুখোশ পরিয়ে দিয়েছে চীন।

'উইঘুরদের জীবনব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের। ওরা খুবই দরিদ্র। ঠিকঠাক খেতে পায় না। জীবনযাপনের পদ্ধতি এবং খাবার-দাবার খুবই অস্বাস্থ্যকর। ভাষা-সংস্কৃতিও তেমন সমৃদ্ধ না! আমরা তাই নিজেদের কাঁধে মহান এক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছি। আমরা সরকারি লোক পাঠাচ্ছি ওদের বাড়িতে। ওরা উইঘুরদের সব সমস্যা কাছ থেকে দেখছে। সব সমস্যার সমাধান করছে, হাতেকলমে কাজ শেখাচ্ছে। দরিদ্র, অকর্মণ্য, অলস, নীচু জাতির উইঘুরদের আমরা তুলে নিয়ে আসব আমাদের কাতারে! সবাই মিলে এক মহান সভ্যতা গড়ে তুলব আমরা!'

কী পাঠক, কেমন পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে না কথাগুলো? জি, আপনি ঠিকই ধরেছেন। নাৎসিদের প্রেতাত্মা ফিরে এসেছে চীনে। প্রত্যেকটা হান চাইনিযদের ঘাড়ে চেপে বসেছে নাৎসিদের ভূত। আর্য রক্তের কল্পিত আভিজাত্যে নাৎসিরা যেমন তাণ্ডব চালিয়েছিল পৃথিবীবাসীর ওপর, ঠিক একই কায়দায় খেলে যাচ্ছে হান চাইনিযরা!

ইদ্রিসের বোন আর হান চাইনিয ‘মায়ে’র ওই ছবিতেই কমেন্ট করে তার বোনের এক বন্ধু, ‘এই, আমারও এমন একজন মা আছে। সাবধানে থাকিস!’

ইদ্রিসের দুই বোন জোর চেষ্টা চালাচ্ছে তুরস্কে ভাইয়ের কাছে চলে আসার। কিন্তু বারবার ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে ওদের পাসপোর্ট অফিস থেকে। গত গ্রীষ্মে তার দুই বোনই তাকে উইচ্যাট থেকে ব্লক করে দেয়। কিছুদিন পরে একই কাজ করে তার খালাও। এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না ইদ্রিস! যাদের সাথে দিনে একবার অন্তত কথা বলতে না পারলে পেটের খাবার হজম হতো না—এক বছর হয়ে গেল তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। ৩৬৫ দিন চলে গেল একবারও ইদ্রিস শুনতে পায়নি ‘ভাইয়া’ ডাক। ৪৯ বছরের ইদ্রিসকে খালা আর আগের মতো ফোন করে উপদেশ দেন না, ‘শরীরের যত্ন নিস, রাত জাগিস না’। খালার উপদেশ আগে মানলেও এখন মানতে পারে না ইদ্রিস। খালা আর দুবোনের চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটায় ও—কেমন আছে, কোথায় আছে খালামণি? নতুন মায়ের কাছে কেমন আছে আমার বোনেরা![৪৫],[৪৬]

ঠান্ডা মাথায় একবার পুরো বিষয়টি ভাবুন। চিন্তা করুন, উইঘুরদের কেমন জীবন কাটাতে হচ্ছে। ৩০ লক্ষ উইঘুরদের পাঠানো হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। তার মানে হলো প্রতি ১০ জন উইঘুরদের মধ্যে থেকে একজন উইঘুর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী। প্রায় প্রত্যেকটা পরিবার থেকে একজন, কোনো কোনো পরিবারের একাধিক সদস্য, আবার কোনো কোনো পরিবারের সবাইকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্যাম্পগুলোতে ঠান্ডা মাথায় চালানো হচ্ছে নারকীয় নির্যাতন। অনেক স্বজন নিখোঁজ—বেঁচে আছে না মরে গেছে কোনো খোঁজ নেই। বিদেশে থাকা কোনো স্বজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা মানে মৃত্যুর চাইতেও ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনা। সব সময় সবার মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করে—এই বুঝি আমাকে ধরে নিয়ে গেল…! পাঠক এর যেকোনো একটি যদি আপনার বা আপনার স্বজনদের সাথে ঘটত, তাহলে কি তা আপনাকে পাগল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হতো না? আপনি কি সহ্য করতে পারতেন এই শোকের ভার?

---

[৪৫] Uninvited guests keep watch for China inside Uighur homes. Al Jazeera News, November 20th, 2018. https://tinyurl.com/vfdkuan

[৪৬] Male Chinese ‘Relatives’ Assigned to Uyghur Homes Co-sleep With Female ‘Hosts’. Radio Free Asia, October 31st, 2019. https://tinyurl.com/y2qgasmd

কষ্টের চলচ্চিত্র এখানেই সমাপ্ত নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে একান্ত আপন, নিবিড়, নির্জন ভালোবাসার স্থানটাও বেহাত হয়ে গিয়েছে উইঘুরদের। সে ঘরেও হানা দিয়েছে শকুনেরা। এতশত নির্যাতন, নিপীড়নের পর উইঘুররা তাদের নিজেদের বাড়িতে বসে স্বজনদের জন্য কান্নাকাটি করবে, সিজদাহয় পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে–সেই অধিকারটুকুও হারিয়ে ফেলেছে! বেগানা পুরুষ এসে বসে আছে ঘরে। একসাথে বসে মদ, শূকর খেতে হচ্ছে, একই বিছানায় একই কম্বলের নিচে ঘুমুতে হচ্ছে। মা বলে ডাকতে হচ্ছে এমন মহিলাদের যারা তাদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর ছুতো খুঁজছে সব সময়!

আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম ট্র্যাজেডি কি এটাই নয়? এতটা চোখের জল আর কী ঝরেছিল অন্য কোনো জাতির চোখে? কমিউনিস্ট, নাস্তিক হান চাইনিযরা সীমাহীন পৈশাচিকতার যে ইতিহাস লিখল উইঘুরদের রক্ত আর অশ্রু দিয়ে তা কি ছাড়িয়ে যায়নি অতীতের অধিকাংশ পৈশাচিকতার রেকর্ডকে?

তিন.

'সরকারের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন, খারাপ লাগে না আপনার এখন?' মেপে মেপে স্পষ্টভাবে, কিন্তু কোমল গলায় প্রশ্ন করল স্টিভ।[৪৭]

পুরোটা সময় কিছুক্ষণ পরপর নাক টেনে টেনে কথা বলছিল আমাত। চোখ দুটো দেখলে যে কেউই বলে দিতে পারত বৃষ্টি এল বলে দুচোখে। স্টিভের প্রশ্ন শুনে আর বাধা মানল না বৃষ্টি। টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল বেশ কয়েক ফোঁটা। সোয়েটারের আস্তিনে চোখ মুছল আমাত।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ভীষণ এক অপরাধবোধ সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায় আমাকে। মনে হয় লক্ষ লক্ষ ধারালো সুচ সুচ ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডকে, কিন্তু... কিন্তু আমি যে এই দুঃখভরা পথটাই বেছে নিয়েছিলাম! সরকারের হয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজের জাতি, নিজের ধর্মের সাথে বেইমানি করলাম আর ওরা এর প্রতিদান দিলো আমার মা, আমার বোন আমার দুলাভাই, তার ভাই ও তার বাবা-মাকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে...। তিলে তিলে নরকযন্ত্রণা দিয়ে টুকরো টুকরো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে। আমার কারণে, শুধু আমার কারণেই ওদের আজ এ পরিণতি। আমি নিজের মাকে, নিজের বোনকে ওদের

---

[৪৭] Exposed: China's surveillance of Muslim Uighurs. Steve Chao. Al Jazeera, February 1, 2019. https://tinyurl.com/y9g4jjm8

হাতে তুলে দিয়েছি। এতটা পিশাচ আমি! এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অনুশোচনা কি এই এক জীবনে করা সম্ভব?' বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে থমকে গেল ঘরের হাওয়া!

'আপনি মিডিয়ার সাথে কথা বলতে কেন রাজি হলেন? এখন চাইনিযরা কী আপনাকে ছেড়ে দেবে?'

'দেখুন, চাইনিযরা যা করে চলেছে তাতে আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব না। আমাদের কোনো স্বাধীনতা নেই, উইঘুরদের পছন্দমতো জীবন বেছে নেবার কোনো অধিকার নেই।' ঠান্ডা গলায় বলে চলল আমাত। 'বছরের পর বছর আমরা সরকারের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছি। চীনা সরকার আমাদের একেবারে শেষ করে দিয়েছে। উইঘুরদের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হয়ে গেছে। ওরা জোরগলায় অস্বীকার করে সবকিছু—উইঘুরদের ওপর কোনো অত্যাচার হয়নি, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। মহিলাদের ধর্ষণ করা, বাচ্চাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কোনো প্রমাণ নেই।' দুই সেকেন্ড বিরতি নিল আমাত। তারপর হিমশীতল কিন্তু কঠিন গলায় বলল, 'আমিই তো এসব কিছুর প্রমাণ। এই জীবনে আমার আর হারানোর কিছু নেই। এরই মধ্যে সব হারিয়ে ফেলেছি আমি। প্রত্যেকটা উইঘুরদের গ্রাম আমার নিজের গ্রাম, প্রত্যেক উইঘুর আমার আপনজন। তাদের এই দুর্দিনে আমি কীভাবে মুখ বুজে থাকব? চীন সরকার হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য। ফেলুক। কোনো সমস্যা নেই। অনেক দিন তো বাঁচলাম! আমার জীবনের বিনিময়ে যদি মানুষের মতো বেঁচে থাকার সুযোগ পায় উইঘুররা, তাহলে কোনো অভিযোগ নেই। হাসিমুখে মরতে রাজি আছি আমি!'

আমাতের মুখের দিকে তাকাল স্টিভ। দুচোয়াল শক্ত হয়ে ফুলে আছে আমাতের। চোখ দুটো থেকে কোমল, দুখী ভাব উধাও। জ্বলে উঠেছে চোখজোড়া!

দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে!

প্রতিশোধের!

জোঁক
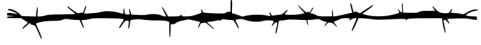
ঘোষণাটা এল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বস, প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর কাছ থেকে। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সংকল্পের মতো করে বলল, 'আমরা চীনে কোনো দরিদ্র মানুষ দেখতে চাই না। ২০২০ এর শেষ নাগাদ দারিদ্র্যকে আমরা জাদুঘরে পাঠাব।'

বসের সুরে সুর মিলিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব তুর্কিস্তান প্রদেশের সেক্রেটারি চেন চোয়াংগোয়া বলল, 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় পার করছি আমরা। ধাপে ধাপে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাচ্ছি আমরা।'

চীন সরকার টার্গেট করল উইঘুর আর কাযাখ মুসলিমদের। পূর্ব তুর্কিস্তানে যাদের বাস। সরকারের ভাষায় এই ২০-২২ মিলিয়ন মুসলিম জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের জন্যে বোঝা। পশুপালন, চাষাবাদ ইত্যাদি যেসব কাজ ওরা করে, সেগুলো আসলে কোনো কাজই না। কাজেই এদেরকে ট্রেইনিং দিয়ে কাজে লাগাতে হবে।

ঠিক কতজন মুসলিমকে চীন সরকার কাজ দেবে সেটা এখনো ঠিক করতে পারেনি ওরা। একেক সময় একেক কথা বলে। ২০১৮ সালে পরিকল্পনা করেছিল ১ লক্ষ উইঘুর আর কাযাখ মুসলিমদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ দেবে। কিছুদিন আগে আবার জানাল ২০২৩ সাল নাগাদ ১০ লাখ সংখ্যালঘু মুসলিমদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে চায় ওরা।

সরকারি কর্মকর্তারা পূর্ব তুর্কিস্তানের গ্রামে গ্রামে ঘোষণা দিলো, তোমাদের অবশ্যই, অতি অবশ্যই ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে হবে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য কোটা ঠিক করে দেয়া হলো, সেই পরিবার থেকে কমপক্ষে এতজন লোক দিতে হবে ফ্যাক্টরিতে। কোটা পূরণ করতে না পারলেই শাস্তি। 'গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরবা, গদাই লস্করি চালে

চলবা, অলস বসে থেকে শুধু সন্ত্রাসবাদ আর জাতিগত দাঙ্গার ফন্দি আঁটবা–তা আর হবে না বাপু। ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেই হবে। কোনো মাফ নাই। কোনোমতেই গরিব থাকা যাবে না, ধনী হতেই হবে।’

হই হই রব পড়ে গেল চারপাশে। যন্ত্রের গতিতে শুরু হয়ে গেল কর্মতৎপরতা। খাটতেও পারে চীনারা। রাতারাতি পূর্ব তুর্কিস্তানের জায়গায় জায়গায় গজিয়ে উঠল ফ্যাক্টরি।

সরকার বলল, এবার কপাল খুলে গেছে উইঘুরদের। ধনী না হয়ে তাদের আর কোনো উপায় নেই। অনলাইনে ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল–উইঘুর-কাযাখ গার্মেন্টস কর্মীরা সকালবেলা কমলা রঙের ইউনিফর্ম পরে, আর্মিদের মতো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। গলা ফাটিয়ে একযোগে স্লোগান দেয় কমিউনিস্ট সরকারের প্রশংসায়। কেঁপে উঠে আকাশ বাতাস। সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের কলরব তুলে হাসিমুখে তারা বসে যায় সেলাই মেশিনের সামনে!

আহ্, চারিদিকে শুধু সুখ আর সমৃদ্ধি। হাসি আর আনন্দ!

গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের ‘উপস্থিতিতে’ সাক্ষাৎকার নেয়া হলো উইঘুর তরুণী গুজালনুর মামাতজানের। খুশিতে ডগমগ করছে সে। উচ্ছ্বসিত গলায় জানাল, ‘মাসে প্রায় ২০০ ডলার আয় করি আমি ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। এখানেই দুই-তিন বছর কাজ করব, তারপর কাপড়ের একটা দোকান দিয়ে ফেলব আমি। আমার নিজের!’ শেষ হলো সাক্ষাৎকার।[৪৮]

কিন্তু বাস্তবতা কি আসলেই এ রকম? রিএডুকেশন ক্যাম্পের পাঠ চুকিয়ে ফ্যাক্টরিতে এসে উইঘুর-কাযাখরা কি আসলেই ‘অতঃপর সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকে?’ আসলেই কী ওদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে? নাকি মুদ্রার ওপর পিঠে লুকিয়ে আছে কুৎসিত কদাকার কিছু?

দুই.

আপনি যদি বেকার কোনো জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চান বা তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে চান, তাহলে তাদের সবচেয়ে কর্মক্ষম মানুষদেরই তো চাকরি দেবেন, তাই না? হাফ প্যান্ট পরা শিশু বা দাঁত পড়ে যাওয়া কোনো বুড়োকে কি

---

[৪৮] Inside China’s Push to Turn Muslim Minorities Into an Army of Workers. Chris Buckley & Austin Ramzy. The New York Times, December 30th. 2019. https://tinyurl.com/sthxxgk

চাকরি দেবেন? যদি তাদের পরিবারেই তাগড়া জোয়ান লোক থাকে?

হ্যাঁ, যদি আপনি পাগল হন, তাহলে এমন করতে পারেন। অথবা মনে যদি অন্য কিছু থাকে, যদি আপনি চাকরির মুলো ঝুলিয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চান, তাহলে এমন করতে পারেন।

চীন সরকার পাগল নয়; কিন্তু তারপরও তারা ঠিক এ কাজটাই করছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ আর চাকরি দেবার কথা বলে ধরে এনেছে প্রতিষ্ঠিত উইঘুর ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কর্পোরেট চাকরিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ধনী কৃষক, দক্ষ পেশাজীবীদের। তারপর লাগিয়ে দিয়েছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাজে। এত এত দক্ষ মানুষদের দিয়ে তুলো সংগ্রহ করাচ্ছে, কার্পেট ও মোজা বানানোর কাজে লাগাচ্ছে। কাউকে কাউকে দিয়েছে ক্লিনারের কাজও!

অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকদেরও ছাড় দেয়নি সরকার। ধরে নিয়ে গেছে 'ভোকেশনাল ট্রেইনিং' দিতে। ৭৪ বছরের বৃদ্ধকে পর্যন্ত ফ্যাক্টরির কাজে লাগানো হয়েছে! চাকরি দেবার নামে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে যাদের 'প্রশিক্ষণ' নিতে পাঠানো হয়েছে তাদের অর্ধেকেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। পায়ের নিচে শক্ত ভিত গড়ে নিয়েছে যারা ইতিমধ্যেই। জীবনের শেকড় পৌঁছেছে মাটির গভীরে। নতুন করে আর কোনো পরিচর্যার দরকার নেই যাদের। যারা এখনো মাটিতে শেকড় নামাতে পারেনি সেই তরুণ, যুবকদের বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত উইঘুরদের কেন ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের কাজ দেয়া হচ্ছে?[৪৯]

এটাই কী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া! 'অলস', 'অকর্মণ্য' জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনবলে পরিণত করা?

যদি উইঘুরদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার সদিচ্ছা সরকারের থাকত, তাহলে প্রতিষ্ঠিত উইঘুর ব্যবসায়ীদের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে কেন দেশে ফেরত নিয়ে এল চীন সরকার? যেসব উইঘুর বিদেশে রেস্টুরেন্ট বা অন্যান্য ব্যবসা নিয়ে একেবারে জাঁকিয়ে বসেছিল, তাদের কেন ফেরত নিয়ে যাওয়া হলো পূর্ব তুর্কিস্তানে? কেন চায়না প্রপারের কর্মবাজার থেকে বিতাড়িত করা হলো দক্ষ, কর্মঠ, উইঘুর-কাযাখদের? তাদের ঠেলে দেয়া হলো 'অনুন্নত' পূর্ব তুর্কিস্তানেই?

---

[৪৯] Xinjiang's New Slavery. Adrian Zenz. Foreign Policy, December 11th, 2019. https://tinyurl.com/tqjemtb
China's forced labor campaign in Xinjiang. Leigh Hartman. September 12th, 2019. https://tinyurl.com/yx6tswew

এত সব 'কেন'র উত্তর বুঝতে বিশাল পণ্ডিত হতে হয় না। 'কর্মসংস্থান', 'জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন' ইত্যাদি ফাঁপা বুলি আউড়ে চীন সরকার খেলে যাচ্ছে অন্য এক পৈশাচিক খেলা!

চীন সরকার একে 'জব ফেয়ার' বা 'কর্মমেলা' হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। বলতে চাইছে উইঘুররা স্বেচ্ছায় নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে আসছে। কিন্তু আসলে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সাথে এসব ট্রেইনিং সেন্টার আর ফ্যাক্টরির চাকরির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এগুলোও একধরনের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। কেবল আকারে একটু ছোট আর কম সময় থাকতে হয়, এই যা। সবগুলোর উদ্দেশ্য একটাই–যেভাবে পারা যায় উইঘুরদেরকে সেকুল্যার বানানো, তাদেরকে ইসলাম ভুলিয়ে দেয়া, তাদের সংস্কৃতি এবং ভাষা ভুলিয়ে দেয়া, ব্রেইনওয়াশ করে কমিউনিস্ট পার্টির অনুগত ও নিষ্ঠাবান এক ভৃত্যে পরিণত করা। আর বোনাস হিসেবে বন্দীদের বেগার খাটিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামানো।[৫০]

কাঁটাতার, উঁচু প্রাচীর, সিসিটিভি ক্যামেরা, ওয়াচটাওয়ার–নিরাপত্তার জন্য যা যা ব্যবস্থা ছিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, ফ্যাক্টরিগুলোতেও একই অবস্থা। একই রকম নিরাপত্তা প্রটোকল অনুসরণ করে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে ওগুলো। কোথাও কোথাও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের গা ঘেঁষেই তৈরি হয়েছে ফ্যাক্টরি, কোথাও আবার ক্যাম্পের ভেতরেই। বন্দীদের ক্যাম্প থেকে বের করেই চালান দেয়া হয় ফ্যাক্টরিতে। জায়গা বদলায়, নাম বদলায়; কিন্তু বন্দীদের ভাগ্য বদলায় না। ক্যাম্প পরিচালিত হয় সামরিক স্টাইলে। সকালে কর্মীদের ড্রিল করতে হয়, স্লোগান দিতে হয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রশংসায়।

কর্মীরা ফ্যাক্টরি ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। ফ্যাক্টরির ভেতরেও সব জায়গায় যাবার অনুমতি নেই। কেবল বিশ্বস্ত কর্মীরাই ফ্যাক্টরি ছেড়ে নিজের বাড়িতে ঘুরতে যেতে পারে। তবে এর জন্য দরকার পড়ে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার লিখিত অনুমতির। কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি কতটা অনুগত সেটার ওপর ভিত্তি করে র‍্যাংক তৈরি করা হয়। বিশস্ত কর্মীদের ছাড় দেয়া হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। অপেক্ষাকৃত কম বিশ্বস্তদের জন্য সন্ধ্যায় থাকে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা।

চীন সরকার জোর গলায় বলেছিল, 'ফ্যাক্টরিতে কাজ দিয়ে আমরা উইঘুরদের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দেবো'। আসলেই কী তথাকথিত উন্নত জীবনের স্বাদ পেয়েছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমরা?

---

[৫০] Xinjiang's New Slavery. Adrian Zenz. Foreign Policy, December 11th, 2019. https://tinyurl.com/tqjemtb

সরকারের নিজস্ব রিপোর্টই[৫১] বলছে উইঘুরদের এভাবে ফ্যাক্টরিতে পাঠানোর কারণে তাদের পরিবারগুলো দিন দিন দরিদ্র হয়ে পড়ছে। অনেক পরিবারই চলে গেছে দারিদ্র্যসীমার নিচে!

চীন সরকার বলেছিল কর্মীদের মাসে মাসে ৪০০ ডলার করে বেতন দেয়া হবে। মাসে ৪০০ ডলার মোটামুটি ভালো বেতন। কিন্তু ওই বলা পর্যন্তই; বাস্তবে আর সেটা হয়নি। পূর্ব তুর্কিস্তানের চলা শ্রমপ্রকল্পের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ অ্যাড্রিয়ান যেনয বলছেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কিস্তানের ৪৩টি ফ্যাক্টরির কর্মীদের তথ্য-উপাত্ত আমি যাচাই-বাছাই করেছি। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কর্মীর মাসিক মজুরি ১১৪ ডলার!'

১১৪ ডলার মানে মোটামুটি ১০ হাজার টাকা। এদের ভাগ্য তাও কিছুটা ভালো। অল্প হলেও কিছু টাকা তো পাচ্ছে। কিন্তু এমন হাজার হাজার কিংবা লাখ লাখ উইঘুর আর কাযাখদের বিনা পারিশ্রমিকে শক্তির শেষ বিন্দু পর্যন্ত খাটিয়ে নিয়েছে চীন সরকার। এই অমানুষিক পরিশ্রমে মারা গেছে অনেকেই–যাদের খোঁজ কেউ জানে না![৫২]

৭৪ বছরের বৃদ্ধকে দিয়েও ওরা কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কাজ করিয়ে নিচ্ছে অবসর নেয়া মানুষগুলোকে দিয়েও। সারা জীবন সংসারের ঘানি টেনে ক্লান্ত মানুষগুলো হয়তো ভেবেছিলেন, অনেক তো হলো–এবারে কিছুটা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবেন। হয়তো ভেবেছিলেন নাতি-নাতনি, বুড়ি, ছেলেমেয়ের সাথে বাকি জীবনটা নির্বিঘ্নে আরাম-আয়েশে, আনন্দে পার করে দেবেন! কিন্তু এই মানুষগুলোকেও পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে ফ্যাক্টরিতে। আগে হয়তো ছিলেন কোনো অফিসের বড়কর্তা, হুকুম দিতেই অভ্যস্ত এমন; কিন্তু ফ্যাক্টরিতে এসে এই বৃদ্ধ বয়সে সীমাহীন দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হচ্ছেন হাঁটুর বয়সী লোকদের কাছ থেকে। কারও হয়তো ভঙ্গুর শরীর, ছেলেমেয়েদের সেবা-শুশ্রূষা দরকার; অথচ এমন বৃদ্ধকেও খাটতে হচ্ছে দিনরাত এক করে সাধারণ শ্রমিকের কাজে। মাঠ থেকে তুলো সংগ্রহ করতে হচ্ছে, ইট বানাতে হচ্ছে–চেয়ে চেয়ে দেখতে হচ্ছে তার জাতির লোকদের মগজধোলাই করছে হান চীনারা। তার ভাষাকে, তার ধর্মকে, তার আত্মপরিচয়কে চরম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে! এক জীবনে কতটা আর কষ্ট পাবেন হতভাগ্য মানুষগুলো?

---

[৫১] "Wash Brains, Cleanse Hearts": Evidence from Chinese Government Documents about the Nature and Extent of Xinjiang's Extrajudicial Internment Campaign. Adrian Zenz (2019). Journal of Political Risk, Vol., No. 11, November 2019. https://tinyurl.com/ugph4oq

[৫২] Inside China's Push to Turn Muslim Minorities Into an Army of Workers. Chris Buckley & Austin Ramzy. The New York Times, December 30th. 2019. https://tinyurl.com/sthxxgk

তিন.

জোর করে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের খাটিয়ে নেয়া চীনের জন্য নতুন কিছু না। অনেক আগে থেকেই উইঘুরদের বিনামূল্যে শ্রম দিতে বাধ্য করে আসছে ওরা। উইঘুর যুবক তাহির হামুত জানাচ্ছে একদম প্রাইমারী স্কুলে থাকা অবস্থাতেই সরকার তাকে বাধ্য করে বেগার খাটতে। তাহিরের মতো অসংখ্য উইঘুরকে এভাবে জীবনের শুরু থেকেই সরকারের জন্য শ্রম দিতে হয় পূর্ব তুর্কিস্তানে। তাহির অনেকদিন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পেও ছিল। সেখানে অন্যান্য বন্দীদের সাথে তাকে ইট তৈরি, তুলোর মাঠে কাজ ইত্যাদি করতে হতো। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেয়া হতো–তুমি এই পরিমাণ কাজ করবে। লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে দিনশেষে নেমে আসত কঠোর নির্যাতন।

CPIC (Citizen Power Initiatives for China) এর রিপোর্ট বলছে, পূর্ব তুর্কিস্তানে আনুমানিক ৫ লাখ থেকে ৮ লাখ বন্দী উইঘুরকে বাধ্য করা হচ্ছে বিনা পারিশ্রমিকে বা নামেমাত্র পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে। কটন ইন্ডাস্ট্রি চলছে পুরোই উইঘুর বন্দীদের রক্ত, ঘাম আর অশ্রু মেশানো শ্রমের ওপর নির্ভর করে।[৫৩]

Center for Strategic and International Studies (CSIS) এর রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের মোট তুলাজাত পণ্যের শতকরা ২২ ভাগ সাপ্লাই দেয় চীন একাই। আর চীনের কটন ইন্ডাস্ট্রির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তান। চীনের শতকরা ৮৪ ভাগ কটন পণ্য আসে পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে।[৫৪]

সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত প্রত্যেক হান চীনা লাভবান হচ্ছে উইঘুরদের এই শ্রমদাসত্বে। লাভবান হচ্ছে কমিউনিস্ট সরকার। লাভবান হচ্ছে চীনের সুবিশাল হান জনগোষ্ঠী। CPIC বলছে চীনের অর্থনীতির সাথে শ্রমদাসত্ব এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে, এটাকে আলাদা করাই এখন কঠিন ব্যাপার। কোনটা যে আসলে উইঘুরদের শ্রমদাসত্বের ফসল, আর কোনটা যে স্বাভাবিক লাভ–সেটা বোঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫৫]

২০২০ সালের ২৩ জুলাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৮০টার মতো উইঘুর অধিকার গ্রুপ, শ্রমিক ইউনিয়ন, সিভিল সোসাইটি গ্রুপ প্রেস রিলিজ দিয়ে বলেছে, ‘চীন

---

[৫৩] China profiting off of forced labor in Xinjiang: report. Umar Farooq. Anadolu Agency, August 8th, 2019. https://tinyurl.com/yyc3v7ey

[৫৪] Xinjiang cotton sparks concern over ‘forced labour’ claims. Ana Nicolai da Costa. BBC News, November 13th, 2019. https://tinyurl.com/tb2w55q

[৫৫] China profiting off of forced labor in Xinjiang: report. Umar Farooq. Anadolu Agency, August 8th, 2019. https://tinyurl.com/yyc3v7ey

উইঘুরদের শ্রমদাসত্বে বাধ্য করছে'। কার্যত বিশ্বের পুরো পোশাকশিল্পই দূষিত হয়ে গেছে উইঘুর-কাযাখদের শ্রমদাসত্বের মাধ্যমে। পুরো পোশাকশিল্পই এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

অ্যাপল, অ্যাডিডাস, অ্যামাযন, ক্যালভিন ক্লাইন, পুমা, জ্যাক অ্যান্ড জৌন্স, বিএমডাবলিও, গ্যাপ, নাইকি, স্যামসাং, সনি, হুয়াওয়েই, এবং ফক্সওয়াগ্যানের মতো বিশ্ববিখ্যাত অসংখ্য কোম্পানী লাভবান হচ্ছে উইঘুর শ্রমদাসদের দ্বারা।[৫৬]

করোনা মহামারির সময়ে উইঘুর শ্রমদাসদের দ্বারা পিপিই, মাস্ক ইত্যাদি বানিয়েও চীন সেগুলো রফতানি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে।[৫৭]

বরাবরের মতোই চীন সরকার অস্বীকার করেছে উইঘুরদের শ্রমদাসত্বে বাধ্য করার বিষয়টা। সরকার বলছে, আমরা উইঘুরদের দাস বানাইনি; বরং চাকরি দিয়েছি। ওদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চেয়েছি।

তাহলে ফ্যাক্টরিগুলোতে কেন এত কড়াকড়ি? মানুষ তো দূরে থাক কাকপক্ষীকেও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেয়া হয় না কেন ফ্যাক্টরির ভেতরে? কী লুকোতে চায় ওরা সবার কাছ থেকে? সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে তদন্ত করার সুযোগ কেন দেয়া হয় না? কোনো কর্মীর সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় না কেন? কেন সব সময় আঠার মতো চর লেগে থাকে পেছনে? সাংবাদিকদের যেদিন ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করার কথা কেন সেদিন ছুটি দেয়া হয় সব কর্মীদের?

কেন এত লুকোচুরি?[৫৮]

---

[৫৬] এই লেখাটি পড়া যেতে পারে। মোটামুটি গুছিয়ে সব বিষয় তুলে ধরেছে বেশ কয়েকজন হাই প্রোফাইল গবেষক।

Uyghurs for sale. Vicky Xiuzhong Xu, Danielle Cave, DrJames Leibold, Kelsey Munro & Nathan Ruser. https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale

Press Release: 180+ Orgs Demand Apparel Brands End Complicity in Uyghur Forced Labour. End Uyghur Forced Labor, July 23rd, 2020. https://tinyurl.com/y2yexhug

'Virtually entire' fashion industry complicit in Uighur forced labour, say rights groups. Annie Kelly, The Guardian, July 23rd, 2020. https://tinyurl.com/y4t5mcrd

[৫৭] China using Uighur forced labour to produce face masks for US market, report claims. Sophia Yan. The Telegraph, July 20th, 2020. https://tinyurl.com/y5up7gys

[৫৮] Inside China's Push to Turn Muslim Minorities Into an Army of Workers.

পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিকই হয়, তাহলে চীন সরকার কেন বিদেশি পরিদর্শকদের দেখিয়ে দেখিয়ে নামায পড়ার জন্য উইঘুর কর্মীদের টাকা দিচ্ছে? বিদেশি পরিদর্শক কী কী প্রশ্ন করতে পারে সেটার সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রশ্নের উত্তর কেন মুখস্থ করানো হয়েছে উইঘুরদের?[৫৯]

Citizen Power Initiatives for China (CPIC) তাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, 'আমাদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটা ধরে নিতেই হবে, চীন থেকে যে কটন প্রোডাক্টই আসুক না কেন, সেটাই উইঘুর-কাযাখ শ্রমদাসদের হাতে তৈরি।'[৬০]

চীনের কিছু কিছু ফ্যাক্টরি থেকে প্রোডাক্ট কেনা বন্ধ করে দিয়েছে কয়েকটি দেশ। হেতিয়ান টাইডা থেকে পোশাক কিনত অ্যামেরিকা। এখন বাদ দিয়েছে কারণ হেতিয়ান টাইডার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে উইঘুরদের শ্রমদাসত্বে বাধ্য করার। জাপানের একটি কোম্পানী ইউনিকলো (Uniqlo) বলছে, তারাও পূর্ব তুর্কিস্তানের যে চাইনিয ফ্যাক্টরি থেকে প্রোডাক্ট কিনত সেটার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

কিন্তু এগুলো খুবই টুকরো টুকরো ঘটনা। রাশিয়া, ইউরোপ বা অ্যামেরিকার সব বাজারই চীনের গার্মেন্টস পণ্যে সয়লাব। যতটা নিষ্ঠুরতার পরিচয় চীন দিয়েছে, এই 'আধুনিক' পৃথিবীতে চীন যত গভীরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে—সেখানে এ রকম দুই একটা কোম্পানীকে বর্জন করে প্রতিবাদ করা মানে উপহাস করা মানবতার সাথে! উইঘুরদের সাথে![৬১]

সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে বলেছিল তারা উইঘুরদের দারিদ্র্য দূর করতে চায়। কিন্তু দিনশেষে তারা যেটা দূর করছে সেটা হলো ইসলাম, উইঘুরদের আত্মপরিচয়। চীন সরকার চুষে ছিবড়ে খাচ্ছে উইঘুরদের।

বেহিসাবি লাভ হচ্ছে দেখে মুখ বুজে আছে অন্যান্য কোম্পানীগুলোও। কেউ কিছু বলছে না, টাকার কাছে হেরে গেছে মানবতা। দেখেও না দেখার ভান করে আছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। জেগে জেগে ঘুমুচ্ছে। চুপ করে আছে 'বিশ্ববিবেক'

Chris Buckley & Austin Ramzy. The New York Times, December 30th. 2019. https://tinyurl.com/sthxxgk

[৫৯] Xinjiang's New Slavery. Adrian Zenz. December 11th, 2019. https://tinyurl.com/tqjemtb

[৬০] China profiting off of forced labor in Xinjiang: report. Umar Farooq. Anadolu Agency, August 8th, 2019. https://tinyurl.com/yyc3v7ey

[৬১] প্রাগুক্ত

অ্যামেরিকা, আর বিশ্বের তাবৎ মোড়লরা। দুনিয়ার আনাচে-কানাচে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এদের কত তোড়জোড়, পৃথিবীর কোনো একটা প্রান্তে একটা মশা-মাছি মরলেও কেঁদে ওঠে নাকি এদের মন। কিন্তু উইঘুরদের এই দাসত্ব দেখেও কিছু করছে না কেউ।

মগজধোলাই

উইঘুরদের ওপর চীনা আগ্রাসন শুধু সেনা নজরদারি, বন্দিত্ব, শ্রমদাসত্ব আর নির্যাতনে সীমাবদ্ধ না। ওদের আগ্রাসন, ওদের পরিকল্পনা আরও গভীর। আরও হিসেবি। পৃথিবীর বুক থেকে উইঘুরদের মুছে ফেলার জন্য ওদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থাবা বসিয়েছে পরিবারেও।

সেই প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই ঠান্ডা মাথায়, নীরবে নিভৃতে কোনো জাতির পরিচয় ভুলিয়ে দেবার জন্য ছকে বাঁধা কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

প্রথমত, জাতিসত্তার মৌলিক রীতিনীতি পালন নিষিদ্ধ করা হয়। চালানো হয় ব্যাপকমাত্রার নজরদারি। সম্ভব হলে সবকিছুই মনিটর করা হয়। সেই সাথে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে বন্দী করা হয় সামান্যতম বিরোধিতা বা বিন্দুমাত্র হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন মানুষদের। কারাগারে চলে মগজধোলাই।

দ্বিতীয়ত, গোপনীয়তা বজায় রাখা। যেকোনো মূল্যে তথ্য ফাঁস হওয়া ঠেকাতে হবে। যে এলাকার মানুষদের জাতিসত্তা মুছে দিতে হবে তাদের কাছ থেকে কোনো তথ্য যেন বাইরে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে বাইরে থেকে কেউ এসে যেন গোপনীয় তথ্য জেনে ফেলতে না পারে, নিশ্চিত করতে হবে সেটাও।

তৃতীয়ত, সেই জাতির সন্তানদের মগজধোলাই করতে হবে। নিজ ধর্ম, পরিচয়, সংস্কৃতি এবং বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে তাদের দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

চতুর্থত, সেই জাতির নারীদের বিয়ে করে নেয়া বা ক্রীতদাসী বানানো। তারা যেন স্বাধীনচেতা কোনো সন্তান জন্ম বা লালন-পালন করতে না পারে এটা নিশ্চিত করতে হবে।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প স্থাপন, লাখ লাখ মুসলিমদের ক্যাম্পে ছুড়ে ফেলা, নজরদারি, সেনা তৎপরতা, গোপনীয়তা বজায় রাখা, উইঘুরদের ঘরে হান চাইযিন দের ঢুকিয়ে দেয়া–উইঘুর-কাযাখদের আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেবার ক্যাম্পেইনে ওপরের পদ্ধতিগুলো খুব সফলতার সাথে প্রয়োগ করেছে চীন। রাষ্ট্রীয় শক্তি লেলিয়ে দিয়ে অন্য ধাপগুলোও সম্পন্ন করছে একেবারে যান্ত্রিক দক্ষতায়।

কাশগড়ে সরকারি একটা নোটিশ ছড়িয়ে পড়ে ২০১৮ এর ফেব্রুয়ারীতে। নোটিশে বলা হয়, রিএডুকেশন সেন্টারে পাঠানো অভিভাবকদের ক্লাস থ্রির ওপরের ক্লাসে পড়া বাচ্চাদের অবশ্যই বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে হবে। বাবা অথবা মায়ের কেউ একজন বাসায় থাকলেও বাচ্চাদের অবশ্যই বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে হবে।[৬২]

বোর্ডিং স্কুলের পক্ষে ক্যাম্পেইন চালাতে গিয়ে সরকার এর নানা উপকারিতার কথা বলছে। বাচ্চাদের বাবা-মা রিএডুকেশন ক্যাম্পে পড়াশোনা করছে, তাদের ভালোমতো দেখেশুনে রাখবে কে? আত্মীয়স্বজন? না তারা পারবে না। তাই আমরা ওই বাচ্চাকাচ্চাদের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছি। আমরা ওদের থাকার জায়গা দেবো, খাবার দেবো, পোশাক দেবো, চীনা ভাষা শেখাব, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব–যেন বের হবার পরপরই চাকরি পেয়ে যায়। সর্বোপরি আদর্শ একজন মানুষ, সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলব ওদের। আর এর সবকিছুই করব একেবারে বিনামূল্যে। কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না।

সরকারের প্রচার-প্রচারণা এবং চাপের মুখে এক বছরের মাথাতেই এই বিশেষ স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫ লাখ পেরিয়ে গিয়েছে।[৬৩]

জলের মতো টাকা ঢালছে সরকার। এক বছরের মধ্যেই পূর্ব তুর্কিস্তানের আট শ'র বেশি শহরের প্রতিটিতে কমপক্ষে দুটি করে বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আগাচ্ছে। আসলে ঠিক কতগুলো স্কুলে উইঘুর বাচ্চাদের 'বিশেষ যত্ন' নেয়া হচ্ছে তা বের করা মুশকিল। সাধারণ কিন্ডারগার্টেনগুলোও ব্যবহার করা হচ্ছে বোর্ডিং স্কুল

[৬২] China is putting Uighur children in 'orphanages' even if their parents are alive. The Independent, Staff & Agencies, September 21st, 2018. https://tinyurl.com/ycrdt2go

[৬৩] China Muslims: Xinjiang schools used to separate children from families. John Sudworth. BBC News, July 4th, 2019. https://tinyurl.com/y5xzak7t

হিসেবে। কড়া সিকিউরিটির মধ্যে পড়ানো হচ্ছে উইঘুর বাচ্চাদের।[৬৪]

পিছিয়ে পড়া উইঘুর বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য সরকার যে স্কুলগুলোর ব্যবস্থা করেছে সেগুলো কয়েক রকমের। একটা ফুল বোর্ডিং স্কুল। বাচ্চাকাচ্চাদের সাথে বাবা-মায়ের কোনো যোগাযোগ নেই। পরিবার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। আরেক ধরনের বোর্ডিং স্কুলের বাচ্চারা সপ্তাহ শেষে বাড়ি যেতে পারে, কিংবা বাবা-মা ওদের এসে দেখে যেতে পারে। আরেক ধরনের স্কুল আছে যেগুলো আবাসিক না। স্কুল শেষে বাচ্চারা বাড়ি যেতে পারে। তবে স্কুলের মূল লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সবগুলোর উদ্দেশ্য এক—উইঘুর শিশুদের ব্রেইনওয়াশ করা।

সন্তানদের দেখতে এসে বাবা-মায়েরা ফেরত যান দুঃসহ এক অভিজ্ঞতা নিয়ে। অমানবিক ব্যবহার করা হয় তাদের সাথে। তারা তাদের সন্তানদের সাথে সরাসরি দেখা করতে পারেন না, স্পর্শ করতে পারেন না। কথা বলতে হয় শক্ত লোহার শিকের ওপাশ থেকে। শিকের ফাঁক গলেই দিতে হয় ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে আসা চকলেট, মিষ্টি, ফলমূল...।

আদিলের নয় বছরের ছেলেকে চীনা প্রশাসন বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়েছে। ছেলের সাথে দেখা করে এসে আদিল জানাচ্ছে, 'কাশগড়ের চিড়িয়াখানায় যেমন লোহার গরাদ দেখেছিলাম, ছেলের স্কুলে তেমন গরাদ দেখে আসলাম।'[৬৫]

এভাবে বাচ্চাকাচ্চাদের বাবা-মা, পরিবার-পরিজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা বা খানিক সময়ের জন্য শিকের আড়াল থেকে দেখা করতে দেবার কারণ কী? উত্তরটা পাওয়া যাবে চাইনিয শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্ল্যানিং ডকুমেন্টে। ২০১৭ সালের এই পলিসি ডকুমেন্ট বলছে, নতুন এই শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে উইঘুর ও কাযাখদের মন থেকে সন্ত্রাসবাদ একেবারে দূর করার শক্তিশালী হাতিয়ার। এর মাধ্যমে পূর্ব তুর্কিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির শাসন যেমন পোক্ত হবে, তেমনি পাওয়া যাবে উইঘুরদের নতুন এক প্রজন্ম যারা কমিউনিস্ট পার্টির নিঃশর্ত আনুগত্য করবে। বাসায় বেশি সময় কাটালে, পরিবার-পরিজনের সাহচর্য পেলে উইঘুর শিশুদের মনে ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার-আচরণের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে। তাই তাদেরকে পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে।[৬৬]

---

[৬৪] China is putting Uighur children in 'orphanages' even if their parents are alive. The Independent, Staff & Agencies, September 21st, 2018. https://tinyurl.com/ycrdt2go

[৬৫] Ibid

[৬৬] In China's Crackdown on Muslims, Children Have Not Been Spared. Ami

ড্যারেন বাইলার, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির নৃবিদ্যা বিভাগের একজন লেকচারার। গবেষণা করেন উইঘুর সংস্কৃতি নিয়ে। বাইলারের মতে বাবা-মা, পরিবার-পরিজন থেকে এভাবে শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে বোর্ডিং স্কুলে পাঠদানের কাজটা আগেও অনেকে করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনামলে অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডার সাদা মানুষেরা সেখানকার আদিবাসী বাবা-মায়ের কাছ থেকে তাদের শিশুদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে আসত। তারপর বোর্ডিং স্কুলে এনে মুছে ফেলত তাদের আত্মপরিচয়। ঠিক এই কাজটাই এখন চীন করছে। উইঘুর-কাযাখদের পুরো একটা প্রজন্মের আত্মপরিচয় ওরা ভুলিয়ে দিচ্ছে। তবে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বা অ্যামেরিকার ঔপনিবেশিক শাসকদের সাথে চীনের বড় একটা পার্থক্য আছে। চীন ঔপনিবেশিক শাসকদের চাইতেও অনেক সিস্টেমেটিকভাবে, অনেক বড় আকারে এই ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে। পুরো উইঘুর সমাজটাকেই পরিবর্তনের চেষ্টা করছে চীন।[৬৭]

স্কুলগুলোতে উইঘুর ভাষা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে উইঘুর ভাষায় লিখিত বই বিক্রিও।[৬৮]

কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চাদের ওপর পর্যন্ত জোর করে ম্যান্ডারিন চাইনিয চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সাইনবোর্ডে লাল কালিতে বড় বড় করে লিখে দেয়া হয়েছে–দয়া করে স্কুল কমপাউন্ডে ম্যান্ডারিন চাইনিয ব্যবহার করুন। সম্পূর্ণ পাঠদান চলছে চাইনিযে।

শত অনুরোধ সত্ত্বেও পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রাদেশিক সরকার এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি। কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরের মতোই শুনিয়ে গিয়েছে সেই ভাঙা রেকর্ড–'আমাদের অবৈতনিক বোর্ডিং স্কুল সন্তানদের শিক্ষার খরচ বহন করার হাত থেকে অভিভাবকদের

Qin. The New York Times, December 28th, 2019. https://tinyurl.com/v4lujqb
Tell the World: The Silent Plight of China's Uighurs. Al Jazeera, October 25th, 2019. https://tinyurl.com/yxp9cpfv
China sends 500,000 Uyghur children to 'detention camps'. Taiwan News, December 30th, 2019. https://tinyurl.com/t47tcuv
২০১৭ তে প্রকাশিত চীনের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নথি - https://tinyurl.com/t5mvvh7

[৬৭] Tell the World: The Silent Plight of China's Uighurs. Al Jazeera, October 25th, 2019. https://tinyurl.com/yxp9cpfv
China is putting Uighur children in 'orphanages' even if their parents are alive. The Independent, Staff & Agencies, September 21st, 2018. https://tinyurl.com/ycrdt2go
In China's Crackdown on Muslims, Children Have Not Been Spared. Ami Qin. The New York Times, December 28th, 2019. https://tinyurl.com/v4lujqb

[৬৮] A language under attack: China's campaign to sever the Uighur tongue. Rustem Shir. Hong Kong Free Press, June 18th, 2019. https://tinyurl.com/yybnarwy

মুক্তি দিয়েছে। আমাদের ঠিক করা আধুনিক সিলেবাসে পড়াশোনা করলে তদের সন্তানদের চাকরি পাবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে।'

উইঘুর বাবা-মায়েরা চাকরি চায় না। তারা চায় তাদের সন্তান যেন তাদের মতোই থাকে। নিজস্ব পরিচয়, ভাষা-সংস্কৃতি ভুলে যেন অপরিচিত আগন্তুক হিসেবে বেড়ে না ওঠে।

মেরিয়াম ইউসুপের চার সন্তানকে সরকার নিয়ে গেছে 'এতিমখানায়'। অসহায় আকুতি নিয়ে এই পিতা বলছিল, 'যদি বাচ্চাদের জোর করে চাইনিয বলতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রতিটি দিন ওদের হান চাইনিযদের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে ওরা তো আর আমাদের মতো থাকবে না।'

মায়ের ভাষার জন্য জীবন দেয়া, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা বাঙালি কি বুঝবে অসহায় এই পিতার কষ্ট? শুনতে কি পাবে ৫ লাখ উইঘুর শিশুর বোবা কান্নার আওয়াজ?

বাচ্চাদের ব্রেইনওয়াশ করার জন্য মাথা খাটিয়ে পাঠ্য বইয়ের বিষয় ঠিক করা হয়েছে। আগের সিলেবাস আমূল বদলে ফেলে নতুন করে ঢেলে সাজাতে পাক্কা দুই বছর সময় নিয়েছে সরকারি শিক্ষাবিদরা। ইচ্ছে করে এমনসব বিষয়ে নিয়ে আসা হয়েছে যেন উইঘুর-কাযাখ শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের ধর্ম, আদর্শ, পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ঘৃণা করে। আর কোনো প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করে নেয় কমিউনিস্ট, সেকুল্যার জীবনাদর্শ। পূর্ব তুর্কিস্তানের যেসব শিক্ষাবিদ নতুন সিলেবাসের বিরোধিতা করেছে, ধরে ধরে তাদের জেলে পোরা হয়েছে।

বাচ্চাদের রোজ রোজ রাজনৈতিক স্লোগান আওড়াতে হচ্ছে—কমিউনিস্টি পার্টি জিন্দাবাদ, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া নয়া চীনের কথা চিন্তায় করা যায় না ইত্যাদি। ৭ বছরের এক বাচ্চা তার মায়ের কাছে অনুযোগ জানিয়েছিল, 'মা স্কুলে স্লোগান দিতে দিতে আমার গলা ব্যথা হয়ে গেছে'।

বাচ্চাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে বাবা-মা, পরিবার-পরিজনের বিরুদ্ধে। লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে পরিবারের ওপর স্পাইং করার কাজে। স্কুলে চীনা অফিশিয়ালরা জেরা করে বাচ্চাদের—তোমার বাসার কেউ কি কুরআন পড়ে? নামায পড়ে?

জেরার মুখে এক বাচ্চা ক্লাসে জানায় তার দাদু হাজ্জ করতে মক্কা গিয়েছিলেন। পরে সেই বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

স্কুলে বাচ্চাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, দেখো এই যে সরকার তোমাদের বিনা

পয়সায় পড়াচ্ছে, থাকতে দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, এর জন্য দেশকে ভালোবাসতে হবে। মাতৃভূমির ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এবং অবশ্যই এই ৭৫টি কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হবে। এই কাজগুলো হলো ধর্মীয় উগ্রবাদের লক্ষণ। এই ৭৫টি কাজের মধ্যে আছে দাড়ি রাখা, ধর্মীয় কারণে ধূমপান-মদ্যপান ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি।

বাবা-মায়ের চাইতেও শিক্ষকদের বেশি সম্মান করতে শেখানো হচ্ছে বাচ্চাদের। বাবা-মায়ের কথা নয়, মানতে হবে শিক্ষকদের কথা। শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে, 'বাবা-মাকে তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করবে তোমরা। বলবে এসব মধ্যযুগীয় জিনিসপত্র, এসব উগ্রবাদ!'[৬৯]

শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নেয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা। কোনো শিক্ষক সিলেবাস নিয়ে টুঁ শব্দটি করলেই তাকে বিশ্বাসঘাতক, উগ্রবাদী ট্যাগ মেরে দেয়া হচ্ছে। চাকরি চলে যাচ্ছে। জেলে পোরা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ স্কুলের বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখছে, 'যদি কোনো শিক্ষকের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আপনি শোনেন বা কোনো শিক্ষককে দেখেন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন উপাসনা করতে, তাহলে দ্রুত রিপোর্ট করুন আমাদের কাছে।'[৭০]

এতকিছুর পরেও সরকার বলছে এগুলো একদম স্বাভাবিক, গতানুগতিক স্কুল। কিন্তু এই স্বাভাবিক স্কুলগুলোকেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রেখেছে ওরা। স্কুলের গেইটে যাওয়ামাত্রই আর্মড পুলিশের গাড়ি ঘিরে ফেলে সাংবাদিকদের। ছবি তুলতে, ভিডিও করতে বাধা দেয়। সাংবাদিকদের ফোন থেকে জোর করে মুছে ফেলে স্কুলের ছবি।[৭১]

স্কুলে সারাদিন দেশপ্রেম, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন, দেশের ঋণ শোধ করা এসব শুনে শুনে ডালিনুরের ৭ বছরের পিচ্চি মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে, 'মা, দেশকে ভালোবাসার মানে কী?'

ডালিনুর কী জবাব দিয়েছিল তার মেয়েকে আমরা জানি না। তবে আমরা বলে দিচ্ছি দেশকে ভালোবাসার মানে আসলে কী? দেশপ্রেম কী জিনিস? বাবু, দেশকে

---

[৬৯] China is putting Uighur children in 'orphanages' even if their parents are alive. The Independent, Staff & Agencies, September 21st, 2018. https://tinyurl.com/ycrdt2go

[৭০] In China's Crackdown on Muslims, Children Have Not Been Spared. Ami Qin. The New York Times, December 28th, 2019. https://tinyurl.com/v4lujqb

[৭১] China is putting Uighur children in 'orphanages' even if their parents are alive. The Independent, Staff & Agencies, September 21st, 2018. https://tinyurl.com/ycrdt2go

ভালোবাসার মানে হলো তুমি তোমার ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি সব ছুড়ে ফেলে গ্রহণ করে নেবে হান চাইনিযদের ভাষা, ওদের সংস্কৃতি। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করবে না, পরকাল বিশ্বাস করবে না, ইসলামকে ভুলে যাবে। নামায, রোযা, পর্দা, হাজ্জ করার বিষয়ে ভুলেও ভাববে না, কুরআনের ধারেকাছেও যাবে না, দাড়ি রাখার কথা চিন্তা করবে না, এমনকি ইসলামী নামও রাখবে না। তুমি মুশরিক হান চাইনিযদের সাথে মদ খাবে। শূকর, বাদুড়, বানর, আরশোলা, তেলাপোকা খাবে। গলা ফাটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নামে স্লোগান দেবে, প্রেম করবে, যিনা-ব্যভিচার করবে, নিষিদ্ধ আনন্দ, মৌজ মাস্তিতে ডুবিয়ে রাখবে নিজেকে সব সময়—বাবু এর মানেই হলো দেশপ্রেম। এই হলো দেশকে ভালোবাসা। যদি এ রকম না করো তাহলেই তুমি জঙ্গি, তুমি সন্ত্রাসী, তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি একজন 'না-মানুষ'। তোমাকে যখন তখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো যায়, যখন তখন মেরে ফেলা যায়—কোনো কৈফিয়ত দেয়া ছাড়াই।

দেশকে ভালোবাসার মানে আসলে কী, বুঝেছ বাবু?

প্রাচীন সিল্ক রোডের পাশেই ধূলিধূসরিত এক গ্রাম। হোতান শহর থেকে খুব বেশি দূরে না। বৈচিত্র্যহীন সাদাসিধে কনক্রিটের বাড়ি আর আখরোটের বাগান... এরই মাঝে রাতারাতি গজিয়ে উঠল বোর্ডিং স্কুল। উঁচু ইটের প্রাচীরে ঘিরে দেয়া হলো স্কুলের চারপাশ। তার ওপর দেয়া হলো দুই পরতের কাঁটাতারের বেড়ার আস্তরণ। প্রত্যেক কোনায় কোনায় বসানো হলো সিসিটিভি ক্যামেরা আর মেইন গেটে কালো হেলমেট, প্রোটেক্টিভ ভেস্ট পরে মেটাল ডিটেক্টরের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো সশস্ত্র গার্ডকে। টাইট সিকিউরিটি। কয়েকদিনের মধ্যেই ক্লাসরুম নতুন করে প্রস্তুত করা হলো, বাংক বেড নিয়ে আসা হলো আর আনা হলো ক্লাস সিক্স বা তার নিচের ক্লাসে পড়া ২৭০ জন নতুন উইঘুর শিশু।

এ স্কুলেরই চীনা ভাষার শিক্ষক কাং জিদে উইচ্যাটে পোস্ট করল, 'অনেক শিশুদের সাথে কখনোই কেউ দেখা করতে আসে না, ছুটির দিনগুলোতেও তাদের স্কুলেই থাকতে হয়। বাচ্চারা আমার কাছে এসে প্রায়ই অনুনয় বিনয় করে, 'স্যার, প্লিজ আপনার ফোন থেকে আমার মায়ের ফোনে একটা কল দিন।' ফোনের ওই পাশ থেকে বাবা-মায়ের কণ্ঠ শোনামাত্র কেঁদে ফেলে তারা, আড়ালে চলে যায়, এক কোণে লুকিয়ে কথা বলে—ওরা চায় না আমি ওদের কান্না দেখি। বাবা-মায়েরাও নিজেদের ধরে রাখতে পারেন না। তাদেরও হৃদয় ভেঙে গেছে, তারাও কাঁদেন—এই পাশ থেকেও আমি তা টের পাই।'

একদিন কাং জিদ উইচ্যাটে ৮ বছরের এক মেয়ের লেখা ঠিকানাবিহীন চিঠির ছবি পোস্ট করে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী ওর বাবা। পিচ্চি মেয়েটা খাতার এক পৃষ্ঠায় বড় বড় করে লিখেছে,

'বাবা, বাবা, তুমি কোথায়?

কেন তুমি আমাকে দেখতে আসো না?'[৭২]

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সাহস কী কারও আছে? আছে কী কোনো মানুষ, যে হিসেব করবে প্রতিরাতে কতটা কেঁদে ঘুমুতে যায় উইঘুর শিশুরা?

আছে কী কেউ?

---

[৭২] In China's Crackdown on Muslims, Children Have Not Been Spared. Ami Qin. The New York Times, December 28th, 2019. https://tinyurl.com/v4lujqb

রাজকন্যার চোখে জল

এক.

বালিকার মন খারাপ।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

অথচ কাঁদার কোনো কারণ আজ নেই।

আজ তার বিয়ে! চারিদিকে উৎসব। ফুলে ফুলে ভরে গেছে চারপাশ। অপূর্ব সাজে সেজেছে সবাই। নিটোল প্রেমের মিষ্টি একটা গান বেজে যাচ্ছে ঘুরেফিরে সেই কখন থেকে। এরই মাঝে লাল পোশাকের বালিকাকে যখন হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হলো মঞ্চে, হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেল উপস্থিত সবার! স্বর্গের অপ্সরী যেন নেমে এসেছে মাটির এই পৃথিবীতে! দুপাশ থেকে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ল বালিকার চলার পথে। আলোকোজ্জ্বল আলোয় স্থিরচিত্র আর গতিচিত্র ধারণের অস্থির হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

ভোঁতা চেহারার হান চাইনিয বর রাজকন্যার সামনে এসে দাঁড়াল রাজ্য জয়ের অনুভূতি নিয়ে। যে কেউ দেখলেই বলবে ধূসর স্যুট পরা এই ছেলেটা আজকের দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো। চারিদিকে আলোকিত উজ্জ্বলতা। রাজকন্যার গলায় লাল ফুলের মালা পরালো হান যুবক। হাততালিতে মুখরিত হলো হলরুম। মুহুর্মুহু ফ্লাশে ঝলকে উঠল মঞ্চ। নিটোল প্রেমের সেই মিষ্টি গানটা বেজে যাচ্ছে তখনো। রাজকন্যার দুচোখে টলটল করছে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু!

বিয়ের দিন একটা নতুন জীবনের দোরগোড়ায় আনন্দ-বেদনার সম্পূর্ণ বিপরীত দুই অনুভূতি গলাগলি করে একসাথে এসে বসে। কমবেশি প্রায় সব মেয়ের চোখেই বৃষ্টি নামিয়ে ছাড়ে। আমাদের এই বালিকার কান্নার কারণ অবশ্য একটু আলাদা।

জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছে তার। প্রতিবাদ করার কোনো উপায় নেই। কারণ, সে উইঘুর আর তার বর হান চাইনিয! কিছু বললেই নিজে তো বটে বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে চাইনিয সরকার! কোনো কথা হবে না, বিয়ে করতেই হবে।[৭৩]

চীনে মুসলিম উইঘুর নারী এবং হান চাইনিয ছেলেদের মধ্যে বিয়ের হিড়িক পড়ে গেছে। তবে হান পুরুষদের মধ্যে এমন বিশেষ কোনো 'এক্স ফ্যাক্টর' হুট করে আসেনি, যার কারণে উইঘুর নারীরা ওদের বিয়ে করতে পাগল হয়ে গেছে। বরং বিষয়টা উল্টো। যুগে যুগে কালে কালে সৃষ্টিগতভাবেই অত্যন্ত সুন্দরী উইঘুর মেয়েদের জন্য পাগল ছিল নাকবোঁচা হান পুরুষেরা। সেক্স ফ্যান্টাসিতে ভুগেছে এরা উইঘুর রূপবতীদের নিয়ে। সাক্ষী ইতিহাস, সাহিত্য আর সংস্কৃতি। চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিস্ট হানরা, সংখ্যালঘু মুসলিম উইঘুরদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করে না। তাদের ভাষায় উইঘুর পুরুষরা হলো 'জঙ্গি সন্ত্রাসী' আর মেয়েরা হলো 'মডেল'। এতদিন কমিউনিস্ট হওয়া, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি পার্থক্যের কারণে উইঘুর নারীদের বিয়ে করতে পারেনি। কিন্তু এখন সরকার এসব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে এক হ্যাঁচকা টানে। হান পুরুষদের একেবারে কোলে উইঘুর মেয়ে তুলে দিয়ে বলছে, 'নে ব্যাটা, এরে বিয়ে কর।'

আগে অনেক সমস্যা ছিল। মুসলিম নারীরা তো অমুসলিম কোনো পুরুষকে বিয়ে করবে না। উইঘুর নারীরা শূকর খেতো না, অনেকে স্কার্ফ পড়ত, লম্বা পোশাক পড়ত, ইসলাম পালন করত; কিন্তু এখন তো আর এসব সমস্যা নেই। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে 'শিক্ষিত' হবার মাধ্যমে উইঘুর নারীরা এসব 'ফালতু' বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। কাজেই সরকার ডাকছে হান পুরুষদের, 'আসো, এসে এদের বিয়ে করো। দেখো তোমাদের জন্য কত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছি।' বিয়ে করলে জায়গা-জমি-চাকরি একেবারে ফ্রি। রাজ্য আর রাজকন্যা সব একসাথে।

২০১৭ সালে সরকার Uyghur-Han Marriage and Family Incentive Strategy এর আওতায় ঘোষণা করে, কোনো উইঘুর মেয়েকে হান পুরুষ বিয়ে করলে তাদের

[৭৩] (EN and FR) Uyghur adolescent raped and forced to get married by a Chinese official. Talk East Turkestan, October 12th, 2018. https://tinyurl.com/wpds2zo
Uyghur girls are forced to marry Han Chinese. Talk East Turkestan, October 24th, 2019. -https://tinyurl.com/smdss5z
Is this a marriage or political game? بۇ نىكاھمۇ ياكى سىياسىي ئويۇنمۇ ؟- Uyghur Air, December 11th, 2018. https://tinyurl.com/qlptob6

১০ হাজার ইয়ান[৭৪] দেয়া হবে।[৭৫]

হান পুরুষদের উইঘুর মেয়ে খুঁজে দেয়া, মেয়ের পরিবারের সাথে কথা বলা, বিয়ের আয়োজন করা, টাকা-পয়সা খরচ করাসহ প্রায় সবকিছুই করে দিচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। যার বিয়ে তার খবর নাই পাড়াপড়শির ঘুম নাই–আক্ষরিক অর্থেই এই প্রবাদ বাস্তবায়িত হচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তানে। বরকে কোনো কিছু করতে হয় না, সব কাজ সরকারি লোকেরা করে দেবে। তার একমাত্র কাজ বিয়ের দিন সেজেগুজে গিয়ে বিয়ে করা।

চুনোপুঁটি নয়, একেবারে রাঘববোয়াল সরকারি কর্মকর্তারা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেয়। ইয়েকানে[৭৬] যমজ উইঘুর বোনের বিয়েতে কাউন্টি সিভিল এফেয়ার ব্যুরোর লোকজন, পুলিশের বড়কর্তা সবাই মাঞ্জা মেরে এসে দাঁত কেলিয়ে বিয়ে খেয়ে যাচ্ছে।

গানসুর নির্মাণ শ্রমিক এক হান ছোকরা তুলোক্ষেতে কাজ করতে দেখে এক উইঘুর মেয়েকে। অসহায় মেয়েটার সর্বনাশ হয় তখনই। প্রায় ৩০০ ডলার সমমূল্যের উপহার নিয়ে ওদের জোরপূর্ব বিয়েতে উপস্থিত হয় নগরের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লোকজন, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন, ধর্মীয় কমিটি...। পুরো শহর হামলে পড়ল ওদের বিয়েতে আশীর্বাদ দিতে! জিয়াংতাও নগরের কমিউনিস্ট পার্টির সহ-সম্পাদক আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। বিবাহ-পূর্বক সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণ দিল সে। এর মধ্যে 'গোত্রীয় সম্প্রীতি', 'গোত্রীয় সম্প্রীতি' বলে স্লোগান দিল ১০ বার। নবদম্পতির দিকে আঙুল তুলে বলল এরা এই শহরের সবার জন্য আদর্শ![৭৭]

হান উইঘুর দম্পতি থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে তাদের জন্য স্কুল, কলেজ, চাকরি সব ক্ষেত্রেই থাকছে বিশেষ সুবিধা। সমাজে এদের নিয়ে যেন কেউ বিরূপ মন্তব্য না করে তার জন্য আছে কঠোর আইন।

সরকার একেবারে কোমরবেঁধে নেমেছে হান ছেলেদের সাথে উইঘুর মেয়েদের বিয়েকে স্বাভাবিক বানাতে। হান যুবকদের বোঝানো হচ্ছে, বিরল এক জীবন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোমাকে। চাকরি, গাড়ি-বাড়ি, ডাঁসা ডাঁসা সুন্দরী উইঘুর নারী–সব অপেক্ষা

---

[৭৪] ১ ইউয়ান = ১২ টাকার মতো

[৭৫] Xinjiang Authorities Push Uighurs To Marry Han Chinese. Radio Free Asia, August 25th, 2017. https://tinyurl.com/t8d6xwm

[৭৬] পূর্ব তুর্কিস্থানের একটি এলাকা। ইয়ারকান্ট (Yarkant) বা শাচি (Shache) নামেও পরিচিত

[৭৭] Uyghur Love In A Time Of Interethnic Marriage. Darren Byler. SupChina, August 7th, 2019. https://tinyurl.com/wns6tcc

করে আছে তোমার জন্য পশ্চিমে, পূর্ব তুর্কিস্তানে। যাও, লুফে নাও এ সুযোগ। ভুল কোরো না।

বিগবাজেটের ভিডিও বানানো হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে সম্ভাব্য সকল প্লাটফর্মে–

মাথার ওপরে সুবিশাল সুনীল আকাশ। নীল আকাশ এসে ডুব দিয়েছে পাহাড়ের পাশের হ্রদে। আকাশের কিছু নীল মিশে গিয়েছে হ্রদে। ঝকঝকে রোদে ভেসে যাওয়া চরাচরে অপেক্ষারত এক উইঘুর তরুণী। অসম্ভব সুন্দরী সে। দুর্বল হৃদয়ের কোনো পুরুষ একনজর দেখলে হার্ট অ্যাটাক করে বসতে পারে। তরুণী প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে যেন, লেকের পানিতে পা ভেজাচ্ছে, হাসিতে ঢলে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। হান রাজপুত্র এল গাড়িতে চড়ে, উইঘুর তরুণী লজ্জা মেশানো পদক্ষেপে এগিয়ে গেল তার দিকে। হাত ধরে নিয়ে গেল লেকের পাশে। দুজনে একসাথে পা ভেজাবে...।[৭৮]

আরেকটা ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে অনলাইনে। রূপকথার 'অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে চিরকাল বসবাস করিতে থাকিল' টাইপের সুখের গল্প বলে বেড়াচ্ছে এই ভিডিওটা। উইঘুর-হান দম্পতির।[৭৯]

প্রায় তিন কোটি হান পুরুষ পাত্রী পাচ্ছে না চীনের এক সন্তান নীতির কারণে। এদেরকে যত বেশি সম্ভব মগজধোলাইয়ের চেষ্টা করছে সরকার–যেন উইঘুর মেয়ে বিয়ে করে।[৮০]

'হাও টু উইন দ্যা হার্ট অফ উইঘুর গার্লস' নামে বই লেখা হয়েছে এদের জন্য। লেখক হান পুরুষদের নানাবিধ টিপস দিয়েছে কীভাবে আগালে উইঘুর মেয়েদের বিয়ে করতে পারবে। লেখক ইউ লুংগী নিজেকে 'হান ভলান্টিয়ার' হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। লুংগী সাহেব অবিবাহিত ক্ষুধার্ত হান পুরষদের উসকে দিচ্ছে তার বইয়ে, 'উইঘুর মেয়েরা কিন্তু মারাত্মক সুন্দরী'। তবে উইঘুর মেয়ে বিয়ে করার পথ বাতলে দেবার সাথে সাথে সে হান যুবকদের এটা বলেও সাবধান করে দিচ্ছে, 'সাবধান, উইঘুর মেয়ের রূপে মজে গিয়ে ভুলে যেয়ো না, তোমার প্রধান পবিত্র দায়িত্ব ছিল তিন

[৭৮] Video argues beautiful Uyghur women would love to have a Han husband. The Art of Life in Chinese Central Asia, August 4th, 2019. https://tinyurl.com/rw2vyzv

[৭৯] Video promoting marriage between Han men and Uyghur women. Darren Byler, August 4th, 2019. https://tinyurl.com/ralowbh

[৮০] Muslim wives in China 'are forced to sleep in the same bed as male officials while their husbands are being indoctrinated in re-education camps. Daily Mail Online, November 4th, 2019. https://tinyurl.com/umvm3ld

শয়তান–বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মীয় উগ্রবাদ আর সহিংস সন্ত্রাসবাদ–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ!'[৮১]

সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে উইঘুর-হান বিয়ে জাতীয় ঐক্যকে আরও সুসংহত করবে। কিন্তু এই যে এতকিছু, এর মূল লক্ষ্যটা আসলে ইউ লুংগীর এই শেষের কথাগুলো। তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রবাদ আর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! উইঘুর মুসলিম পরিচয় এই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া! চিরদিনের জন্য!

উইঘুর পুরুষদের তো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। যা ডলা দেবার ওখানেই তা দেয়া হবে। কাজেই তাদের নিয়ে এখন আর তেমন চিন্তা নেই। এখন উইঘুর মেয়েদের যদি হান পুরুষদের সাথে বিয়ে দেয়া যায়, তাহলে এক ধাক্কায় বাস্তবায়িত হয়ে যাবে অনেকগুলো উদ্দেশ্য।

উইঘুর মেয়ে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। শূকরের মাংস খাওয়া, মদ খাওয়া, স্কার্ফ না পরা ইত্যাদিতে সে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তার হান স্বামী, স্বামীর পরিবার তাকে ইসলাম ও উইঘুর সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখবে। বদলে যাবে ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনা। সে ধীরে ধীরে ভুলে যাবে কী ছিল তার ধর্ম, কী ছিল তার পরিচয়, কী ছিল তার ভাষা। স্বামীর হান পরিচয়ে একেবারে নিজেকে বিলীন করে দেবে সে। হারিয়ে যাবে তার উইঘুর মুসলিম পরিচয়।

হান পুরুষদের সাথে বিয়ে না হলে তার সন্তানের মধ্যে উইঘুর মুসলিম সত্তা ঠিকই টিকে থাকত। দুনিয়াতে আরেকজন 'সন্ত্রাসী' জন্ম নিত। একদিন হয়তো চীনের সকল অপরাধের হিসেব কষতে বসতো সেই 'সন্ত্রাসীরা'! কিন্তু এখন আর সেই সম্ভাবনাটুকুও নেই।

দুনিয়ার বুক থেকে নীরবে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার কী মারাত্মক মাস্টারপ্ল্যান!

উইঘুরদের 'শিক্ষা' দেবার জন্য চীন সরকারকে পথ বাতলে দিয়েছিল তিনজন অ্যাকাডেমিক। পিকিং ইউনিভারসিটির প্রফেসর মা রং, ড. হু লিয়ানহি এবং চিংহুয়া ইউনিভার্সিটির হু আংগাং। সরকারকে বুদ্ধি দেয়া হয়েছিল, উইঘুর মেয়েদের সাথে হান পুরুষদের বিয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যারা বিয়ের বিরোধিতা করবে তাদের আনতে হবে কঠোর শাস্তির আওতায়। বিয়ের ফলে যেসব বাচ্চা জন্ম নেবে বিশেষ যত্ন নিতে হবে তাদের। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে উইঘুর মেয়েরা হান পুরুষদের সাথে বেশি বেশি মেলামেশার সুযোগ পায়।

---

[৮১] Uyghur Love In A Time Of Interethnic Marriage. Darren Byler. SupChina, August 7th, 2019. https://tinyurl.com/wns6tcc

দেখা যাচ্ছে শি জিনপিং এর কমিউনিস্ট সরকার অনুগত ছাত্রের মতো অক্ষরে অক্ষরে তাদের কথা মেনে চলছে।

চীন সরকার জোর গলায় দাবি করছে, গোত্রদের মধ্যে ঐক্য সুসংহত করার জন্যই উইঘুর-হান বিয়েকে প্রমোট করা হচ্ছে; কিন্তু উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট রুশান আব্বাসের মতে এটা নিয়মতান্ত্রিক ধর্ষণ ছাড়া আর কিছুই না। সংখ্যালঘু উইঘুর-কাযাখদের ওপর চীন সরকার যে বর্বর নির্যাতন চালাচ্ছে তার শক্তিশালী এক হাতিয়ার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই নিয়মতান্ত্রিক ধর্ষণ।

'গণধর্ষণ ছাড়া আপনি এটাকে আর কী বলবেন?' রুশান আব্বাস সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেন এক সাক্ষাৎকারে। 'সরকার হান পুরুষদের সামনে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, চাকরির মুলো ঝুলিয়ে বলছে যাও পূর্ব তুর্কিস্তানে গিয়ে উইঘুর মেয়েদের বিয়ে করো। উইঘুর মেয়ে বা মেয়ের পরিবার কেউই নাস্তিক হান চাইনিযদের সাথে বিয়েতে আপত্তি করতে পারছে না। মৃদু আপত্তি করলেও সরকার উগ্রবাদী, জঙ্গির ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে। তারপর ছুড়ে দিচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে!

কয়েক বছর ধরে বিয়ের নামে হান চাইনিযরা উইঘুর মেয়েদের রেইপ করে যাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, এতদিন পর মিডিয়াতে এ নিয়ে আলোচনা কেবল শুরু হয়েছে!'[৮২]

কতটা আতঙ্ক নিয়ে কাটে উইঘুরদের জীবন চিন্তা করুন একবার পাঠক। এই বুঝি আমার মেয়ে, আমার বোনের ওপর সরকার বা কোনো হান পুরুষের নজর পড়ল! এই বুঝি ওকে জোর করে বিয়ে করে নিয়ে গেল কোনো নাস্তিক কমিউনিস্ট, কোনো হান! এই অসহায় বাবা-ভাইদের জায়গায় একবার নিজেকে কল্পনা করুন। আপনার আদরের ছোট বোন–যাকে আপনি পিঠে নিয়ে কত ঘুরেছেন–তাকে কোনো নাস্তিক পুরুষ জোর করে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি কিছু বলতে পারছেন না। আপনাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে হাসিখুশি থাকতে হচ্ছে, তাদের সাথে তাল মিলিয়ে গাইতে হচ্ছে, নাচতে হচ্ছে। শূকরের মাংস খেতে হচ্ছে, মদের গ্লাসে চুমুক দিতে হচ্ছে। আপনি জানেন, আপনার বোনকে হান জানোয়ারের বাচ্চাটা ছিঁড়ে-ছিবড়ে খেয়ে ফেলবে...। অসীম এই অসহায়ত্ব, চেপে রাখা ক্রোধ–এর চেয়ে কষ্টের কি কিছু আছে একজন ভাইয়ের কাছে? একজন পুরুষের কাছে?

---

[৮২] 'This is mass rape': China slammed over program that 'appoints' men to sleep with Uighur women. Gavin Fernando. NZ Herald, December 21st, 2019. - https://tinyurl.com/yychxnut

ইউরোপে পড়তে আসা উইঘুর যুবক নুরযাতের কথা ছিল কয়েক মাস পরেই ঘরে ফিরে বিয়ে করবে আদিলাকে। আদিলা জানিয়েছিল বিয়ের পোশাক কিনে সেও অপেক্ষা করবে নুরযাতের জন্য। (যদিও) আদিলা জানত এটা আর কখনোই সম্ভব না। নুরযাতের মনে কী চলছিল আমরা নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারি না। হয়তো আদিলার মতো নুরযাতও জানত খুব তাড়াতাড়ি আদিলাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে কোনো হান চাইনিয কুত্তা। প্রতিরাতে নির্মমভাবে খুন হবে আদিলা। রক্ত ঝরবে অশ্রু হয়ে।

সাক্ষাৎকার দেবার সময় আদিলাকে জিজ্ঞাসা করা হলো উইঘুরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আদিলা কিছু বলল না। ছোট্ট একটা চিরকুট হাতে তুলে নিয়ে ক্যামেরার দিকে ধরল সে। চিরকুটে লেখা, 'আমরা আর কখনোই ফিরতে পারব না জীবনে'। দুই সেকেন্ড ক্যামেরাতে চিরকুট স্থির রেখে দলা পাকিয়ে নিয়ে মুখে পুরল সে। ধীরে ধীরে চিবুল সেটা একদৃষ্টিতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। তারপর গিলে ফেলল। টপটপ কয়েক ফোঁটা নোনা জল ঝরে পড়ল তার কাজল কালো চোখ থেকে।[৮৩]

পৃথিবীতে এত কোটি মুসলিম; কিন্তু আদিলাদের চোখের জল মুছে দেবার কেউ নেই আজ।

আফসোস!

দুই.

উইঘুরদের বাসা পুরুষশূন্য। একদম ফাঁকা বাসায় অরক্ষিত পড়ে আছে সুন্দরী উইঘুর নারীরা। কোনো অভিভাবক নেই। কাজেই এই সুযোগটা লুফে নিল হান চাইনিযরা। অভিনব এক ফন্দি আঁটল। উইঘুরদের ঘরের মধ্যে লোক ঢুকিয়ে দিলো 'আত্মীয় পরিচয়ে, সম্প্রীতি বৃদ্ধির নামে'। এক ঢিলে মারা পড়ল কয়েকটা পাখি!

২০১৭ সাল থেকে চীন সরকার পূর্ব তুর্কিস্তানে চালু করেছে "Pair Up and Become Family" প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের আওতায় চীন সরকার প্রায় ১০ লাখেরও বেশি হান চীনাদের ঢুকিয়েছে উইঘুরদের অন্দরমহলে। উইঘুর পরিবারগুলোকে বলা হচ্ছে, এরা তোমাদের আত্মীয়। এদের গ্রহণ করে নাও। তো এই আত্মীয়দের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এদের প্রায় সবাই পুরুষ, কমিউনিস্ট নাস্তিক বা সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী। এদের প্রধান প্রধান কাজ হলো, দিনে উইঘুরদের মগজধোলাই করা আর

[৮৩] Uyghur Love In A Time Of Interethnic Marriage. Darren Byler. SupChina, August 7th, 2019. https://tinyurl.com/wns6tcc

রাতে উইঘুর মেয়েদের ধর্ষণ করা![৮৪]

প্রশাসন থেকে আদেশ আসে–উইঘুরদের অন্দরমহলে ঢুকে তোমরা ওদের চাইনিয শেখাবে, কমিউনিস্ট ধ্যানধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দেবে; আর রাতে একসাথে, একই বিছানায়, একই কম্বলের নিচে ঘুমাবে। মেয়ে হলেও সমস্যা নেই। এভাবে এক বিছানায় একসঙ্গে ঘুমুলে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হবে। ভাষাগত যে দূরত্ব ছিল সেটা দূর হবে। সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকবে না, ইসলামের ভূত ঘাড় থেকে নেমে যাবে, সব ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে মহান চীনের নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে সবাই! মারামারি, হানাহানি, হাঙ্গামা থাকবে না–সবাই মিলেমিশে সুখে-শান্তিতে থাকবে!

রেডিও ফ্রি এশিয়ার সাংবাদিকেদের চীন সরকারের কর্মকর্তারা জানাচ্ছে, ঘটনা যা রটেছে তা সত্য। উইঘুরদের ঘরে আত্মীয় লেবেল দিয়ে হান চাইনিযদের প্রবেশ করানো হয়েছে। নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ তো আছেই, দুমাস অন্তর অন্তর এরা উইঘুরদের বাসায় গিয়ে ৬/৭ দিন করে থেকেও আসে। জীবন নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ করে। এভাবে একে অপরের প্রতি 'ফিলিংস' জন্ম নেয়। আর হ্যাঁ, হান চীনারা একই বিছানায় উইঘুরদের সঙ্গে ঘুমায়। ছেলে-মেয়ে একসাথেই।

সাধারণত এক বিছানায় এক বা দুজন ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু যদি শীত পড়ে বা আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, তাহলে তিনজন একসাথে ঘুমায়। আর যদি এমন কোনো বড় বিছানা থাকে যেখানে পরিবারের সবাই একসঙ্গে ঘুমুতে পারবে, তাহলে সেখানেই সবাই একসাথে ঘুমায়। হান আত্মীয়দের সাথে এক বিছানায় ঘুমানোতে উইঘুর নারীরা তেমন কিছু মনে করে না। এটা এখন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটা ভাববেন না যে, হান চাইনিযরা এর সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। তারা সব সময় উইঘুর নারীদের থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখে। হান অফিশিয়ালরা উইঘুর নারীদের সাথে বাজে ব্যবহার করেছে এমন কোনো অভিযোগ এখন পর্যন্ত কেউ করেনি। বরং উইঘুররা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে কবে তাদের হান আত্মীয় তাদের বাসায় এসে থাকবে![৮৫]

উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট রুশান আব্বাস জোর দিয়ে বলেন,

---

[৮৪] Muslim women 'forced to share beds' with male Chinese officials after husbands detained in internment camps. Chris Baynes. The Independent, November 5th, 2019. https://tinyurl.com/y57vmmdh

[৮৫] China is reportedly sending men to sleep in the same beds as Uighur Muslim women while their husbands are in prison camps. Alexandra Ma. Business Insider, Nov 4th, 2019. https://tinyurl.com/rxpjt37

‘চাইনিয অফিশিয়ালদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যে। একচুল সত্য নেই। দেখুন, অসংখ্য নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ছেন–জোরপূর্বক গর্ভপাত বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ! এসব কী এটাই ইঙ্গিত করে না যে, উইঘুর নারীদের রাষ্ট্র গণধর্ষণ করছে?’[৮৬]

মানবাধিকার সংস্থা Human Rights Watch বলছে,

‘উইঘুরদের ঘরে এভাবে হান পুরুষ ঢুকিয়ে দিয়ে চীন সরকার মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। চীন সরকারের এই পদক্ষেপ এই অঞ্চলে সহিংসতা আর অস্থিরতার আগুনই বরং জ্বালিয়ে দেবে।’

পিটার ইরউইন World Uyghur Congress Exile নামের গ্রুপের মুখপাত্র। ভদ্রলোক বলছেন, উইঘুর ঘরগুলোতে এভাবে জোর করে হান পুরুষদের ঢুকিয়ে সরকার উইঘুরদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবন একসাথে মিশিয়ে দিয়েছে। উইঘুরদের ‘ব্যক্তিগত জীবন’ একান্ত আপন মুহূর্ত বলে আর কিছু নেই। উইঘুর পরিচয় ধ্বংস করার সকল আয়োজন করেছে চীন সরকার।

নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃক নজরদারি এক বিষয় আর নজরদারির নামে নাগরিকদের বিছানায়–বিশেষ করে নারী নাগরিকদের বিছানায় অন্য পরপুরুষ–তুলে দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এমন কাজ কেবল বিকৃতরুচির লোকদের দ্বারাই করা সম্ভব। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন কাজ করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারবে না। কিন্তু চীনে এসব কিছু হয়ে চলছে গত দু-তিন বছর ধরে।’[৮৭]

আচ্ছা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কি বিশ্বাস হয়, হান জানোয়ারগুলো এক বিছানায় ঘুমাবে কিন্তু কিছু করবে না? খালি বাড়িতে একই বিছানায়, একই কম্বলের নিচে উইঘুর নারীদের সাথে ঘুমুবে ব্রহ্মচারী হয়ে?

বিশ্বাস হয়?

আসুন এক হতভাগ্য ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা যাক উইঘুরদের ঘরের ভেতরের কথা। অশ্রু সংবরণের অনেক চেষ্টা করেছেন এই উইঘুর ভাই। কিন্তু পারেননি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি জানিয়েছেন,

---

[৮৬] ‘‘This is mass rape’: China slammed over program that ‘appoints’ men to sleep with Uighur women. Gavin Fernando. NZ Herald, December 21st, 2019. - https://tinyurl.com/yychxnut

[৮৭] Muslim women ‘forced to share beds’ with male Chinese officials after husbands detained in internment camps. Chris Baynes. The Independent, November 5th, 2019. https://tinyurl.com/y57vmmdh

'অনেক অনেক উইঘুর নারীরা ৫/৬ তলা উঁচু বিল্ডিং থেকে নিচে লাফ দেন। তাঁদের হান আত্মীয়দের হাতে ধর্ষিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই আত্মহননের পথ বেছে নেন তাঁরা। তাঁরা চান আল্লাহর সঙ্গে পবিত্র শরীর নিয়ে দেখা করতে। এইসব উইঘুর নারীদের মধ্যে একজন ছিল আমার... যাক বাদ দিই সেই কথা...!'[৮৮]

World Uyghur Congress Exile গ্রুপের প্রেসিডেন্ট দলকান ইসা বলেছিলেন Pair Up and Become Family প্রোগ্রামের মাধ্যমে চীন সরকার উইঘুর ঘরগুলোকে কারাগারে পরিণত করেছে। এমন এক কারাগার, যে কারাগার থেকে কোনো উইঘুরের মুক্তি নেই।[৮৯]

দলকান ইসা ঠিকই বলেছেন। ১৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের পূর্ব তুর্কিস্তান আজ পুরোটাই এক কারাগার!

এক গোরস্থান!

হায় উম্মাহ! হায় আমাদের নেতারা! কবে থেকে আমরা এত কাপুরুষ হয়ে গেলাম। কবে থেকে উম্মাহ নারীদের প্রতি তার গায়রত হারিয়ে ফেলল। মুসলিম নারীদের ইজ্জত যদি আমরা রক্ষা করতে নাই পারি, তাহলে বেঁচে থেকে কী লাভ আমাদের?

আমরা কি ভুলে গিয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের ইতিহাস? আমরা কি সেই মুহাম্মাদ বিন কাসিমের উত্তরসূরি না, যিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে আরব সাগরের ওপাশ থেকে ছুটে এসেছিলেন হিন্দু রাজা দাহিরের হাতে তার এক মুসলিম বোন অত্যাচারিত হবার খবর শুনে? আমরা কি সেই মু'তাসিমের উত্তরসূরি না, যিনি একজন মুসলিম মহিলার ইজ্জত রক্ষার জন্য নিজে বিশাল বাহিনী নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে নেমেছিলেন? আমরা কি ভুলে গিয়েছি মু'তাসিমের বীরত্ব? বাইযেন্টাইন ভূমিতে রোমানদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন আমাদের এক বোন। বোন চিৎকার করে উঠলেন, 'মু'তাসিম আপনি কোথায়?'

রোমানরা বিদ্রুপ করে তাকে বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মু'তাসিম হাজার হাজার মাইল দূর থেকে তোর চিৎকার শুনে তার সাদা-কালো ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসে তোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে?

---

[৮৮] ফেইসবুক পেইজ Cage এ ১ জুন ২০১৯ সালে প্রকাশিত ভিডিও They burned the Quran- https://tinyurl.com/y4dlj4b8

[৮৯] Male Chinese 'Relatives' Assigned to Uyghur Homes Co-sleep With Female 'Hosts'. Radio Free Asia, October 31st, 2019. https://tinyurl.com/y2qgasmd

হা হা হা...।'

খবর খলিফাহ মু'তাসিমের কাছে পৌঁছে গেল। তিনি একজন মুসলিম মহিলার ইজ্জত রক্ষার জন্য হাজার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। মুসলিম সৈন্যদের বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই সাদা-কালো ঘোড়ায় চড়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।'

হে মুসলিম উম্মাহ, কী হয়ে গেল তোমাদের? এতটা ভীরু এতটা দুর্বল কীভাবে হয়ে গেলে তোমরা? তোমাদের নারীরা শুধু মুসলিম হবার অপরাধে আজ চীনা কুকুরদের হাতে ধর্ষিত হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। তোমার উইঘুর বোনদের ঘরে চাইনিয কমিউনিস্টরা হান মুশরিকদের ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একই বিছানায় শুতে বাধ্য করছে। তোমার বোনদেরকে কুকুরগুলো জোর করে বিয়ে করছে, ধর্ষণ করছে প্রতিরাতে... আর তুমি এখনো ঘরে চুড়ি পড়ে বসে আছো? তোমার রক্ত এখনো গরম হয় না? তোমার মাথায় এখনো আগুন ধরে না? এতটা কাপুরুষ তুমি কীভাবে হলে? মুসলিম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা লাগে না?

তোমার বোন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ফরিয়াদ করছে, 'আমার ওপর আর অত্যাচার কোরো না; আমাকে মেরে ফেলো বরং'। এ কথা জানার পরেও তুমি স্থির হয়ে আছো?

এই উম্মাহর মাঝে আর কি কোনো 'পুরুষ' অবশিষ্ট নেই?

আফসোস!

বহুদিন আগে কবি আল মাহমুদ যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে কবে? আর কতকাল আমরা অপেক্ষা করব সেই বালকের জন্য?

'মায়ের ছড়াগানে কৌতূহলী কানপাতে বালিশে
নিজের দিলের শব্দ বালিশের সিনার ভিতর।
সে ভাবে সে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়দৌড়। বলে, কে মা বখতিয়ার?
আমি বখতিয়ারের ঘোড়া দেখবো।
মা পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসেন,
আল্লার সেপাই তিনি, দুঃখীদের রাজা।
যেখানে আজান দিতে ভয় পান মোমেনেরা,
আর মানুষ করে মানুষের পূজা,
সেখানেই আসেন তিনি। খিলজীদের শাদা ঘোড়ার সোয়ারি।

দ্যাখো দ্যাখো যালিম পালায় খিড়কি দিয়ে
দ্যাখো, দ্যাখো।
মায়ের কেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক
তুলোর ভেতর অশ্বখুরের শব্দে স্বপ্ন তার
নিশেন ওড়ায়।
কোথায় সে বালক?'

অন্ধ আক্রোশ
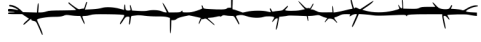
মেত্তুরসান কাসিমের ঘর মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো পুলিশ!

২৭ বছরের কৃষক কাসিম। তাঁর স্ত্রী, কুরআন শিক্ষক ২৫ বছর বয়স্ক ইলি ওয়েলিসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হলো উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ। 'ইসলাম শেখানো হয় এমন স্কুলে বাচ্চাদের পাঠানো' অথবা নিজেরাই যোগদান করার অভিযোগও উঠল চার্জশিটে। ক্বশতেরেক গ্রামের পুলিশপ্রধান সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে রেডিও ফ্রি এশিয়াকে বলল, 'কাসিমের ঘরে ছাত্ররা শুধু কুরআন মুখস্থ করত এবং নামায পড়ার কিছু বেসিক নিয়মকানুন শিখত। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার আগেই পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছে তারা। আমরা ঠিক নিশ্চিত না, ওদের উদ্দেশ্য কী ছিল। কিন্তু এমন এক পরিস্থিতিতে এই কুরআন শিক্ষার আসর বসেছে যা দেখে মনে হয় এদের বদ মতলব আছে। কমপক্ষে এটা বলা যায় যে, ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের ব্যাপারে সরকারের যে নিয়মকানুন তা মানার ইচ্ছে এদের নেই। এ কারণেই প্রশাসন কুরআন শিক্ষার আসর বসানোয় এত কঠোর শাস্তি দিয়েছে।'

অথচ কাসিম বা ওয়েলির প্রতিবেশীরা বলছেন অন্য কথা। নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কাসিমের গ্রামের একজন জানাচ্ছেন, 'দেখুন, আমার বিশ্বাস হয় না কুরআনের শিক্ষক বা কোনো ছাত্রের অভিভাবক রাজনৈতিক কোনো এজেন্ডা নিয়ে কুরআনের দারস চালু করেছে। কাসিম বা ওয়েলিকে আমরা ছোটবেলা থেকেই চিনি। একদম ছা-পোষা লোক ওরা। আর ওয়েলি আগ বাড়িয়ে কুরআনের দারস শুরু করেনি। ওকে ছাত্ররা কুরআন পড়ানোর অনুরোধ জানায় প্রথমে। ওদের 'না' করতে

পেরে ওয়েলি কুরআন শেখানো শুরু করে।'[৯০]

কী পাঠক, পরিচিত পরিচিত ঠেকছে না পুরো ঘটনাপ্রবাহ? প্রশাসনের হাতে কোনো প্রমাণ নেই কাসিমের ঘরে উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদের চর্চা করা হচ্ছে। বরং প্রশাসনের লোকেরা নিজেরাই বলছে যে, কাসিমের ঘরে শুধু কুরআন মুখস্থ করা হতো, নামায শিক্ষা দেওয়া হতো। একেবারেই নির্দোষ, নিরীহ জ্ঞানচর্চা। কিন্তু তারপরেও প্রশাসনের খড়্গ নেমে এল ওদের ওপরে। 'এখনো করেনি কিন্তু ভবিষ্যতে কিছু করতে পারে', এই চিন্তা করেই কাসিমদের বানিয়ে দেয়া হলো 'না-মানুষ'। যাদের মানবাধিকার বলে কিছু নেই, ইচ্ছে হলেই যাদের সাজানো সংসার বুলডোজার দিয়ে পিষে ফেলা যায়। মনে চাইলেই কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে যাদেরকে ছুড়ে ফেলা যায় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

দেশ বা মহাদেশভেদে মাস্তানির স্ক্রিপ্ট আসলে বদলায় না। হান চাইনিযদের মতো অনেক দেশের অনেক পশুরাই শুধু দাড়ি-টুপি থাকার কারণে, টাখনুর ওপরে প্যান্ট রাখার 'অপরাধে', ঘরে হিসনুল মুসলিমিন বা হায়াতুস সাহাবার মতো দু'আর বই বা সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জীবনী রাখার 'মহাপাপে' ভদ্র, চোখ নামিয়ে চলা তরুণ, সৎ যুবক বা মধ্যবয়স্ক ফ্যামিলিম্যানদের 'না-মানুষ' বানিয়ে ফেলে। কিছুই করেনি কিন্তু 'হলেও হতে পারে' সন্ত্রাসী বা উগ্রবাদী লেবেল লাগিয়ে হালাল করে ফেলা হয় অসহায় মানুষগুলোর জান-মাল-রক্ত-সম্মান। মানবাধিকার কর্মীরা চোখ ঘুরিয়ে নেয়, মিডিয়া সুবোধ বালকের মতো প্রিন্ট আউট করা মিথ্যে অভিযোগ অক্ষরে অক্ষরে আওড়ে যায়, সুশীলরা হাততালি দিয়ে উল্লাস করে। মানুষের মানবাধিকার নিয়ে মাথা ঘামানো যায়, কিন্তু 'না-মানুষের' আবার কিসের মানবাধিকার? বেঁচে থাকার অধিকার?

পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে অসংখ্য কুরআন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে অজস্র মাদ্রাসা। সেই সাথে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে অগণিত মসজিদ। মসজিদগুলোকে মদের বারে পরিণত করা হয়েছে। বানানো হয়েছে মুরগির খামার।[৯১]

---

[৯০] UYGHUR Chinese Authorities Demolish Home of Uyghur Supporting Quranic Studies. Radio Free Asia, April 1st, 2015

[৯১] DOAM - Documenting Oppression Against Muslims ফেইসবুক পেইজে ১৩ মে ২০২০ সালে প্রকাশিত ভিডিও, #China converts a mosque in Gulja city of East Turkestan into a bar! #Uyghurs- https://tinyurl.com/y6fxykx6

DOAM - Documenting Oppression Against Muslims ফেইসবুক পেইজে ১৯ মার্চ ২০২০ সালে প্রকাশিত ভিডিও, Mosque in #EastTurkestan (#Xinjiang) is now used to raise chickens and farm eggs. #Uyghurs #China #Islam- https://tinyurl.com/y3d79zbj

ইসলামের কোনো চিহ্নই সহ্য করতে পারে না চাইনিযরা।

আরও অনেক কিছুর মতো মসজিদ ধ্বংস করার অভ্যাসেও চীনের বহু পুরোনো। কালচারারল রিভোলিউশন বা কথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের[৯২] সময় চীনের হাতে ধ্বংস হয় অসংখ্য মসজিদ। পুনরুন্নয়ন কর্মপ্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে আবার মসজিদ ধ্বংস শুরু হয়। ২০১৬ সালে এসে মসজিদ ধ্বংসের পালে লাগে জোর হাওয়া।

ঠিক কতগুলো মসজিদ ভাঙা হয়েছে তার সঠিক হিসেব নেই কারও কাছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ মুখ ফসকেও এ ব্যাপারে কিছু বলছে না। তবে রেডিও ফ্রি এশিয়া জানাচ্ছে কাশগড়, হোতান এবং আকসুর ৭০ শতাংশ মসজিদ ভাঙা হয়েছে। প্রকল্প শুরু হবার তিন মাসের মাথায় চীন সরকার ভেঙেছে ৫,০০০ মসজিদ।[৯৩]

অঙ্কের সূত্র মেনে পুলিশি পাহারায় মসজিদ ধ্বংস করছে চীনারা। একটা বাদে এলাকার সবগুলো মসজিদ ভেঙে ফেলেছে। যেগুলো ভাঙেনি সেগুলোর আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছে। মসজিদের গম্বুজ, মিনার মোটকথা পুরো আকৃতি নিয়েই ব্যাপক অ্যালার্জি হান চাইনিযদের। মসজিদের গেইট বা দেয়াল থেকে আরবিতে লেখা কালেমা সরিয়েছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে চাইনিয বর্ণ। মিনার বা গম্বুজের চাঁদ-তারা হাওয়া করে দিয়েছে সরকার। ভেঙে দেয়া হয়েছে ইসলামী স্থাপত্যকলা অনুসরণ করে বানানো মিনারের মাথা–পুরো মসজিদকেই রূপান্তরিত করা হয়েছে চীনা স্টাইলের বিল্ডিঙে।[৯৪]

ব্যাপকমাত্রায় নজরদারি করা হচ্ছে মসজিদের ভেতরে এবং বাইরে। ব্যাঙের ছাতার মতো সিসি ক্যামেরা গজিয়ে উঠেছে মসজিদের কোনায় কোনায়। দাঁড়ি-কমাসহ রেকর্ড করা হচ্ছে খুতবাহ। সরকারি স্ক্রিপ্টের বাইরে কিছু বললেই সোজা চালান করে দেয়া হচ্ছে ক্যাম্পে। মসজিদের মধ্যে টানানো হয়েছে কমিউনিস্ট নেতাদের ছবি।

---

[৯২] ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত চীনে চলা কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাম্পেইন। এর লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদ এবং চীনা ঐতিহ্য/সংস্কৃতি থেকে আসা যেসব উপাদান চীনা কমিউনিযমের মধ্যে ঢুকেছে সেগুলো থেকে কমিউনিযমকে পরিশুদ্ধ করা। সেই সাথে মাও যেদং এর মতবাদ আবার চীনে ফিরিয়ে আনা এবং কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শকে শক্তিশালী করা।

[৯৩] Under the Guise of Public Safety, China Demolishes Thousands of Mosques. Radio Free Asia, December 19th, 2016. https://tinyurl.com/ut2yqnv

[৯৪] Mafengwo.c, https://tinyurl.com/rmcygb5

Qunar.com, https://tinyurl.com/y49xeoaj

Qunar.com, https://tinyurl.com/y6m73do5

নামায পড়ার অনুমতি পাবার জন্য প্রত্যেক মুসল্লীকেই করতে হয়েছে রেজিস্ট্রেশন।[৯৫] মসজিদের ইমামদের ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে, খুতবাহতে অবশ্যই প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর প্রশংসা করতে হবে। আর ধর্মীয় বিষয়ের ওপর কোনো মন্তব্য করা যাবে না।[৯৬]

ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ৮০০ বছরের পুরোনো 'কেরিয়া ইদখা' মসজিদ। পূর্ব তুর্কিস্তানের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। উইঘুরদের কত ইতিহাস, কত পালা বদলের সাক্ষী!

ধুলোতে পরিণত করা হয়েছে কারগিলিকের গ্র্যান্ড মসজিদকে। ৪৬৬ বছরের পুরোনো এই মসজিদ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের[৯৭] ঝড়-ঝাপটা সামলে টিকে ছিল; কিন্তু শি জিনপিং সরকারের হাতে ঠিকই তার পতন ঘটল। সরকার একসময় সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থানের স্বীকৃতি দিয়েছিল গ্র্যান্ড মসজিদকে। কিন্তু ওরাই ইতিহাসের এক সরব সাক্ষীকে

---

[৯৫] ইসলাম নিয়ে চীনাদের অ্যালার্জি নতুন না। শুধু চীনেও সীমাবদ্ধ না।
'নামাজ পড়তে দেওয়া হয় না পদ্মা সেতুর নির্মাণশ্রমিকদের। নামাযের কথা বললেই চাকরি চলে যায়', মুন্সীগঞ্জ টাইমস- https://tinyurl.com/t24s3vt
প্রিয় পাঠক, এই ভিডিওটি দেখুন। ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশে এসে চাইনিযরা আমাদের শ্রমিক ভাইদের নামায পড়তে দিচ্ছে না, পশুর মতো ব্যবহার করছে, গালিগালাজ করছে, বেতন ঠিকমতো দিচ্ছে না, এমনকি মহান আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করছে। একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সাথে, তাদের নিজেদের দেশেই চাইনিযরা যদি এমন ব্যবহার করে, তাহলে চিন্তা করুন একবার, উইঘুরদের সাথে ওরা কী করছে!

[৯৬] In China's far west the 'perfect police state' is emerging. Tom Phillips. The Guardian, 2rd June, 2017. https://tinyurl.com/y7cvp6mo
A Crackdown on Islam Is Spreading Across China, Steven Lee Myers. The New York Times, September 21st, 2019. https://tinyurl.com/y4kzb8x8
China's vanishing mosques - BBC News, June 19th, 2019. https://tinyurl.com/wuy9hwt
Police are reportedly cutting too-long dresses off ethnic minority women in the middle of streets in China. Tara Francis Chan. Business Insider, Juley 17th, 2018. https://tinyurl.com/rvcmnvc

[৯৭] ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত চীনে চলা কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাম্পেইন। এর লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদ এবং চীনা ঐতিহ্য/সংস্কৃতি থেকে আসা যেসব উপাদান চীনা কমিউনিযমের মধ্যে ঢুকেছে সেগুলো থেকে কমিউনিযমকে পরিশুদ্ধ করা। সেই সাথে মাও যেদং এর মতবাদ আবার চীনে ফিরিয়ে আনা এবং কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শকে শক্তিশালী করা।
The Cultural Revolution: all you need to know about China's political convulsion. Tom Phillips. The Guardian Briefing, May 11th, 2016. https://tinyurl.com/hk3jugz
Cultural Revolution, Encyclopedia Britannica. https://tinyurl.com/k76w38j

থামিয়ে দিলো চিরতরে।[৯৮]

ব্যাপক ধরপাকড় চালানো হয়েছে আলিম, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনদের ওপর। সাধারণ জনগণকে আলিম-উলামা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইছে চীন। মোট বন্দীর ১৩ শতাংশই হলো আলিম, খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন। ছাড় দেয়া হয়নি মসজিদের গার্ড, ক্লিনারদেরও।[৯৯] বেছে বেছে লম্বা সাজা দেয়া হয়েছে আলিমদের। যাবজ্জীবন, ১৫ বছর, ২০ বছর, কাউকে কাউকে আরও বেশি। কারাগারে তাদের হাতেপায়ে শেকল পরিয়ে রাখা হয় সব সময়।[১০০] এমনকি ক্যাম্পে পাঠানোর বহু পূর্বেই সম্মানিত ইমামদের দিয়ে পাবলিক নৃত্যানুষ্ঠান করিয়েছে চীনা কমিউনিস্টরা। এর মাধ্যমে নাকি ধর্মীয় উগ্রবাদ দূর হবে![১০১]

২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পূর্ব তুর্কিস্তানে প্রায় ২৮ হাজার ইমাম, আলিম, দাঈ, তালিবুল ইলম বন্দী বা নিখোঁজ অথবা নিহত হয়েছেন হান চাইনিযদের হাতে।[১০২]

কারগিলিক গ্র্যান্ড মসজিদের ইমাম আবলাত কারিম হাজিম মারা গেছেন কারাগারে। ২০১৭ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মসজিদ ধ্বংস করার ঠিক এক বছর আগে। আবলাত কারিম হাজিম একসময় সরকারের খুব 'পেয়ারা' লোক ছিলেন। পড়াশোনা করেছিলেন কাশগড়ের সরকারি মাদ্রাসা থেকে। মসজিদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন সরকারি আদেশবলেই। সরকারের সাথে বেশি মাখামাখি আর তার চিন্তাচেতনায় কমিউনিস্ট দর্শনের প্রভাবের কারণে অনেক উইঘুর মুসলিমই তাকে অপছন্দ করত। কিন্তু পার্টির সাথে এত 'কানেকশন' থাকার পরও, রেড অ্যাক্টিভিসম

---

[৯৮] অনেকগুলো মসজিদ ধ্বংসের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে এখানে। আগ্রহী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন: Demolishing Faith: The Destruction and Desecration of Uyghur Mosques and Shrines. Bahram K. Sintash, Uyghur Human Rights Project, October, 2019. https://tinyurl.com/sszs4kw

[৯৯] Bunin, Gene, July 2018 "Interview with Amanzhan Seiituly: Conducted in Russian by Gene A. Bunin and Chris Rickleton for Agence France Presse (Almaty, Kazakhstan in July 2018)" Xinjiang Victims Database. https://tinyurl.com/y66mgc7b

[১০০] Xinjiang Victims Database, "Erbol Ergali" Last updated: 2018-10-12 - https://tinyurl.com/wh44mgv

[১০১] DOAM - Documenting Oppression Against Muslims টুইটার একাউন্টে ১৪ জুলাই ২০২০ এ প্রকাশতি ভডিওি, #Uyghur Imams Forced To Dance
Suppressing religious freedoms: Chinese imams forced to dance in Xinjiang region, The Express Tribune, April 18th, 2015. https://tinyurl.com/y4hj5dmw

[১০২] সূত্র: আব্দুওলী আয়ুপ, উইঘুর ভাষাতত্ত্ববিদ ও অ্যাক্টিভিস্ট

থাকার পরও, সরকারের বিশ্বস্ত লোক হবার পরও করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে তাকে।[১০৩] চীনাদের ইসলামবিদ্বেষ কতটা তীব্র মাত্রার তা কি টের পাচ্ছেন পাঠক?

রেহাই দেয়া হয়নি সরকারের কাছে 'আদর্শ নাগরিক' বলে পরিচিত উইঘুরদেরও। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অনুগত, সরকারি চাকরি করা, চোস্ত চাইনিয বলা, সরকারি স্কুল-কলেজের ডিগ্রি থাকা, হানদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, হান চীনাদের সংস্কৃতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেয়ার পরও ছাড় পায়নি উইঘুর 'আদর্শ নাগরিকেরা'। তারা উইঘুর, তারা নামে মুসলিম–এই পরিচয়ের কারণেই হান চাইনিযরা গণহারে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছে তাদের।[১০৪]

আসলে এমনটাই হবার কথা। কাফির মুশরিকরা যখন মুসলিমদের আক্রমণ করে তখন কে মডারেট মুসলিম, আর কে মৌলবাদী মুসলিম, কে নববী আদর্শের কথা বলে আর কে যালিমকে পাশে বসিয়ে মুসলিম ভাইকে যলিমের হাতে তুলে দেবার ওয়াজ করে–সেই বাছবিচার করে না। কাফির মুশরিকরা দেখে না কে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক, কে হানাফি, কে সালাফী, কে 'ওয়াহাবি', কে সুফি, কে 'শুক্রবারের মুসলিম', কে 'দুই ঈদের মুসলিম' আর কে 'জানাযার মুসলিম'। ওদের কাছে একটা পরিচয়ই মুখ্য–এরা মুসলিম! সহজ এই সমীকরণ ওরা বুঝলেও কেন যেন আমরা বুঝি না!

মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস করা, আলিম-উলামাদের জেলে পোরার পেছনে উদ্দেশ্য একটাই–চীনে উইঘুরদের তাদের ধর্ম ভুলিয়ে দেয়া। মসজিদ-মাদ্রাসাই যদি না থাকে, তাহলে উইঘুর শিশুরা দ্বীন কীভাবে শিখবে? কীভাবে ইসলাম এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবে? সেই সাথে মসজিদ-মাদ্রাসা ভেঙে দেবার আরেকটা উদ্দেশ্য হলো উইঘুরদের মনোবল ভেঙে দেয়া–দেখো তোমাদের 'আল্লাহর ঘর' মসজিদও তোমরা রক্ষা করতে পারছ না। কাজেই তোমরা হেরে গেছ। চুপচাপ আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নাও, ইসলাম ত্যাগ করে কমিউনিযম মেনে নাও।

---

[১০৩] Demolishing Faith: The Destruction and Desecration of Uyghur Mosques and Shrines. Bahram K. Sintash, Uyghur Human Rights Project, October, 2019. https://tinyurl.com/sszs4kw, pg 10

[১০৪] Even China's 'Model' Uyghurs Aren't Safe. Kelly Ng. The Diplomat, March 14th, 2019. https://tinyurl.com/t67e3md

Prominent Uyghur Historian Confirmed Jailed in Xinjiang Over Published Book. Radio Free Asia, December 11th 2019. https://tinyurl.com/r5kb5o2

Her Uighur Parents Were Model Chinese Citizens. It Didn't Matter. Sarah A Topol. The New York Times Magazine, January 29th, 2020. https://tinyurl.com/rqs53lx

মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করেই উইঘুর সমাজ আবর্তিত হয়। এগুলো ধ্বংস করে ফেললে উইঘুরদের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ধ্বংস হতে সময় লাগবে না। উইঘুরদের পরবর্তী প্রজন্ম হারিয়ে ফেলবে তাদের পরিচয়। তাই একেবারে আসল জায়গায় হাত দিয়েছে চাইনিযরা।

দুই.

পূর্ব তুর্কিস্তানের রাস্তাগুলোতে খুব ব্যস্ত সময় পার করছে পুলিশ আর কমিউনিস্ট হান চাইনিযরা। মানুষের ভিড় থেকে উইঘুর নারীদের বেছে নিয়ে তাদের থামাচ্ছে পুলিশ বা হান চাইনিযরা। তারপর কেঁচি দিয়ে কেটে দিচ্ছে উইঘুর নারীদের কোমরের নিচে চলে যাওয়া পোশাকের ঝুল। কোমরের নিচে কোনো পোশাকের ঝুল থাকতে পারবে না। বাদ দেয়া হচ্ছে না কোনো উইঘুর নারীকেই। বাস থেকে, ফুটপাত থেকে, দোকান থেকে উইঘুর নারীদের ডেকে নিয়ে এসে পোশাক কেটে দেয়া হচ্ছে। এমনকি স্কুটি চালানো 'আধুনিক' উইঘুর মেয়েটাকে থামিয়েও কেটে দেয়া হচ্ছে তার পোশাক! অদ্ভুত এই ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল সাইটগুলোতে।[১০৫]

নারীর ক্ষমতায়নের এই যুগে, নারী স্বাধীনতার ফিচারওয়ালা এই বিশ্বে এভাবে রাস্তার মাঝখানে শত শত মানুষের সামনে নারীর পোশাক কেটে দেয়া হচ্ছে। চরম অপমান করা হচ্ছে; কিন্তু নারীবাদীরা মুখ বন্ধ করে আছে। কোনো প্রতিবাদ করছে না। প্রতিবাদ করছে না বিশ্বব্যাপী নারী-স্বাধীনতা ফেরি করে বেড়ানো অ্যামেরিকা। কোনো কথাই বলছে না আলোকিত (এনলাইটেন্ড) ইউরোপ!

ক্রুসেইডার, নারীবাদী বা নাস্তিকেরা যে কয়টি ধরাবাঁধা বিষয় দিয়ে ইসলামকে আক্রমণ করে তার শীর্ষে রয়েছে নারী-স্বাধীনতা। ওরা সবাই একযোগে ইসলামের দিকে আঙুল তুলে বলে ইসলামে নারীদের কোনো মর্যাদা নেই, নারী কেমন পোশাক পরবে তা ঠিক করে দিয়ে ইসলাম নারীদের অসম্মান করেছে। নারীর দেহ নারীর একান্ত নিজের। এই দেহে সে কী পোশাক পরবে সেটা ঠিক করবে নারী নিজেই; অন্য কারও কোনো অধিকার নেই নারীর পোশাক ঠিক করে দেবার।

আচ্ছা, ইসলাম নারীদের বোরখা পরতে বললে সেটা হয় নারীর অসম্মান, অপমান। আর চীনারা প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলিম নারীদের পোশাক কেঁচি দিয়ে কেটে দিলে

---

[১০৫] Police are reportedly cutting too-long dresses off ethnic minority women in the middle of streets in China. Tara Francis Chan. Business Insider, Juley 17th, 2018. https://tinyurl.com/rvcmnvc

তাতে বুঝি নারীর খুব সম্মান হয়? এতে নারীর খুব ক্ষমতায়ন হয়? খুব নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা হয়?

বুঝতেই পারছেন, রাস্তাঘাটে যারা এভাবে নারীদের কাপড় কেটে দিতে পারে তারা নিকাব সহ্য করতে পারবে না। নিষিদ্ধ করা হয়েছে নারীর নিকাব এমনকি হিজাব পরাও।[১০৬] মাথায় ত্যানা প্যাঁচিয়ে স্টাইলিশ হিজাব... উঁহু, উঁহু, সেটা করারও অনুমতি নেই।[১০৭]

নারীবাদীরা কই?

উইঘুর নারীর পোশাক কেমন হবে চীনারা তা ঠিক করে দিচ্ছে, নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে; কিন্তু এখন চীনাদের কাছে গিয়ে কোনো নারীবাদী, কোনো নাস্তিক সুশীল বিজ্ঞানমনস্ককে নারী-স্বাধীনতার তত্ত্ব কপচাতে দেখবেন না।

কেন?

চীনাদের সমস্যা শুধু পর্দা কিংবা মেয়েদের পোশাক নিয়ে না। নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে দাড়ি রাখা। দাড়ি দেখলেই সন্দেহ করে ওরা—এই ব্যাটা মনে হয় জঙ্গি।[১০৮],[১০৯]

---

[১০৬] এমনকি মোবাইলে হিজাব পরা নারীর ছবি থাকলেই পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

[১০৭] Ban on beards and veils – China's Xinjiang passes law to curb 'religious extremism'. Nectar Gan. South China Morning Post, March 20th, 2017. https://tinyurl.com/wmny655

Why China is banning beards and veils in Xinjiang. Katie Hunt, Chiey Luu & Steven Jiang. CNN, April 1st, 2017. https://tinyurl.com/uh7xr3a

[১০৮] Ban on beards and veils – China's Xinjiang passes law to curb 'religious extremism'. Nectar Gan. South China Morning Post, March 20th, 2017. https://tinyurl.com/wmny655

[১০৯] এই লেখাটা লিখতে গিয়ে বারবার পরিচিত আরেক দেশের কথা মনে পড়ছে। যে দেশের এই ৯০ শতাংশ নাগরিক নাকি মুসলিম। কিন্তু তবু সেখানে আজ দাড়ি-টুপিকে জঙ্গির পোশাক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। রাস্তাঘাট, চাকরির ভাইভাসহ অনেক জায়গাতেই দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবির জন্য হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম নারীদের মাথা থেকে হিজাব-নিকাব টেনে খোলা হচ্ছে। নোটিশ দিয়ে বলা হচ্ছে স্কুলে কোনো ওড়না পরা যাবে না। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় বিশাল আকারের রঙ্গিন বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হচ্ছে—দাড়ি রাখা, টাখনুর ওপর কাপড় পরা, জন্মদিন পালন না করা, চুপচাপ থাকা, ধর্মীয় উপদেশমূলক কথা বলা এসব নাকি জঙ্গিবাদের লক্ষণ।

ইসলামের বিরুদ্ধে চীন এতগুলো ফ্রন্ট খুলেছে, কোনটা ছেড়ে যে কোনটা আগে বলব সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না! ইসলামের বিরুদ্ধে একেবারে 'অলআউট' যুদ্ধে নেমেছে চীন। ইসলামের নামনিশানা মুছে ফেলতে যা যা করা দরকার মনে করছে, করছে তার সবকিছুই। চীনাদের কাছে ইসলাম হলো মানসিক সমস্যা, একধরনের রোগ, ভাইরাস। তাই এই ভাইরাস দূর করার জন্য মুসলিমদের রিএডুকেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার।[১১০]

মুহাম্মাদ, জিহাদ, ইসলাম, আযহার, ইমাম, সাদ্দাম, আরাফাত, ওয়াহ্হাবের মতো কমপক্ষে ২৯টি নাম নিষিদ্ধ করেছে চীন সরকার। সরকারের মতে এই নামগুলো ইসলামি সংস্কৃতি থেকে এসেছে, এগুলো চীনা সংস্কৃতির সাথে ঠিক যায় না। তাই কোনো মুসলিম এ ধরনের নাম রাখতে পারবে না। উইঘুরদেরকে চাইনিয সংস্কৃতির হাইকোর্ট দেখানো হলেও হান চাইনিযদের ক্ষেত্রে সাতখুন মাফ। ওরা সমানে পশ্চিমা নাম দিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের, তাতে চীনা সংস্কৃতির কোনো অপমান ঘটছে না। কিন্তু উইঘুররা মুহাম্মাদ বা ইসলাম, নাম রাখলে যেন রাতারাতি গোল্লায় যাচ্ছে চীনা সংস্কৃতি![১১১]

ইসলামের বিরুদ্ধে চীনের এ যুদ্ধ শুধু পূর্ব তুর্কিস্থানে সীমাবদ্ধ না। বেইজিঙের মুসলিম দোকান বা রেস্টুরেন্টগুলোতে দফায় দফায় অভিযান চালাচ্ছে সরকারি কর্মকর্তারা। না ভেজালবিরোধী অভিযান না; সরকারী নির্দেশনার পরও কোন কোন দোকানে আরবি হরফে হালাল সাইনবোর্ড ঝুলছে সেটা চেক করার জন্য চালানো হচ্ছে অভিযান।

মুসলিম দোকান মালিকদের সরকার সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে–দোকানে আরবি হরফে লেখা 'হালাল' সাইনবোর্ড ঝুলাতে পারবে না তারা।

সরকারি লোকেরা বারবার মুসলিম দোকান মালিকদের বলেছে, 'এগুলো বিদেশি সংস্কৃতি। আপনাদের আরও বেশি বেশি করে চীনা সংস্কৃতির জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হবে।'[১১২]

এতকিছু করার পরেও তৃপ্তি পায়নি নাস্তিক কমিউনিস্ট সরকার। মুসলিম দোকানদারদের ওপর কড়া নির্দেশ এসেছে, হরেক রকমের মদ আর সিগারেট বিক্রি করতে হবে

---

[১১০] China treats Islam like a mental illness. Hajra Haroon. Netmag, December 24th, 2019. https://tinyurl.com/w5rq8az

[১১১] China bans list of Islamic names in restive Xinjiang region. Gerry Shih. AP News, April 27th, 2017. https://tinyurl.com/wfwpbgr

[১১২] China orders shops to remove Islamic symbols and Arabic from signs as persecution of Muslims intensifies. Tim Wyatt. August 1st, 2019. https://tinyurl.com/yyna4gnc

দোকানে। যেনতেনভাবে সরকারি নির্দেশ পালনের জন্য কেবল দোকানের এক কোণে কয়েকটা মদের বোতল আর সিগারেটের প্যাকেট ফেলে রাখলে হবে না। দোকানের সামনে একদম 'আই-ক্যাচি' ডিসপ্লেতে মদ-সিগারেট রাখতে হবে। 'মদ, সিগারেট ইসলামে হারাম... দোকানে রাখতে পারব না' এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই চীনের মুসলিমদের। সরকারি নোটিশে কাটা কাটা অক্ষরে বলে দেয়া হয়েছে, যেসব দোকানি নির্দেশ মানতে গড়িমসি করবে বা মানবে না তাদের দোকান সিলগালা করে দেওয়া হবে। ট্রেড লাইসেন্স কেড়ে নেয়া হবে, নেয়া হবে আইনানুগ ব্যবস্থা।[১১৩]

আরবি হরফে লেখা হালাল সাইনবোর্ড সরানো বা ইসলামী নাম নিষিদ্ধ করার কারণ হিসেবে চীন দাঁড় করিয়েছে 'আরবি আগ্রাসান' এর অজুহাত। সাংস্কৃতিক আগ্রাসান। আরবি হরফ বা ইসলামী নাম চীনাদের বাপ-দাদাদের সংস্কৃতির সাথে যায় না, তাই এগুলো নিষিদ্ধ করতে হবে। হান চাইনিয শুকরগুলির সাথে আমাদের দেশের কথিত সুশীল, সেক্যুলার আর প্রগতিশীলদের কী অদ্ভুত মিল খেয়াল করেছেন পাঠক?

হান চীনারা ইসলামী নাম বাতিল ঘোষণা করলেও নিজেরা ঠিকই চীনের সংস্কৃতিকে কাঁচকলা দেখিয়ে নাম রাখছে পাশ্চাত্যের অনুকরণে। চীনাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক বাদ দিয়ে ঠিকই পরছে পাশ্চাত্যের পোশাক। এসবে তাদের সংস্কৃতির কোনো অবমাননা হচ্ছে না! কিন্তু শুধু ইসলামী নাম রাখলেই ইসলাম অবমাননা হয়!

অবাক করা একটা ব্যাপার হলো এই ফালতু যুক্তি বাংলাদেশের মিডিয়া এবং অনেক কথিত সুশীল বুদ্ধিজীবীরাও অনেক দিন ধরে দিয়ে যাচ্ছে। এদের অনেকে টিভি টকশোতে এসে খুব হা-হুতাশ করে বলে, 'হিজাবী নিকাবী মহিলাতে ভরে যাচ্ছে দেশ, ভরে যাচ্ছে ভার্সিটি।' গম্ভীর মুখে আশঙ্কা প্রকাশ করে, 'দেশ আরেকটা আফগানিস্তান, পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে—বাঙালি সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। এ জন্যেই কী একাত্তরে যুদ্ধ করেছিলাম?'

কিন্তু দেশের তরুণ-তরুণীরা যখন পাইকারি হারে জিনস, টি শার্ট পরে ফিরিঙ্গি হয়ে যায় তখন সেটা নিয়ে তাদের উৎকণ্ঠিত হতে দেখা যায় না। টাইট জিন্স, টি শার্ট বা টপস পরে নারীরা মোটর বাইকে দুদিকে পা ঝুলিয়ে 'জাস্ট ফ্রেন্ডদের' জাপটে ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে 'বাঙালি সংস্কৃতি'র কিচ্ছুটি হয় না। সারা বছর হিন্দী গান শুনলে, চল্লিশটা ভারতীয় চ্যানেল চললে, ভারত থেকে বাইজি নিয়ে এসে স্টেডিয়াম ভর্তি মানুষের সামনে নাচালে কথিত প্রগতিশীল আর সুশীলদের জগতে সাংস্কৃতিক

---

[১১৩] China orders Muslim shopkeepers to sell alcohol, cigarettes, to 'weaken' Islam. Simon Denyer. The Washington Post, May 5th, 2015. https://tinyurl.com/ze2mzbx

আগ্রাসান হয় না। কিন্তু ইসলামের বিধান পালন করলে বাঙালি সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়ে যায়। খুব সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হয়!

আসলে চাইনিয হোক বা বাঙালি, মানবতা আর সহনশীলতার ফাঁপা বুলি আওড়ানো পৃথিবীর সব জায়গায় ভণ্ডদের চেহারা একই!

যা হোক, বাংলাদেশের আলোচনা বাদ দিয়ে চলুন আবার ফেরা যাক কাশগড়ে।

উইঘুরদের ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করে বিয়ে নিষিদ্ধ। মুসলিমদের যদি বিয়ে করার খায়েশ জাগে, তাহলে অবশ্যই তা করতে হবে চীনের প্রচলিত আইনে।[১১৪]

বাচ্চাকাচ্চাদের অবশ্যই সরকারি স্কুলে পাঠাতে হবে। কোনো ধরনের হোম স্কুলিং করা চলবে না। সবাই মিলে অবশ্যই সরকারি টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখতে হবে বা রেডিওর অনুষ্ঠান শুনতে হবে।[১১৫]

১৮ বছরের কম বয়সী কেউ মসজিদে যেতে পারবে না। আকসু, কাশগড় এবং হোতানের প্রশাসন উইঘুর অভিভাবকদের বাধ্য করেছে একটা শপথনামায় স্বাক্ষর করতে। চীনা প্রশাসন উইঘুর বাবা-মাদের দিয়ে শপথ করিয়েছে, তারা যেন তাদের সন্তানদের কোনো ধরনের ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে না দেয়।[১১৬]

নিষিদ্ধ করা হয়েছে আযান দেওয়া। আযানের পরিবর্তে হর্ন বাজিয়ে নামাযের আহ্বান করতে বলেছে চীনারা।[১১৭]

নিজেদের উদ্যোগে হাজ্জ করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে অসংখ্য উইঘুরকে। পাঠানো হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। এমনকি অনেককে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়েছে।[১১৮]

---

[১১৪] China sets rules on beards, veils to combat extremism in Xinjiang. Reuters, March 30th, 2017. https://tinyurl.com/wrvx5gf

[১১৫] Why China is banning beards and veils in Xinjiang. Katie Hunt, Chiey Luu & Steven Jiang. CNN, April 1st, 2017. https://tinyurl.com/uh7xr3a

China Uighurs: Xinjiang ban on long beards and veils. BBC News, April 1st, 2017. https://tinyurl.com/rllrmw8

[১১৬] Chinese Authorities Demolish Home of Uyghur Supporting Quranic Studies. Radio Free Asia, January 4th, 2015. https://tinyurl.com/scnw6x9

In China’s far west the ‘perfect police state’ is emerging, Tom Phillips. The Guardian, June 23rd, 2017. https://tinyurl.com/y7cvp6mo

[১১৭] A Crackdown on Islam Is Spreading Across China, Steven Lee Myers. The New York Times, September 21st, 2019. https://tinyurl.com/y4kzb8x8

[১১৮] Xinjiang Authorities Sentence Uyghur Philanthropist to Death For

নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে রমাদানে রোযা রাখা। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে, খবরদার রোযা রাখবে না! রমাদানে মসজিদের চৌহদ্দির মধ্যে নিজের চেহারা দেখাবে না, নামায বা অন্য কোনো ধরনের ধর্মীয় কাজে জড়াবে না নিজেকে!

শুধু নোটিশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি চীন সরকার, নোটিশের নির্দেশনা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় তা নিশ্চিত করতে মুসলিমদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে পুলিশ। উইঘুরদের ঘরে ঘরে ঢুকে নজরদারি করা হচ্ছে কেউ রোযা রেখেছে কি না। স্কুলে শিক্ষকরা চকলেট, রুটি বা পানি নিয়ে এসে রাখে মুসলিম ছাত্রদের সামনে। তারপর আদেশ দেয়, 'খাও, আমার সামনে সবগুলো শেষ করো'। সরকারি লাইসেন্সে উইঘুরদের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়া হান 'আত্মীয়দের' মাধ্যমেও কীভাবে এই বিষয়গুলো নজরদারি করা হচ্ছে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

রোযা নিষিদ্ধ করার জন্য অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছে চীনারা—রোযা রাখলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে, চীনারা তাই ছাত্রছাত্রীদের রোযা রাখতে না দিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অজুহাত দেয়া হয়েছে, ওদের রোযা রাখতে না দিয়ে সরকার আসলে এটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছে যে রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে সমর্থন করে না।[১১৯]

নাস্তিক, কমিউনিস্ট, সুশীল আর সেক্যুলারদের আমরা দেখি সারাক্ষণ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে চেঁচামেচি করতে। ইসলাম মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দেয় না, তা নিয়ে তাদের বিশাল মাথাব্যথা। তো এই নাস্তিক কমিউনিস্টরা এখন চীনে কী করছে? এগুলো কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা? বিরোধী মতের সাথে সহাবস্থান করার নমুনা?

এত অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে মরে যাবার পরেও শান্তি নেই চীনের মুসলিমদের। কবরস্থান পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলছে হান চাইনিযরা। এক মাস ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছে সিএনএন, কথা বলেছে অসংখ্য উইঘুর সোর্সের সাথে। হাজার হাজার স্যাটেলাইট ছবি

Unsanctioned Hajj. Radio Free Asia, November 21st, 2018. https://tinyurl.com/y77rqssx

৬২ বছর বয়সী #উইঘুর মুসলিম মহিলা হাওয়ান মেহমুদকে চীনের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। DOAM. https://tinyurl.com/ssnrgbp

[১১৯] China bans Muslims from fasting Ramadan in Xinjiang. Al Jazeera, June 18th, 2017. https://tinyurl.com/y5jfqlnk

China holds one million Uighur Muslims in concentration camps, Khaled A Beydoun. Al Jazeera, September 13th, 2018. https://tinyurl.com/yayyo95p

বিশ্লেষণ করেছে, ক্রস চেক করেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর তারা জানিয়েছে—চীন সরকার 'উন্নয়নের' নামে উইঘুরদের এক শয়েরও বেশি কবরস্থান ধ্বংস করেছে।[১২০] ফ্রান্সের নিউজ এজেন্সি এপি-র সাংবাদিকরা চাইনিয সরকারের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন কবরস্থানে সরেজমিনে তদন্ত করেছে। গোরস্থানজুড়ে ছটিয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখেছে হাড়গোড়।[১২১]

জানাযাটা পর্যন্ত ঠিকমতো করতে দেয় না পুলিশ আর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। মুসলিমদের কবর দেবার সময় আর্মড ভেহিকল নিয়ে হাজির হয় ওরা—বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত সোয়াট টিমও হাজির হয় মাঝে মাঝে। বলা হয়, 'কবর দাও ভালো কথা, কিন্তু কুরআন (জানাযার নামায) পাঠ করতে পারবে না।' বাধ্য হয়ে অনেকেই জানাযা পড়ানো ছাড়াই কবরে শুইয়ে দিচ্ছে তাদের স্বজনদের। কেউ কেউ লুকিয়ে মৃতদের লাশ দাফন করেন। রাতের আঁধারে আলিমদের ডেকে নিয়ে এসে খুব সতর্কতার সাথে জানাযা পড়ানো হয়। সরকার যদি জানতে পারে ইসলামী রীতি অনুসরণ করে লাশ দাফন করা হয়েছে, তাহলেই শুরু করে ধরপাকড়! নিজেদের ধর্মমতে লাশ দাফন করার অধিকারটুকুও নেই মুসলিমদের।[১২২]

এভাবে এক এক করে সকল অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের কাছ থেকে। শান্তিমতো মরার অধিকার পর্যন্ত নেই ওদের। সেটাও কেড়ে নিয়েছে হান চাইনিযরা। অজগর সাপ যেমন ধীরে ধীরে তার শিকারকে চাপ দিয়ে দম বন্ধ করে মারে, ঠিক সেভাবেই দম বন্ধ করে মেরে ফেলা হচ্ছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের। আমরা বাইরে থেকে কখনোই হয়তো বুঝতে পারব না চীন সরকার কী ভয়াবহ যুলুম করছে মুসলিমদের ওপর। আমরা কখনোই হয়তো বুঝব না কতটা কষ্ট নিয়ে এক উইঘুর মুসলিম বলেছিলেন, এর চাইতে সিরিয়ান রিফিউজি হওয়া অনেক অনেক ভালো ছিল![১২৩]

---

[১২০] More than 100 Uyghur graveyards demolished by Chinese authorities, satellite images show. Matt Rivers. CNN, January 3rd, 2020. https://tinyurl.com/tvy3npe

[১২১] 'No space to mourn': the destruction of Uygur graveyards in Xinjiang. South China Morning Post, October 12th, 2019. https://tinyurl.com/wcltvna

[১২২] CCP Interfering with How Muslims Perform Funerals. Li Zaili. Bitter Winter, January 24th, 2019. https://tinyurl.com/wj5jln7

Weather Reports: Voices From Xinjiang, Untold Stories From China's Gulag State, Ben Mauk. The Believer, Issue One Hundred Twenty-Seven, October/November 2019 - https://tinyurl.com/yxszsrkc

[১২৩] In China's far west the 'perfect police state' is emerging, Tom Phillips. The

এতকিছুর পরেও মুসলিমরাই সন্ত্রাসী, মুসলিমরাই সকল অশান্তির মূল, মুসলিমরাই অসভ্য, মুসলিমরাই বর্বর!

সত্যিই সেকুলাস, এ পৃথিবী বড়ই বিচিত্র!

Guardian, June 23rd, 2017. https://tinyurl.com/y7cvp6m

আর কোনো রূপকথা নেই

এতক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা ছিল না। ভূতের মতো নিঃশব্দে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছিল ওরা! ত্রস্ত হাতগুলোকে কুড়ালের মতো চালিয়ে চলছিল বরফ খোঁড়া। হাহাকার আর বিস্ময় মেশানো আওয়াজ বের হচ্ছে এখন ওদের অনেকের মুখ থেকে। চাবুকের মতো সপাং সপাং কণ্ঠে নেতাগোছের লোকটা নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে এদিকে খোঁড়ো, আর এই যে তুমি, হাতটাকে একটু মালিশ করে নাও—অবশ হাতে সাড়া পাবে।

বরফ আস্তে আস্তে ভেঙে মিশে যাচ্ছে নিচের ছোট কালো নালাটার সাথে। উঁকি দিচ্ছে ভেতরের জিনিসটা। বুট পরা ১টা পা, সোয়েটার পরা ১টা শরীর, মাথা। পুরো শরীরটা বেরিয়ে এল এক সময়। এক নিমিষেই চিনতে পারল সবাই। রহমাতুল্লাহ শিরবাকি। ওকেই খুঁজছিল ওরা ডিসেম্বরের ২১ তারিখ থেকে। ঠুনকো অজুহাতে ২ বছরের পিচ্চিটার বাবা-মাকে চীন সরকার ধরে নিয়ে গেছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। যেমন ধরে নিয়ে গিয়েছে ৩০ লাখ উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের। বৃদ্ধ দাদা-দাদির কাছে থাকত রহমাতুল্লাহ। ২১ ডিসেম্বর সকাল ১১ টার দিকে নিখোঁজ হয় সে। ওর জমে যাওয়া মৃতদেহ বরফ খুঁড়ে বের করা হয় ২৫ ডিসেম্বর।

বাবুটার মুখ থেকে জমাটবাঁধা বরফ সরিয়ে দিলো একজন। বরফগলা পানি কিছুক্ষণ জমে থাকল বাবুটার দুচোখে। তারপর গড়িয়ে পড়ল দুগাল বেয়ে, যেন কাঁদছে ও।

নিষ্পাপ দুই চোখ জীবনের সমস্ত আতঙ্ক নিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে, যেন ওই চোখের শক্তিতে সে নিমিষে শত শত মাইল দূরে চলে যাবে। পুরো শরীর শক্ত কাঠ হয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আতঙ্কে। প্রচণ্ড চিৎকারে ফেটে পড়তে চাইছে। পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যেন জমা হয়ে আছে চোখদুটোতে। শুধু ভয়ে, মৃত্যুভয়ে।

নিদারুণ কষ্ট, আতঙ্কে মারা গেছে ছোট্ট বাবুটা। একটা হাত বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আছে। কত প্রিয়জনের সান্নিধ্য পাওয়া হাত...এখন বরফের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে অসহায় আর্ত ভঙ্গিতে, হয়তো সাহায্য চাইছে কারও। হয়তো নীরব আর্তনাদে প্রতিবাদ করছে মানবিকতার এই অপমৃত্যুর বিরুদ্ধে।

অসহ্য কষ্টে থমকে দাঁড়াল সময়। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল একটু দূরে দাঁড়ানো এক তরুণী। রহমাতুল্লাহর কোনো আত্মীয় হবে হয়তো। অথবা কেউ না, স্রেফ আগন্তুক। হয়তো বরফ খোঁড়া দেখে কৌতূহলী হয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মানবতার জমাটবাঁধা মৃতদেহ দেখে কেঁদে উঠেছে এক মানুষের হৃদয়। মাথার ওপরে বিষণ্ণ আকাশ—একেবারে চুপচাপ। যেন মানুষের এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত নীচতা আর হিংস্রতায় নির্বাক, স্তব্ধ!

কত আদর-যত্নে বুকের মধ্যে আগলে রাখত রহমাতুল্লাকে তার বাবা-মা। বাবু যেন এতটুকুও কষ্ট না পায়, এতটুকুও ঠান্ডা যেন না লাগে তার জন্য কত চিন্তা, কত চেষ্টা ছিল তাদের। যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর সব জায়গায় বাবা-মায়েরা একই রকম। সন্তান একটু হাঁচি দিলেই, নাক দিয়ে একটু সর্দি টানার শব্দ করলেই অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাদের বুক। একটার পর একটা গরম কাপড় চাপিয়ে দেয় সন্তানের গায়ে। রহমাতুল্লাহর বাবা-মা এখনো জানে না, তাদের আদরের ধন বরফে জমে মারা গিয়েছে। ক্যাম্পের কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অন্যরা যখন একমনে মৃত্যুকে ডেকে চলে, তখন হয়তো ওরা নিজেকে শাসন করে—কোনোমতেই ভেঙে পড়া যাবে না। বেঁচে থাকতেই হবে আমাদের। রহমাতুল্লাহকে মানুষ করার জন্য বেঁচে থাকতেই হবে।

এই পিতা-মাতার কাছে যখন রহমাতুল্লাহর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাবে, কীভাবে সহ্য করবে তারা সেই আদিগন্ত বিস্তৃত শোক?[১২৪]

রহমাতুল্লাহদের মতোই লন্ডভন্ড হয়ে গেছে সব উইঘুরের পরিবার, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ভালোবাসা, আদর-যত্ন-স্নেহ-মায়া-মমতার সম্পর্কগুলো। প্রত্যেক ঘরে ঘরে যে কষ্ট ঝরে পড়ে প্রতিনিয়ত, সেই কষ্ট পৃথিবীবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও কাঁদতে হবে দিনের পর দিন, হয়তো কাঁদতে হবে কয়েক প্রজন্ম ধরে; তবুও কষ্ট ফুরোবে না।

---

[১২৪] Humanity frozen to death with a 2-year-old Uyghur boy. Uighur Times. December 29th, 2018. https://tinyurl.com/u3t7knu
রহমাতুল্লাহর মতো আরও একজন উইঘুর শিশু বরফে জমে মারা যায়। বরফ থেকে তার লাশ উদ্ধারের ভিডিও Uyghur Boy Dies in Snow Bank While Parents in Internment Camp | Radio Free Asia (RFA), December 18th, 2019. https://tinyurl.com/w2vudhh

দুই.

এই অনুচ্ছেদ শুরু করার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পাঠকদের কাছ থেকে–ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতির কথা বলার জন্য। জীবনের সবচেয়ে কঠিন লেখাটা লিখতে হচ্ছে আমাকে এখন। সম্পাদকের পক্ষ থেকে তাড়া ছিল অনেক, বকাঝকাও খেতে হয়েছে নিয়মিত বিরতিতে। তারপরও অনেক সময় নিয়ে ফেলছি আমি এই লেখাটা লিখতে গিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও লেখাটার কাঠামো দাঁড় করাতে পারছিলাম না; শেষমেশ পারিওনি। এলোমেলো চলতে দিয়েছি কিবোর্ডে আঙুল। আসলে মানুষের এত কষ্ট, এত দুঃখ-বেদনা, এত অশ্রুজল লেখার হরফে ঠিক তুলে আনা যায় না। অন্তত আমাকে সেই ক্ষমতা দেয়া হয়নি। পাঠকদের নিকট বিনীত অনুরোধ এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য–আমার এই লেখা পড়তে হবে না, শুধু অনুরোধ থাকবে এই ভিডিও তিনটি দেখুন।

Xinjiang: China, where are my children? - BBC News- https://tinyurl.com/twxk5xo

Uighur families describe pain of being separated from children- https://tinyurl.com/uhurv34

China is putting Uighur children in ‘orphanages’ even if their parents are alive- https://tinyurl.com/ycrdt2go

আগেই বলেছি এই নির্মম ও কুৎসিত বাস্তবতা তুলে ধরতে আমি অক্ষম। তারপরেও নিরুপায় আমাকে চেষ্টা করতে হয়েছে। যতটুকু যা পেরেছি তা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এখানে…

একটা বয়সে এসে ঈদের আনন্দ আর আগের মতো থাকে না। ঈদ এল, পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে নামাযে যেতে হবে, কোলাকুলি করে বাড়ি চলে আসতে হবে, আত্মীয়দের বাসায় ঘুরতে যেতে হবে–এই গৎবাঁধা ছকে বাঁধা পড়ে যায় ঈদের আনন্দ। কিন্তু ঈদের সময় পৃথিবীর সব অকৃত্রিম আনন্দ গিয়ে ভর করে শিশুদের মনে, দুচোখে। নতুন জামা পরে পাড়াময় ছোটাছুটি, সালামি চাওয়া, সাদা পাঞ্জাবি, লাল টুপি পরে বাবার হাত ধরে, ভাইয়ের ঘাড়ে চড়ে ঈদগাহে যাওয়া। গরু-খাসি ‘জবো’ দেয়া দেখে ভয় পেয়ে মা, বড়বোনের বুকে মুখ লুকানো। আনন্দ, হাসি-কান্না, হৈচৈ সব মিলিয়ে খুশি ও আনন্দের পরিপূর্ণ এক প্যাকেজ। বড়দের নিরানন্দ ঈদের ‘আনন্দকেও’ ভালোবাসার আবেশে রাঙিয়ে দেয় ছোটরা।

সেই ঈদ এসেছে ইস্তাম্বুলে, কিন্তু ঈদ আসেনি উইঘুর রিফিউজিদের জীবনে। আর কোনো দিন আসবে না হয়তো…

ঈদ উল আযহার দিন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বেশ কয়েকজন সন্তানহারা বাবা-মায়ের সাক্ষাৎকার নেয় এপির সাংবাদিক। একে একে শোনা যাক মাল্টি কালার কষ্টের সেই কাহিনিগুলো...

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথা শুরু করল আয়নুরা। আয়নুরা হায়রিনসা। কান্না জড়িয়ে রইল তার প্রতিটি কথায়...

> 'আমার নাম আয়নুরা। আমার ছেলের নাম মুহাম্মাদ। ওর বয়স এখন ৭ হয়ে গেছে। দেড় বছর হলো ওর কোনো খোঁজখবর জানি না আমি। অনেক চেষ্টা করেছি, অনেকের কাছে জানতে চেয়েছি কেউই কোনো খোঁজ দিতে পারেনি—কার সাথে থাকে ও, কোথায় থাকে, কেমন আছে। আমার বাবা-মায়ের কোনো খোঁজখবরও জানি না আমি। আজকে ঈদের দিন, অথচ কোথাও কেউ নেই! টানা দুই ঘণ্টা কেঁদেছি আমি আজ সকালে।'

ছেলেমেয়ে একটু চোখের আড়াল হলেই অস্থির হয়ে যান মায়েরা। ছেলেমেয়েকে ছাড়া ঈদ করার কথা হয়তো দুঃস্বপ্নেও ভাবেন না। কিন্তু আয়নুরাকে ঘর-বাড়ি, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, নিজের দেশ ছেড়ে দূর প্রবাসে বসে ঈদ করতে হচ্ছে। ছেলে তো নিজের কাছে নেইই, ছেলে বেঁচে আছে না মারা গেছে সেটাও জানেন না। জানেন না নিজের বাবা-মাই বা কোথায় আছে!

আব্দুর রহিম ইমিনের স্ত্রী গ্রেফতার হয়েছিল কারণ আব্দুর রহিম ইস্তাম্বুল থেকে অন্য এক মহিলার মাধ্যমে তাকে কিছু উপহার (অলিভওয়েল ইত্যাদি) পাঠিয়েছিল। পুরুষ মানুষ, তাই হয়তো কাঁদল না ইমিন; কিন্তু কান্না প্রতিনিয়ত ঝরে পড়ল তার উচ্চারিত শব্দের ভেতর থেকে।

> 'আমার পাঁচ ছেলেমেয়ে। বড় মেয়েকে আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়েছে সরকার। এ খবর আমি জানি। এক বন্ধু সেদিন জানাল আমার দুই ছেলে পুলিশের গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে। অন্য সন্তানদের কোনো খবর জানি না ২০১৩ সাল থেকে। কত বছর কেটে গেছে আমি বাচ্চাদের গলার আওয়াজ শুনি না। আমি আরেকবার ওদের জড়িয়ে ধরতে চাই, ওদের আদর করতে চাই, পেতে চাই ওদের ভালোবাসা। এত নিষ্ঠুরতা, এত নির্দয়তা! এর চেয়ে চীন সরকার আমাদের মেরে ফেলত, সেটাই ভালো হতো! প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে আমরা মারা যাচ্ছি। আমরা আমাদের সন্তানদের দেখতে পাই না, আমাদের বাবা-মায়ের কাছে যেতে পারি না। অসহ্য যন্ত্রণা!'

২০১৪ সালে পালিয়ে ইস্তাম্বুলে আসার পর থেকেই কারাভোগের মতো জীবন কাটাচ্ছে ইমিন। দিন কাটছে ছোট্ট একটা স্যাঁতসেঁতে প্রায় অন্ধকার ঘরে বইপুস্তক আর লেখার সরঞ্জামাদির ভেতরে। প্রথম বছর ইচ্ছে করেই নিজেকে বিরত রেখেছিল বাচ্চাদের ছবি দেখা থেকে। গত ডিসেম্বরে তার মোবাইলে বড়মেয়ের একটা ছবি আসে। চাইনিয কিপাও[১২৫] পরা। সঙ্গে সঙ্গে ছবি ডিলিট করে দেয় ইমিন। পরের এক মাস ঘুমুতে পারেনি রাতে।

জোর করে ছেলেমেয়েকে বোর্ডিং স্কুলে ধরে নিয়ে গেছে সরকার, 'শিক্ষিত' করার জন্য। হয়তো এই বিচ্ছেদের কষ্ট মেনে নেয়া যায়, হয়তো...। কিন্তু যখন আপনি নিশ্চিত জানেন, সরকার আপনার ছেলেমেয়েকে ঠিক সেসব জিনিসই শেখাবে যা আপনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন, তখন কেমন লাগবে আপনার? আপনি জানেন আপনার সন্তানকে ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে তার ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি। কাফিরদের জীবনাচার চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে ওর ওপর জোর করে। ঘুমুতে পারবেন আপনি রাতে?

মনের দুঃখে আচ্ছন্নের মতো রোজ রোজ কবিতা আওড়ে যায় ইমিন :

আর আমি যাব নিশ্চিত যাব...
আঁধার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সমাপ্তি ঘটাব অসীম রাত্রির।
আমি নিশ্চিত ফিরে যাব আমার শহরে,
মাটিতে গভীর এক গর্ত খুঁড়ব,
সেখানে চাপা দেবো আমার সকল দুঃখ-কষ্ট!

প্রত্যেক সকালে একই দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে ২৯ বছরের মেরিপেত। চীন সরকার তার চার ছেলেমেয়েকেই 'এতিমখানায়' ধরে নিয়ে গেছে। যদি এটা দুঃস্বপ্ন হয়েই থাকত, তাহলে তেমন কিছু যেত আসত না। কিন্তু এই দুঃস্বপ্ন সত্যি হয়ে এসেছে মেরিপেতের জীবনে। মেরিপেত আর তার স্বামী তুরস্ক এসেছিল তার অসুস্থ মাকে দেখতে। বাচ্চাদের রেখে এসেছিল পূর্ব তুর্কিস্তানে, ওদের দাদির কাছে। এই সময় নানা তুচ্ছ কারণে উইঘুরদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাতে শুরু করে চীন সরকার। বিদেশে ভ্রমণ এই তুচ্ছ কারণগুলোর একটি। তাই আর চীনে ফিরে যাওয়া হয়নি মেরিপেতের।

বাচ্চাদের দাদিকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায় সরকার। এক বন্ধুর মাধ্যমে মেরিপেত জানতে পারে তার তিন থেকে আট বছরের চারজন বাচ্চাকেও এতিমখানায় নিয়ে গেছে সরকার।

---

[১২৫] ঐতিহ্যবাদী চাইনিজ পোষাক। খুবই আটসাটো, সংক্ষিপ্ত এবং আবেদনময়ী।

'আমার বাচ্চাদের জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। খবরটা পাবার সাথে সাথেই ভেঙে পড়লাম আমি। চেয়েছিলাম ওদেরকে নিজের হাতে মানুষ করতে। চীনারা আমার চার ছেলেমেয়েকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়েছে। যখনই আমি ওদের কথা ভাবি, যখনই আমি ভাবি কী ঘটেছে আমাদের সাথে–তেতো হয়ে যায় মুখের ভেতরটা।

এমন কোনো দিন নেই যেদিন আমি ওদের জন্য কাঁদি না। কত কথা জমে আছে আমার বুকে, মনে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি আমাকে একবার সুযোগ দেন–কত কথা যে বলব আমি ওদের সাথে। আসলে এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি ওদের কোলে নিয়ে বলব, 'বাবা, যা কিছু হয়ে গেল তার সবকিছুর জন্য আমি সরি।'

দেড় বছর হয়ে গেল আমি আমার জাদুসোনাদের খবর জানি না। শেষমেশ ওদের সাথে যখন আমার দেখা হবে, তখন ওরা কি আমাকে চিনতে পারবে? আমি কি চিনতে পারব ওদের?'

মেরিপেতের গল্পটা ছোট। কিন্তু এই ছোট গল্পটা বলতে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে অনেক বেশি সময় লাগল। কারণটা এরই মধ্যে বোধহয় ধরে ফেলেছেন পাঠক। কান্না। তার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বর্ণে জড়িয়ে রইল কান্না।

মেরিপেতের ভাইয়ের কাহিনি আরও করুণ। আর যাই হোক, মেরিপেত অন্তত জানে যে তার ছেলেমেয়েকে সরকার বোর্ডিং স্কুলে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু ওর ভাই, ডাক্তার আব্দুল আযিয ২০১৭ সালের জুন থেকে ছেলেমেয়েদের কোনো খবরই জানে না। তার স্ত্রী গ্রেফতার হবার পর ছোট ছোট বাচ্চাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা নিয়ে এখনো একেবারে অন্ধকারে। কোনো আইডিয়াই নেই।

একদিন লোকাল পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন পায় ডাক্তার আব্দুল আযিয। আদেশ দেয়া হয় যত দ্রুত সম্ভব থানায় রিপোর্ট করতে। আব্দুল আযিয থানায় রিপোর্ট করার বদলে পালিয়ে চলে আসেন তুরস্কে। করুণ মুখে জানায়, তার অর্ধেকেরও বেশি প্রতিবেশীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্যাম্পে।

স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে প্রবাসে চরম দুঃসহ জীবন পার করছে যুবক এই ডাক্তার। প্রতিরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে সে। তার সন্তানেরা ধূলিমলিন চেহারা নিয়ে গভীর এক খাদের কিনারা ধরে ঝুলে আছে। প্রাণপণে চিৎকার করছে–

বাবা! বাবা! আমাদের বাঁচাও, আমরা পড়ে যাচ্ছি বাবা!

আব্দুল আযিয ছুটে যেতে থাকে ওদের দিকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটতে থাকে। কিন্তু নাগাল পায় না। বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতেই থাকে–বাবা বাবা, আমাকে

বাঁচাও! আযিয ছুটতে থাকে পাগলের মতো... কিন্তু নাগাল পায় না। কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভাঙে তার, সারাদিন কানের পাশে একটা চিৎকার শুনতে পায় সে,

'বাবা! বাবা! আমাদের বাঁচাও![১২৬]

আর কত পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষদের কাহিনি শোনাব?

৭৫ বছরের বৃদ্ধা মেলিকেম ওমের নাতি-নাতনি হারানো ব্যথার গল্প, ৫ সন্তান হারানো আদিলের গল্প, নাকি ছেলেহারা গুলজিনের গল্প? ছেলের সংবাদ পাবে এই আশায় তুরস্কের রিফিউজি উইঘুরদের ওপর স্পাইং করতে সম্মত হবার গল্প? আব্দুর রহমান তোঠির গল্প, যার ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে নিয়ে গিয়ে ব্রেইনওয়াশ করছে সরকার, ভুলিয়ে দিচ্ছে যে সে একজন উইঘুর...। আর কত গল্প শোনাব? আর কত শোনাব ৫ লক্ষ বন্দী শিশুর ১০ লক্ষ বাবা-মায়ের হাহাকার ধ্বনি?

ইস্তাম্বুলে মেরিপেতের ঘর নীরব, নিথর। দূরের বাচ্চাদের ঈদের আনন্দ-উল্লাসের প্রবেশ এই ঘরে নিষিদ্ধ। অনুমতি নেই। পার্স থেকে হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ছবি বের করে আনমনে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মেরিপেত। ফুটফুটে চারজন শিশু–বড় ছেলেটার নাম আবদুর রহমান, ওর ছোট আদিলি–তার একমাত্র মেয়ে, বাকি দুজন মুহাম্মাদ আর আব্দুল্লাহ। তুরস্ক আসার পর আরেক ছেলের মা হয় মেরিপেত। ওর নাম আব্দুওলী। আব্দুওলীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় মেরিপেত। ম্লান হাসি হেসে বলে, আমার শেষ ভরসা!

'মাঝে মাঝে মনে হয় শোকে পাগল হয়ে যাব। শুধু বেঁচে আছি এই আশায় যে একদিন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আমি ছুঁয়ে দেখতে পারব আমার বাচ্চাদের।'

ইমিন, মেরিপেত, আয়নুরারা বুঝে গেছে, বাচ্চাদের ছবি, স্মৃতি আর ভিডিওগুলো সযত্নে গোপনে রেখে দিতে হবে। বাকি জীবনটুকু কাটানোর সম্বল কেবল এটুকুই। রেখে দিতে হবে খুব গোপনে। জানতে পারলে হান চাইনিযরা এটুকুও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকুও।

---

[১২৬] China is putting Uighur children in 'orphanages' even if their parents are alive.
The Independent, Staff & Agencies, September 21st, 2018. https://tinyurl.com/ycrdt2go

উইঘুর-কাযাখ এই বাবা-মাদের বুকে কতটা কষ্ট তা আমরা বোধহয় কখনোই বুঝতে পারব না। মাযলুমের কষ্ট আসলে কখনো উপলব্ধি করা যায় না পুরো মাত্রায়। যে যুলুমের শিকার না, সে মাযলুমের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে তার কষ্ট অনুভব করতে পারে না। আমাদের বুক থেকে কেউ আমাদের সন্তানকে, আমাদের ছোট ভাইবোন, ভাগ্নে-ভাগ্নিকে কেড়ে নেয়নি—আমরা কিছুই হারাইনি। তাই উইঘুর বাবা-মায়েদের কষ্ট আমাদের কাছে বিমূর্ত একটা বিষয়। তাদের কষ্টের ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি কেবল একটা ধারণা। একটা অনুমান। একটা আনুমানিক হিসেব। আমরা ধরে নিই, হয়তো উইঘুরদের এতটুকুন কষ্ট পেয়েছে, হয়তো তাদের অমন একটা অনুভূতি হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা তাদের মতো যুলুমের শিকার হচ্ছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কষ্ট আমাদের কাছে স্বরূপে, পরিপূর্ণ মাত্রায় ধরা দেবে না। তারপরও ছোট্ট একটা পরীক্ষা করতে বলছি আপনাদের।

কাজ থেকে বিরতি নিন। ল্যাপটপ, মোবাইল বন্ধ করে চলে যান নিরিবিলি কোনো ঘরে। কিংবা এমন কোথায় যেখানে আপনি স্বস্তি অনুভব করেন। তারপর এই পৃথিবীর যে শিশুটাকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, তার কথা চিন্তা করুন। হতে পারে সে আপনার সন্তান, ভাই, বোন, বোনের সন্তান বা ভাইয়ের সন্তান। চোখ বন্ধ করে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, আপনার সেই আদরের বাবুটাকে একদল পশু ধরে নিয়ে গেছে। যে বাবুটাকে না দেখলে আপনি একরাত ঘুমুতে পারেন না। যে বাবুটাকে নিজ হাতে ভাত খাইয়ে না দিলে, গোসল করিয়ে না দিলে, স্কুলে না নিয়ে গেলে, বিকেলে যার সাথে না খেললে, সাইকেলের পেছনে বা বাইকের সামনে যাকে বসিয়ে রেখে না ঘুরলে আপনার পেটের ভাত হজম হয় না। সেই বাবুটার কোনো খবর নেই। রাতে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে বাবুটা। একা একা জামা পড়তে পারে না, গল্প না শুনে ঘুমোতে না পারা সেই বাবুটার কোনো খোঁজ নেই। আপনি তাকে দেখতে যেতে পারেন না, কোথায় আছে তা জানেন না, জানেন না সে বেঁচে আছে না মারা গেছে...। এ কথাগুলো চিন্তা করে কল্পনায় যে কষ্টটা আপনি পাচ্ছেন এই অল্প সময়টুকুর জন্য, তার চাইতেও শত-কোটি গুণ বেশি কষ্ট, আরও তীব্র আগুন নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে ৫ লাখ বন্দী উইঘুর শিশুর বাবা-মা!

রূপকথার সেই দৈত্যের কথা মনে আছে? ওই যে ফুলবাগানে ঢুকতে দিত না যে শিশুদের। সেই দৈত্যের রাজত্ব এখন পূর্ব তুর্কিস্তানে। সে দৈত্য হলো চীন, তার দলবল ফুলবাগান থেকে ধরে নিয়ে গেছে শিশুদের। বন্দী করেছে কয়েদখানায়। বন্দী করেছে শিশুদের বাবা-মাদের।

শিশুরা নেই তাই পাখিরা চলে গেছে অভিমান বুকে নিয়ে, ফুটতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ফুলেরা, হারিয়ে গেছে প্রজাপতি। ফুলবাগান পরিণত হয়েছে কাঁটাঝোপে, সেই সাথে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়েছে মানুষের সকল সুকুমারবৃত্তি।

তিন.

ছোট্ট খুকিদের প্রতি বরাবরই সবার অন্যরকম একটা ভালোবাসা কাজ করে। চলতি পথে বেণিওয়ালা, গাল ফুলানো ছোট্ট খুকি দেখলে গাল টিপে দেয়নি, বেণি ধরে টান দেয়নি, ভেংচি কাটেনি, নিদেনপক্ষে হাসি দেয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার।

লাইভে আসা খুকিটা ঠিক এ রকমই–প্রত্যেক পুরুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা পিতৃসত্তা যেমন ছোট্ট খুকির স্বপ্ন দেখে। পেছনে টেনে নিয়ে বাঁধা মাঝখানে সিঁথি করা চুল। মায়াভরা কালো চোখ। ওকে যা যেভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল ভিডিওর প্রথম কয়েক সেকেন্ড ঠিক সেভাবে না হলেও চলনসই ভাবে বলে গেল...

আমি আমার বাবাকে মিস করি, ভীষণভাবে মিস করি। আমার...আমার...আমার বাবা নিরপরাধ। আমার বাবা চীনের কারাগারে বন্দী। বাবা খুব ভালোমানুষ, বাবা নিরপরাধ, আমার বাবা খুব ভালো। আমার বাবা...

আর পারল না খুকিটা। কান্না লুকোনোর জন্য দুহাতে ঢেকে ফেলল মুখ। ছোট্ট শরীরটা কান্নার দমকে কেঁপে উঠছিল ভয়ংকরভাবে–পরের কয়েকটা মিনিট কেঁদেই গেল সে। বেশ কয়েকবার বাকি কথাগুলো শেষ করার চেষ্টা করল। পারল না। পাশে বসে থাকা বড়বোন নিজের দিকে টেনে নিল ক্যামেরা। প্রাণপণে আঁসুবৃষ্টিকে ঠেকিয়ে রেখে বলা শুরু করল...

> ‘আমার নাম ফাতিমা ক্বারিম। আমার বাবার নাম কায়সারজান ক্বারিম। আমার বাবা বিন্দু পরিমাণ অপরাধ করেনি। কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে চীন সরকার তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রেখেছে...’

ছোটবোনের মতো ফাতিমাও পারল না কথা শেষ করতে। কষ্টের ঝুম বৃষ্টিতে ভেসে গেল দুজন। এরই মাঝে দুবোন পৃথিবী ভরে যাওয়া হাহাকারে জানাল, ‘প্লিজ, প্লিজ আমার বাবার মুক্তির ব্যবস্থা করুন।’

আবারও অনুরোধ রইল এই ভিডিও দেখার। নির্মম এ বাস্তবতাকে লেখাতে ফুটিয়ে তুলতে আমি অক্ষম–

Heartbreaking Plea From Uyghur Muslim Children Crying For Their Father- https://tinyurl.com/y8rzz9b2

শক্তিশালী সোস্যাল মিডিয়ার এই যুগে লাইভে এসে নিজেদের কষ্টের কথা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে দুই বোন। কিন্তু শেষে এসে ভুল করে ফেলেছে ওরা। কার কাছে বাবার মুক্তির আবেদন জানাল ওরা? কে ওদের বাবাকে মুক্ত করবে? পৃথিবী তো নির্বাসন দিয়ে রেখেছে উইঘুরদের। যেন ওরা এই গ্রহের কেউ না, অন্য কোনো গ্যালাক্সি থেকে নিছক মহাজাগতিক কোনো দুর্ঘটনার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি হিসেবে দুদিনের জন্য এসে থেকে গেছে একেবারে।

বিশ্বমানবতার কথিত ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা জাতিসংঘের দুইটা অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আছে। ইউনেস্কো আর ইউনিসেফ। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের অবসরে ইউনেস্কো শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। ইউনিসেফের কাজকারবার আবার শিশুদের নিয়ে। শিশুদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মননশীলতার বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে তাদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। কোটি কোটি ডলার খরচ করে যাচ্ছে তারা বিশ্বব্যাপী শিশু-কিশোরদের যৌনশিক্ষা দেবার পেছনে। শিক্ষার নামে অ্যানাল সেক্স, ওরাল সেক্স, সমকামিতা আর কনডম ব্যবহার করার মতো বিষয় নিয়ে সেধে সেধে জ্ঞান দিচ্ছে বাচ্চাদের! ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর কারণে কীভাবে শিশুরা অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে, কীভাবে শিশুদের শৈশব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার ওপরও দিব্যি লিখে যাচ্ছে দিস্তার পর দিস্তা।[১২৭]

কিন্তু উইঘুর শিশুদের জন্য এরা কী করছে?

কিচ্ছুটি না, বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটছে। বাবা-মায়ের কাছে থেকে ৫ লাখ শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে কারাগারের মতো বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়েছে চীন। ওদেরকে শেখানো হচ্ছে নিজেদের ধর্ম, ভাষা আর সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে। একদম ছোট বয়স থেকে

---

[১২৭] The War on Children: The Comprehensive Sexuality Education Agenda. Stop CSE. https://tinyurl.com/y7ukou7y

Mali children face increased violence threat from terrorist attacks, UNICEF says. Staff writer with AFP. The Defense Post, August 13, 2019. https://tinyurl.com/u3ay9st

The Latest: UNICEF: Kabul attack on children 'deplorable'. The Associated Press, August 16, 2018. https://tinyurl.com/s9wer6q

Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System. United Nations Office On Drugs and Crime. https://tinyurl.com/woy5yfw

ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে নিজেদের জাতিসত্তা, ক্রমাগত বোর্ডিং স্কুলগুলোতে ব্রেইনওয়াশ করা হচ্ছে ওদের। এতকিছু সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির ফেরি করা মহান ইউনেস্কোর। উইঘুর বাচ্চারা বরফে জমে মারা যাচ্ছে, প্রতিরাতে বাবা-মায়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে ঘুমুচ্ছে, তাতেও মন গলছে না ইউনিসেফের। ওরা দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম দিচ্ছে। হয়তো উইঘুর বাচ্চাদের যৌনশিক্ষার দরকার পড়লে, কনডম কীভাবে পড়তে হয়, অ্যানাল সেক্স, ওরাল সেক্স কী জিনিস, সমকামিতা কীভাবে করতে হয়–এগুলো জানার দরকার পড়লে ঘুম ভাঙবে ইউনিসেফের।

ছোট্ট বাবুটা যখন জমে যাচ্ছিল ঠান্ডায় কী চলছিল ওর মনে? আমরা বলতে পারি না। প্রতিরাতে, প্রতিটি মুহূর্তে মাকে মিস করে কতটা কেঁদেছিল সে? আমরা তা-ও জানি না। আমরা জানি না কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী বাবা-মায়েরা কীভাবে রাতে ঘুমোয়। আমরা জানি না আর কোনো দিন তারা কলিজার ধনকে বুকে জড়িয়ে ঘুমুতে পারবে কি না। পৃথিবীর সকল শীতলতা, সকল নির্মমতা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখে আরামদায়ক উষ্ণতায় ভরিয়ে দিতে পারবে কি না তাদের সোনা মানিকদের।

আবদুর রহিম ইমিন আর একবার জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল তার বাচ্চাদের। মেরিপেত চেয়েছিল তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বলবে, 'বাবা, সবকিছুর জন্য আমি দুঃখিত'।

আব্দুল আযিযের চাওয়া ছিল আরও কম। সে শুধু জানতে চেয়েছিল তার সন্তানেরা বেঁচে আছে না মরে গেছে। এই বাবা-মাদের শেষ ইচ্ছে পূরণ হবে কি না, আমরা জানি না। আমরা জানি না উইঘুরদের শূন্য, নীরব ঘরগুলো আবারও কখনো শিশুদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে কি না। আবারও অভিমান ভেঙে ফিরবে কি না পাখি, প্রজাপতিরা। ডেইযি আর চেরি ফুল আবারো ফুটবে কি না উরুমচি, কাশগড়ে! আমরা কিছুই নিশ্চিত ভাবে জানি না। বলতে পারি না।

তবে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, রহমাতুল্লাহর এভাবে শীতে জমে মারা যাবার জন্য, চীনের বোর্ডিং স্কুলে বন্দী ৫ লাখ উইঘুর শিশুর কান্নার জন্য আমরা নিজেরা দায়ী। আমরা দায়ী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী ৩০ লাখ উইঘুরদের প্রতিটি ফোঁটা রক্তক্ষরণের জন্য।

আমি দায়ী। আপনি দায়ী। আমরা সবাই দায়ী। আমরা সবাই দোষী।

কারণ, আমরা নীরব!

আমরাই এভাবে রহমাতুল্লাকে বরফে জমে মারা যেতে দিয়েছি। আমরা নীরব থেকে চীন সরকারকে সুযোগ করে দিয়েছি আয়নুরা, তারসুন, ইমিন, আব্দুল আযিযদের

কোল থেকে ৫ লাখ শিশু কেড়ে নেয়ার। আমাদের নীরবতাই হান চাইনিযদের সুযোগ দিয়েছে ৩০ লাখ উইঘুর-কাযাখদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে ২১ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ নির্যাতন চালানোর।

মৌজমাস্তি, ক্যারিয়ার, বন্ধু-আড্ডা-গান, প্রেম, মুভি সিরিয়াল আর মাদকের মোহে ভুলে গেছি মানুষ হিসেবে কী দায়িত্ব ছিল আমাদের! এইসব আঁধারের গল্পগুলো শুনলে একটু হয়তো মন খারাপ হয় আমাদের, কিন্তু পরক্ষণেই সেই গ্লানিবোধের জায়গাটুকু দখল হয়ে যায় ভবিষ্যতের সুখচিন্তায়। ডুবে যায় ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার চোরাবালিতে–কীভাবে ভালো রেসাল্ট করতে হবে, ডানাকাটা পরী সেই মেয়েটাকে পটাতে হবে, ভালো বেতনের একটা চাকরি পেতে হবে, বিসিএস ক্যাডার হতে হবে...। আমরা প্ল্যান করি কোথায় খেতে যাব, কোথায় ট্যুর দেবো, কোনো ব্র্যান্ডের ফোন আর পোশাক কিনব... আমরা ভুলে যাই মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে, মানুষ হিসেবে, আমাদের কী দায়িত্ব ছিল। আমরা ভুলে থাকি, ভুলতে না পারলে জোর করে ভুলে যাই। মনের মধ্যে সামান্যটুকু খচখচ বোধও যেন কাজ না করে তার জন্য রুটিন করে চেষ্টা করে যাই। ভুলে থাকার সব সবক হাতেকলমে শিখিয়ে দেন আমাদের পশ্চিমে থাকা চোস্ত ইংরেজিতে নিষ্ক্রিয়তাকে মহিমানিত্ব করা স্কলাররা, কিংবা শাসকদের জন্য অসীমসংখ্যক অজুহাত নিয়ে হাজির হওয়া শায়খেরা।

আমরা ভুলে যাই; কিন্তু সবাই ভুলে যায় না। ক্বিরামান-ক্বাতীবিনের খাতায় ঠিকই লেখা হতে থাকে রহমাতুল্লাহদের বাবা-মায়ের কান্নার প্রতিটি ফোঁটা, বাবাহারা মেয়েদের বাবাকে ফিরে পাবার আকুতি, মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো ছেলের প্রতিরাতের বিভীষিকা; আর লেখা থাকে আমাদের 'স্বার্থপর' কাপুরুষতা, নিষ্ক্রিয়তার ইতিহাস। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ পড়ে না। লেখা থাকে সবকিছু।

একদিন সুবিশাল এক সমাবেশে যখন এই খাতা খোলা হবে–চাওয়া হবে হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে–তখন তার উত্তর দেবার সক্ষমতা কি আমাদের থাকবে?

সপ্তনরক
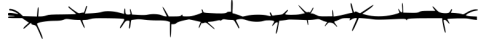
২০ জন মানুষ।[১২৮]

তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ... নানান বয়সের, নানান পেশার। মাথা কামানো, হাতে শেকল। বিশাল বিস্তৃত বিষাদ নিয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে যমদূতের মতো ঝুলে থাকা সিসি ক্যামেরার নিচে। একটু বেআইনি নড়াচড়া করলেই জুটবে কঠোর শাস্তি। ১০ ফিট বাই ১০ ফিট রুমের এক কোণে একটা ছোট্ট পাত্র। এটাই তাদের টয়লেট। দিনে মাত্র একবার ব্যবহার করতে পারে ওরা।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৬টায় দিন শুরু হয় ওদের। সারাদিন যায় চাইনিয ভাষা শেখা, কমিউনিস্ট পার্টির প্রোপ্যাগান্ডা মুখস্থ করা আর নিজেদের কাল্পনিক কাল্পনিক সব পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে। প্রতিনিয়ত নিজেকে ঘৃণার সবক দিতে দিতে। দিনে খাবার জোটে একবার। অল্প একটু বিস্বাদ স্যুপের সাথে এক টুকরো রুটি। ব্যস এটুকুই!

পান থেকে চুন খসার দরকার নেই, ইচ্ছে হলেই ওদের নিয়ে যাওয়া হয় ব্ল্যাক রুমে। নখ উপড়ে ফেলা, ইলেকট্রিক শক দেয়া কিংবা বেধড়ক পেটানো—এগুলো প্রতিদিনের রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ...

পাঠক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি চীনের রিএডুকেশন ক্যাম্পে। নাৎসিদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতোই ভয়াবহ চীনা কমিউনিস্ট সরকারের এই রিএডুকেশন

---

[১২৮] A Million People Are Jailed at China's Gulags. I Managed to Escape. Here's What Really Goes on Inside. David Stavrou. Hareetz, October 18th, 2019. https://tinyurl.com/y6m9kjl4 প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখো।

ক্যাম্পগুলো।[১২৯] যেখানে উঠে এসেছে যেন পৃথিবীর বুকে এক টুকরো নরক। যেখানে মনুষ্যত্ব, দয়া-মায়া সবকিছু ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে চাইনিযরা পাল্লা দিচ্ছে এক নারকীয় খেলায়—কে নিষ্ঠুরতায় আরও নিচে নামতে পারে!

কুকুর বিড়ালের সাথে মানুষ যেমন আচরণ করে, ক্যাম্পগুলোতে তেমন আচরণও জোটে না উইঘুর মুসলিমদের কপালে। পানির মতো টাকা খরচ করে খুব সাজানো-গোছানোভাবে বাকি বিশ্বের কাছ থেকে একবিংশ শতাব্দীর এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের খবর গোপন রেখেছে চীনা সরকার। আমরা আগেই আলোচনা করেছি এ নিয়ে।

বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসা এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোর খবর খুব অল্পই জানতে পেরেছে বিশ্ববাসী। হাতেগোনা কয়েকজন তুলনামূলক ভাগ্যবান মানুষ দুঃস্বপ্নের প্রহর কাটিয়ে বেঁচে ফিরতে পেরেছে, তার চাইতেও কমসংখ্যক মানুষ মুখ খুলেছেন গণহত্যা আর জাতিগত নিধনের এই নতুন কসাইখানার বিরুদ্ধে। এ লেখাতে আমরা এমনই একজন মানুষের মুখ থেকে শুনব আসলে ঠিক কী ঘটেছে পূর্ব তুর্কিস্তানের ৩০ লক্ষ মুসলিমদের ভাগ্যে!

সাইরাগুল সাউতাবাইয়ের বয়স ৪৩। রিএডুকেশন ক্যাম্পে যাবার আগে শিক্ষকতা করতেন। অন্য উইঘুর মুসলিমদের তুলনায় তার ভাগ্য অবশ্য কিছুটা ভালো ছিল। রিএডুকেশন ক্যাম্পেও তিনি শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। নিজে অত্যাচার- নির্যাতন সহ্য তো করেছেনই, সেই সাথে একদম কাছ থেকে দেখেছেন চাইনিয, বিশেষ করে হান চাইনিযদের নিষ্ঠুরতা। ক্যাম্প থেকে মুক্তি পাবার পর সুইডেনে এসাইলাম (আশ্রয়) নিয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে সেখানেই তার তিনবার দেখা হয়। ক্যাম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছি আমরা, ভয়ের হিমশীতল স্রোত বয়ে গিয়েছে মেরুদণ্ড বেয়ে। হুহু করে উঠেছে বুক। একে একে সব বলে গেছেন সাইরাগুল। ধর্ষণ, অত্যাচার, খাবারের কষ্ট, ক্যাম্পের রক্ষীদের জানোয়ারের মতো ব্যবহার... অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে তার দুচোখ বেয়ে...

ভূমিকা অনেক হলো। এবার চলুন যাই সাইরাগুল সাউতবাইয়ের কাছে। তার মুখ থেকেই সরাসরি শোনা যাক মারণোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ।

আমার বয়স ৪৩। চীন কাযাক বর্ডারের মংগল্কুরে (Mongolküre) আমি বেড়ে উঠেছি। মেডিকেলে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে বেশ কিছুদিন একটা হাসপাতালে কাজ

---

[১২৯] Muslim released from a Chinese Concentration Camp, 2020. #Uyghurs- https://tinyurl.com/y4eamukc । (ছোট্ট একটি ভিডিও। দেখার অনুরোধ রইল।)

করেছিলাম। তারপর সরকার আমাকে দায়িত্ব দিলো ৫টা কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালনা করার। স্বামী আর দুই সন্তান নিয়ে বেশ চলছিল আমার জীবন। তবু আমরা প্ল্যান করছিলাম পাশের দেশ কাযাখস্তানে গিয়ে সেটেলড হবার। বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে যাবার পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু টুকটাক ঝামেলা, আলসেমির কারণে হয়ে উঠছিল না। জীবন বেশ ভালোই চলছিল আমাদের। কিন্তু হঠাৎ একদিন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

তথাকথিত 'তিন শয়তান' 'সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ আর উগ্রবাদ' এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সরকার।[১৩০] প্রথম কোপটা এসে পড়ল আমাদের অর্থাৎ উইঘুর মুসলিমদের ওপর। ২০১৪ সালের দিকে শুরু হলো সরকারি চাকরিজীবীদের পাসপোর্ট জমা নেয়া। পাসপোর্ট জমা দিলাম আমি। আর ফেরত পেলাম না।

দুই বছর পর জমা নেয়া হলো সব উইঘুর মুসলিমের পাসপোর্ট। সৌভাগ্যক্রমে দুই সন্তানকে নিয়ে এর আগেই কাযাখস্তানে চলে যেতে পেরেছিল আমার স্বামী। আমি কাযাখস্তানে যাবার ব্যাপারে আবেদন করেছিলাম। আজ আসবে কাল আসবে করে এক্সিট ভিসা আর আসেনি।

২০১৬ সাল থেকে শুরু হলো আসল খেলা। রাত-বিরাতে পুলিশ হামলে পড়ত মুসলিমদের বাড়িতে। গোপনে যাকে খুশি তাকে ধরে নিয়ে যেত। প্রত্যেকটা রাত আসত নতুন নতুন দুঃস্বপ্ন নিয়ে। বাতাসে কুটিল সন্দেহ, জনমনে অস্থিরতা, চাপা আতঙ্ক। পাবলিক প্লেইসগুলোতে দুধাপ পরপর যেন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হলো। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে ঘুরে বেড়াত পুলিশ। উইঘুরসহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের সিমকার্ড কেড়ে নিল সরকার। একদিন আমাদের মিটিং করার জন্য ডাকল সিনিয়র সিভিল সারভেন্ট। ১৮০ জনের মতো গেলাম আমরা–স্কুল এবং হাসপাতালের কর্মচারীরা। রোবটের মতো যান্ত্রিক কণ্ঠে একজন পুলিশ অফিসার পড়ে শোনাল, 'এই অঞ্চলকে স্থিতিশীল করার জন্য খুব শীঘ্রি সরকার রিএডুকেশন সেন্টার খুলতে যাচ্ছে।'

২০১৭ সাল থেকে প্রকাশ্য অ্যাকশনে নেমে গেল পুলিশ। যাদের আত্মীয়স্বজনদের একজন হলেও বিদেশে আছে এমন উইঘুরদের গ্রেফতার করতে শুরু করল। একদিন চলে এল আমার পালা। মধ্যরাতে দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙল। এমনভাবে কড়া নাড়ছিল, বোধহয় দরজা ভেঙেই ফেলতে চায়। দরজা খুলতে যা দেরি, সাথে সাথে কালো কাপড় দিয়ে আমার চোখ বেঁধে ফেলল ওরা।

---

[১৩০] *'খুন রাঙা পথ'* দ্রষ্টব্য

চোখ খোলার পর নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাতলবিহীন একটা কাঠের চেয়ারে। চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধেছে আমাকে ওরা। চোখের সামনে ঝুলছে শক্তিশালী বাতি। বাতিটা হালকা দুলছে। সেই আলোয় একজন পুলিশ অফিসারের ছায়া লম্বা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলাম। কঠোর চেহারার পুলিশ অফিসারেরা একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে–আপনার স্বামী, সন্তান কোথায়? কেন ওরা এ দেশ ছেড়ে গেছে?... কোনো উত্তরেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল না ওরা। দীর্ঘ সময় ধরে চলল জিজ্ঞাসাবাদ। তারপর আমাকে হুকুম দিলো স্বামীকে ফোন করে কাযাখস্তান থেকে চলে আসতে বলতে। জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে টুঁ শব্দটি করলে ফল ভালো হবে না, এই বলে শাসিয়ে তখনকার মতো মুক্তি দিলো।

যারা চীনে ফেরত আসে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে পাঠানো হয়। আমি এ রকম ঘটনা অনেক শুনেছিলাম। আমার স্বামী, সন্তানের সাথে যোগাযোগ রাখলে তাদেরও একই পরিণতি বরণ করতে হবে ভেবে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। বাচ্চাদের সাথে কত দিন যে কথা বলা বন্ধ করে রেখেছিলাম! কষ্টে আমার পাগল হয়ে যাবার দশা! কিন্তু কীই-বা করার ছিল তখন!

একা একাই দিন কাটাতে থাকলাম। আমার স্বামী, সন্তানরা ফেরত না আসায় প্রশাসন ক্ষেপে গেল আমার ওপর। ঘনঘন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে রাত-বিরাতে তুলে নিয়ে যেতে লাগল। একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ চাপাতে শুরু করল। আমার ওপর দিয়ে কী ঝড় যে বয়ে চলেছিল সেই সময়! প্রতিদিন সকালে উঠে নিজেকে সাহস জোগাতাম–পরিস্থিতি যা-ই হোক, শক্ত করে জমে থাকতে হবে। আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতাম এখনো বেঁচে আছি বলে।

২০১৭ সালের নভেম্বর। শহরতলির এক ঠিকানা দিয়ে আমাকে বলা হলো ওখানে রিপোর্ট করতে। ওখানে গিয়ে নির্দিষ্ট একটা ফোন নম্বরে মেসেজ দিয়ে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গেলাম। মেসেজ দিলাম। যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো শক্তপোক্ত দয়ামায়াহীন ৪ জন পুলিশ। যন্ত্রের মতো কাজ করে গেল ওরা। কালো কাপড় আমার মাথায় প্যাঁচালো। তারপর হাত-পা বেঁধে তুলে ফেলল গাড়িতে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ওরা আমার চোখের বাঁধন খুলল। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে এসেছে ওরা। কেমন গুমোট গা ছমছম করা পরিবেশ। বুঝলাম এই সেই রিএডুকেশন ক্যাম্প–যার নিয়ে মানুষের এত আতঙ্ক।

আমাকে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে হুকুম করা হলো, এখানে সাইন করো।

কাগজের দিকে একপলক তাকিয়েই ভয়ে শিউরে উঠলাম। আতঙ্কে শিরশির করে উঠল পুরো শরীর। মনে হলো আমি যেন কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি। ঘুম থেকে জেগে উঠলেই সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কাগজের হরফগুলো জ্বলজ্বল করে পিশাচের হাসি হাসছিল। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না নিজের চোখকে। কাগজের ভাষ্য অনুসারে, আমাকে চীনা ভাষা শেখাতে হবে, অন্য বন্দীদের সাথে কোনোমতেই কথা বলা যাবে না, ঘুণাক্ষরেও হাসা বা কাঁদা যাবে না, প্রশাসন ছাড়া অন্য কারও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে না! যদি কোনো একটা কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে না পারি বা ওদের আইন মেনে না চলি, তাহলে আমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

মনের ভেতর থেকে বারবার কে জানি সতর্ক করে দিচ্ছিল এখানে সাইন করিস না। কিন্তু আমি নিরুপায়, সাইন করতেই হলো। ক্যাম্পের বন্দীদের জন্য নির্ধারিত ইউনিফর্ম দেয়া হলো আমাকে। তারপর নিয়ে যাওয়া হলো আমার জন্য বরাদ্দকৃত কামরায়। খুব ছোট্ট একটা রুম। কংক্রিটের বিছানার ওপর প্লাস্টিকের হালকা তোশক বিছানো। রুমের চার কোনায় চারটা সিসি ক্যামেরা। পাঁচ নম্বরটা মাঝখানে।

অন্য বন্দীদের ভাগ্য আমার মতো এত ভালো ছিল না। ১৬ স্কয়ার মিটারের ছোট্ট রুমে গাদাগাদি করে ২০ জনের মতো বন্দীকে থাকতে দেয়া হতো। রুমের সিলিঙে সিসি ক্যামেরা তো ছিলই, রুমের বাইরে করিডোরেও ঝুলে থাকত সিসি ক্যামেরা।

প্রত্যেকটা সেলে থাকত একটা করে ছোট্ট প্লাস্টিকের বালতি। এটাই ছিল সেই হতভাগ্য ২০ জন মানুষের টয়লেট। একজন বন্দী দিনে মাত্র একবার দুই মিনিটের জন্য ‘টয়লেট’ ব্যবহার করার সুযোগ পেত। যদি বালতি ভরে যেত, তাহলে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। দিনে মাত্র একবার এই বালতি খালি করা হতো।

প্রত্যেক বন্দীর মাথা কামিয়ে ফেলা হয়েছিল। ইউনিফর্মের কথা তো আগেই বলেছি। সবার হাতে এবং পায়ে শেকলও পরানো থাকত। এমনকি রাতে ঘুমানোর সময়েও। শুধু ক্লাসে লেখার সময় হাত শেকলমুক্ত থাকত। ডান কাত হয়ে শুয়ে ঘুমাতে হতো। কেউ যদি পাশ ফিরত, তাহলেই কপালে জুটত কঠোর শাস্তি।

উইঘুর বা কাযাখদের চাইনিয ভাষা শেখানোর দায়িত্ব ছিল আমার। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রোপাগ্যান্ডামূলক গান। সারাদিন আমাকে ওদের সঙ্গে কাটাতে হতো।

ক্যাম্পে দিন শুরু হতো সকাল ৬টায়। পেটে খুব সামান্য নাশতা চালান করেই চাইনিয শেখানোর ক্লাস শুরু করে দিতে হতো। তারপর আরেকবার রিভিশন দেয়া হতো ক্লাসের পড়াগুলো। একটা পিরিয়ড ঠিক করে রাখা ছিল প্রোপাগান্ডা সংগীত শেখার জন্য। পোস্টার দেখে দেখে বন্দীদের স্লোগান দিতে হতো:

আমি চীনকে ভালোবাসি,

কমিউনিস্ট পার্টিকে আন্তরিক ধন্যবাদ,

আমি চাইনিয, আমি আমার প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ভালোবাসি...

বিকেল এবং সন্ধ্যা বরাদ্দ ছিল বন্দীদের ‘অপরাধ স্বীকারোক্তি’ এবং ‘অনুতপ্ত হবার’ জন্যে। বন্দীদের তাদের আগেকার পাপের কথা স্মরণ করতে বাধ্য করা হতো।

কী সেই পাপ?

প্রায় সবকিছুই... চীনা ভাষা না জানা, ইসলামের কোনো নিয়মকানুন মেনে চলা, চীনা সংস্কৃতি না জানা, উইঘুর কিংবা কাযাখ সংস্কৃতি পালন করা–সবকিছুই অপরাধ।

যেসব বন্দীরা চীনা ভাষা না জানা বা ইসলাম পালন করাকে গুরুতর পর্যায়ের ‘অপরাধ’ ভাবত না, তাদের জন্য থাকত স্পেশাল দাওয়াই। অনেকে তো মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য বানিয়ে বানিয়ে পাপের কথা বলত!

রাতের খাবারের পরে আবার বসতো পাপ স্বীকারের এই অমানবিক আসর। খাবার পর দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলে দাঁড়াতে হতো বন্দীদের। তারপর নিজেদের ‘অপরাধ’ নিয়ে আবার ভাবতে হতো আমাদের! নিজেকে ধিক্কার দিতে হতো...

ছি! ছি! আমি কত খারাপ!

আমি ইসলাম মানি! আমি মুসলিম! ছি ছি ছি!

রাত দশটা পর্যন্ত চলত এ রকম।[১৩১] অপরাধ স্বীকারের এই নিষ্ঠুর খেলা এখানেই শেষ না। রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত চলত সারাদিনের স্বীকারোক্তি দেয়া পাপগুলো লেখার কাজ। খুঁটিনাটি সব লিখে ফেলে তোড়া তোড়া কাগজ জমা দিতে হতো গার্ডদের। সকাল ৬টায় শুরু হওয়া দিন চলত মধ্যরাত পর্যন্ত। তারপর বন্দীদের ঘুমানোর ফুরসত মিলত পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে অবশ্য কোনো বন্দীকে পাহারা দেবার দায়িত্ব নিতে হতো।

---

[১৩১] অনেক ক্যাম্পেই স্থানীয় পুলিশের সদস্য, বিচারক বা সরকারি কর্মকর্তারা গেস্ট লেকচারার হিসেবে ক্লাস নিতে যায়। লেকচারে বন্দীদের বারবার মনে করিয়ে দেয় ইসলাম পালন করা কতটা বিপজ্জনক। প্রশ্ন করা হয় বন্দীদের, কোনটা মানেন আপনারা, চীনের আইন নাকি শরীয়াহ? অনেক বন্দী জানিয়েছেন কুরআন শেখা, হিজাব পরা, বাচ্চাদের কুরআন শেখানো, বাচ্চাদের ইসলামী নাম রাখা, শুক্রবার ছাড়া অন্য দিন মসজিদে নামায পড়তে যাবার জন্য এভাবে নিজেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে স্বীকারোক্তি দিতে হতো। বলতে হয়, ‘আমি অবৈধ কাজ করেছি।’ China’s mass indoctrination camps evoke Cultural Revolution, Gerry Shih. Associated Press, May 18th, 2018. https://tinyurl.com/wmpk8f4

একদম কাঁটায় কাঁটায় সঠিক সংখ্যাটা বলতে পারব না, তবে প্রায় আড়াই হাজারের মতো বন্দী ছিল সেই ক্যাম্পে। সবচেয়ে বয়স্ক যে বন্দীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তিনি ছিলেন প্রায় ৮৪ বছরের এক বৃদ্ধা। সর্বকনিষ্ঠ বন্দী ছিল ১৩ বছরের এক বালক। সব বয়সের, সব শ্রেণি-পেশার মানুষজন ছিল সেখানে—স্কুলছাত্র, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, লেখক, সাহিত্যিক, ডাক্তার, নার্স, চিত্রশিল্পী, জীবনে কখনো শহরের মুখ না দেখা গ্রামের একদম সাধারণ নিরীহ কৃষক।

আমি কোন ক্যাম্পে ছিলাম সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু আসলে বলতে পারব না। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চোখ বেঁধে, আগেই বলেছি। ক্যাম্পের বাইরে বের হবার কোনো সুযোগ কখনো পাইনি। তবে যতদূর মনে পড়ে, সেগুলো নতুন তৈরি করা বিল্ডিং ছিল। প্লাস্টার ছাড়া রুম আর কংক্রিটের জঞ্জালে ভরা ছিল পুরো ফ্যাসিলিটি। রুমগুলো ছিল স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা। অন্য বন্দীর সঙ্গে কথা বলা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কেবল ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া বাদবাকি পুরো সময় পুরুষ এবং মহিলারা আলাদা আলাদা থাকত। সব সময়, সব জায়গায়, সব পরিস্থিতিতে কড়া চোখে সবকিছু নজরদারি করত গার্ড।

খাবার-দাবারের ব্যাপারে আসি। আমাদের তিনবেলা খাবার দেয়া হতো। পানির মতো পাতলা ভাত বা সবজির স্যুপ এবং চাইনিয রুটির ছোট্টো একটা টুকরা। মাংস অবশ্য দেয়া হতো শুক্রবারে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, শূকরের মাংস দেয়া হতো। প্রত্যেক বন্দী শূকরের মাংস খেতে বাধ্য ছিল। 'আমি মুসলিম, আমি শূকরের মাংস খাব না', না কক্ষনো হবে না। শূকরের মাংস খেতেই হবে। অন্যথায় দুনিয়ার জাহান্নাম থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হবে আপনাকে। খাবারের অবস্থা এমন ছিল, মুখে দিলেই বমি করে দিতে ইচ্ছে করবে। ঘুমানোর পর্যাপ্ত সময় ছিল না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কোনো বালাই ছিল না। ফলে যা হবার তা-ই হতো। একে একে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ত বন্দীরা। মনে হতো যেন একদল জীবন্ত লাশ হেঁটে বেড়াচ্ছে।

ক্যাম্পে আলাদা একটা রুম ছিল বন্দীদের নির্যাতনের জন্য। একে বলা হতো ব্ল্যাকরুম। কালো ঘর। এ রুমের নাম মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ ছিল। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যা ভাবতে পারে আর যা ভাবতে পারে না, সব রকম শাস্তির ব্যবস্থাই ছিল সেখানে। বন্দীদের দেয়ালে ঝুলানো হতো। তারপর ইলেকট্রিক বেত দিয়ে পেঠানো হতো সপাং সপাং করে। পেরেকভর্তি চেয়ারের[১৩২] ওপর বসিয়ে রাখা হতো ঘণ্টার

---

[১৩২] নির্যাতনের জন্য ক্যাম্পে এক বিশেষ ধরনের ইলেক্ট্রিক চেয়ার আছে। এটাকে টাইগার চেয়ার বলা হয়। ক্যাম্পফেরত উইঘুর নারী মিহিরগুল তারসুন এই টাইগার চেয়ারে নিজের অত্যাচারিত হবার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে, ' টাইগার চেয়ারে বসানোর জন্য টর্চার রুমে নিয়ে গেল ওরা একদিন।

পর ঘণ্টা। প্ল্যায়ারস দিয়ে টেনে তুলে ফেলা হতো নখ। অনেক মানুষকে দেখেছি আপাদমস্তক রক্তে মাখামাখি হয়ে ব্ল্যাকরুম থেকে বের হতে।

একটু এদিক-সেদিক হলেই বন্দীদের ডাক পড়ত ব্ল্যাকরুমে।

আইনকানুন পালন করতে গড়িমসি করছে?

ডাকো ব্ল্যাকরুমে।

চাইনিয শিখছে না? স্লোগানটা যথেষ্ট জোরে চিৎকার করে বলছে না?

ধরে নিয়ে এসো ব্ল্যাক রুমে... পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলি!

কালেভদ্রে নয়, প্রত্যেকদিন ব্ল্যাকরুমে বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালানো হতো। আপনাদের একজন বৃদ্ধার ঘটনা শোনাই। এই বৃদ্ধা ক্যাম্পে আসার পূর্বে মেষ চরাতেন। তাকে কোন অপরাধে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল জানেন? সহজ সরল এই বৃদ্ধা নাকি বিদেশে থাকা কোন এক আত্মীয়ের সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন। এটাই ছিল তার অপরাধ! এ কারণেই তাকে ধরে নিয়ে আসা।

অথচ মহিলা কখনোই কারও সাথে ফোনে কথা বলেননি। এই গ্রাম্য, অর্ধশিক্ষিত বৃদ্ধার শুধু যে ফোন নেই তা না; বরং ফোন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটাই তিনি জানেন না। অথচ তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে কাল্পনিক ফোনালাপের হাস্যকর অজুহাতে!

অপরাধ স্বীকারোক্তির খাতায় নিজের অপরাধ লেখার জন্য এই বৃদ্ধাকে জোরাজুরি করে রক্ষীরা। উনি লেখেন, 'বিদেশে ফোন করার যে অভিযোগ আমার নামে আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। এমন কিছু কখনোই হয়নি।'

লেখা শেষ হতে যা দেরি, টেনেহিঁচড়ে এই বয়স্ক মানুষটাকে ব্ল্যাকরুমে নিয়ে যাওয়া

পুরো রুমে আসবাবপত্র বলতে একটা চেয়ার। মাথার ওপর একটা শেডওয়ালা লাইট ঝুলছে। দেয়ালে চামড়ার বেল্ট, চাবুক থরে থরে সাজানো। চেয়ারে বসানো হলো আমাকে। তারপর একটা বাটন চাপল একজন অফিসার। ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে হাত-পা শক্তভাবে আটকে গেল চেয়ারের সাথে। একজন এসে হেলমেটের মতো কিছু একটা গলিয়ে দিলো আমার মাথায়। এরপর শুরু হলো কারেন্টের শক দেওয়া। প্রত্যেকবার ওরা সুইচ চাপছিল আর আমার পুরো শরীর তীক্ষ্ণ ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার প্রত্যেকটা অণু-পরমাণুতে কেউ বিষাক্ত সুচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই কষ্ট সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক সহজ। ওদের কাছে কাকুতিমিনতি করলাম–দয়া করে আমাকে মেরে ফেলো, আমার ওপর একটু দয়া করো, আমাকে মেরে ফেলো।' ৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ Hongkong Free Press-এ প্রকাশিত ভিডিও- Video: In Full – Ex-Xinjiang detainee Mihrigul Tursun's full testimony at the US congressional hearing - https://tinyurl.com/u4mwf7g

হলো। যখন ফিরে এলেন, দেখলাম রক্ত-মাংসের একটা দলা হেঁটে আসছে। কোনো হাতের নখ নেই, সবগুলো উপড়ানো। গায়ের চামড়া এখানে সেখানে ছিলে ফেলা হয়েছে।

এক রাতে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সেই ভয়াল রাতে প্রায় ৭০ জন নতুন বন্দীকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন অতিবৃদ্ধ এক ভদ্রমহিলা। তড়িঘড়ি করে ধরে আনা হয়েছিল তাকে, জুতো পরার সময়ও দেয়া হয়নি। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। অনুনয়-বিনয় করলেন, ‘আমাকে বাঁচাও, দয়া করে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও আমাকে।’ আমি পুরো সময় নীরব ছিলাম। তার আলিঙ্গনেও কোনো সাড়া দিইনি। কিন্তু এতে কী যায় আসে চাইনিয পিশাচগুলোর! আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম মারা মারল। দুই দিন একফোঁটা পানিও খেতে দিলো না।

একটানা অনেক কথা বলার পর থেমে গেলেন সাউতাবাই। অশ্রুর অঝোর ধারা গড়িয়ে পড়ছে তার দুগাল বেয়ে। নীরবে।

আমাদের বুকের মাঝেও সেই কখন থেকে টুপটাপ বৃষ্টি ঝরছে টের পাইনি একদম। গাঢ়, গভীর বিষাদময় নীরবতা নেমে এল ঘরের মাঝে।

চীনের তথাকথিত রিএডুকেশন ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফেরা অন্যান্য বন্দীদের কথাই যেন অনুরণিত হচ্ছিল সাউতাবাইয়ের কথায়। মোটামুটি সব বন্দীর অভিজ্ঞতা একই রকম। ক্যাম্পফেরত উইঘুর নারী যুমরাত বলছেন,

‘এক তরুণীর গায়ে চীনা গার্ড প্রস্রাব করে দিয়েছিল।

...তোরা মুসলিমরা অযু করিস না? নে এবার এটা দিয়ে অযু কর।

প্রস্রাব করার পর কুকুরের মতো খেঁকিয়ে উঠেছিল চীনা গার্ড।’[১৩৩]

খুব নির্মম ঘটনা ঘটে যুমরাতের নিজের সাথেই। এক বন্দীকে তার ভাগের রুটি দিয়েছিলেন যুমরাত। চীনা গার্ড সেটা দেখে ফেলে। তড়িৎগতিতে ছুটে এসে যুমরাতকে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে। অসহায় আর্তনাদ বের হয় যুমরাতের গলা থেকে–ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!

---

[১৩৩] DOAM - Documenting Oppression Against Muslims ফেইসবুক পেইজে ১৭ মে ২০২০ সালে প্রকাশিত ভিডিও সাক্ষাৎকার, #Uyghur Muslim woman urinated on and asked to do wudu (ablution) by Chinese guard in a concentration camp. Testimony of Chinese Concentration Camp Survivor Zumrat Dawut #Uyghurs, https://tinyurl.com/yymnvpoz

বিদ্রুপের তুবড়ি ছোটাতে শুরু করে চীনা গার্ড।

> *ডাক, ডাক তোর আল্লাহকে। বেশি করে ডাক। ডেকে বল তোর আল্লাহ যেন আমার হাত থেকে তোকে এখন উদ্ধার করে![১৩৪]*

নীরবতা ভেঙে আবার মুখ খুললেন সাউতাবাই। এরই মধ্যে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছেন।

২০১৮ সালের মার্চে কোনো ধরনের আগাম ঘোষণা ছাড়াই আমাকে মুক্তি দেয়া হলো ক্যাম্প থেকে। সেই একই ফিল্মি স্টাইলে হাত, পা, চোখ বেঁধে গাড়িতে তোলা হলো। তারপর আমার বাড়ির সামনে রেখে এল ওরা।

আমাকে আগের চাকরিতে বহাল করা হলো। পাঁচটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পরিচালকের চাকরি। যাবার সময়, 'ক্যাম্পের ব্যাপারে মুখ খুলে নিজের বিপদ ডেকে এনো না' বলে শাসিয়ে গেল।

ক্যাম্প থেকে ফিরে চাকরিতে যোগ দেয়ার তিন দিনের মাথায় আমাকে চাকরিচ্যুত করা হলো। আবার জেরা করতে নিয়ে গেল। এবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলো আমার বিরুদ্ধে, সেই সাথে বিদেশি মানুষজনের সাথে যোগাযোগের গুরুতর অভিযোগ! শুকনো কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে ওরা বলল, 'তোমার মতো বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটা জায়গাই উপযুক্ত–রিএডুকেশন ক্যাম্প।' রায় হলো, এবারে আমি ক্যাম্পে অন্যান্য সাধারণ বন্দীর মতোই থাকব... এক থেকে তিন বছর।

ক্যাম্পে যাবার আগে বাসায় আসার সুযোগ দেয়া হলো আমাকে। ক্যাম্পের ভয়ংকর স্মৃতিগুলো আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল প্রতিনিয়ত। আর কোনোভাবেই সেখানে ফিরতে চাচ্ছিলাম না। আমি অনেক কিছু হারিয়েছি। এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব আমি। আর আমার হারানোর কিছু নেই। ওরা আমার কাছ থেকে আর কিছুই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, মরলে মরবই, তবে ক্যাম্পে ধুঁকে ধুঁকে শেয়াল কুকুরের মতো নয়।

---

[১৩৪] DOAM - Documenting Oppression Against Muslims ফেইসবুক পেইজে ১২ মে ২০২০ সালে প্রকাশিত ভিডিও সাক্ষাৎকার, Chinese Guard: "Call Your God, Tell Him To Save You Right Now From My Hand" Concentration camp survivor Zumret Dawut was severely beaten for sharing her food with another detainee. - https://tinyurl.com/y5sr7clc

অনেক চিন্তাভাবনা করে ওদের হাত থেকে পালানোর ছক কষলাম। ধরা পড়ার ঝুঁকি আছে অবশ্য কিছুটা, আমার ফ্ল্যাটের ঠিক বাইরেই পুলিশ স্টেশন। আর আমার কাছে পাসপোর্টও নেই। কিন্তু আমার আর কিছু করার নেই, ঝুঁকি নিতেই হবে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

বাসার জানালা গলে বাইরে চলে আসলাম। নামলাম পাশের বাড়িতে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কাযাখস্তানের সীমান্তে। পুলিশ বুঝতেই পারেনি আমি পালিয়েছি। সীমান্তরক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে গেলাম কাযাখস্তানে। অনেক খুঁজে বের করলাম আমার পরিবারকে। অনেক কাঠগড় পুড়িয়ে শেষমেশ সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলাম।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে হঠাৎ থেমে গেলেন সাউতাবাই। আবারও নীরবতা নেমে এল। অশ্রু মেশানো যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন হয়তো সেই পথের কথাই সাউতাবাই ভাবতে লাগলেন আনমনে।

সাইরাগুল সাউতাবাইয়ের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সুইডেনের চাইনিয দূতাবাসের মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। ওরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ‘সাউতাবাইয়ের কথা একেবারেই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। চীনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার হীন চেষ্টা। ওই মহিলা কখনোই পূর্ব তুর্কিস্তানের কোনো ভোকেশনাল এডুকেশন সেন্টারে কাজ করেনি, চীন ত্যাগ করার পূর্বে কখনোই তাকে বন্দী করা হয়নি। বরং সে অবৈধভাবে চীন থেকে পালিয়েছে। আর সাইরাগুল সাউতাবাই একজন ঋণখেলাপি। তার কাছ থেকে চাইনিয সরকার প্রায় ৪৬ হাজার ডলার পায়।’

নাক টেনে, গলা খাঁকারি দিয়ে আবার কথা বলা শুরু করলেন সাউতাবাই। কঠিন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হিমশীতল কণ্ঠ–যেন অন্য কোনো দুনিয়া থেকে ভেসে আসছে। ‘আমি কক্ষনোই ক্যাম্পের স্মৃতি ভুলতে পারব না। অসহায়, নিরপরাধ বন্দীদের সাহায্যের আকুতিভরা চোখের চাহনি আজীবন আমাকে পোড়াবে।

চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া ক্যাম্পে তাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি আমি। আমি এখন তাদের কণ্ঠস্বর হব।’ ধিক করে যেন আগুন জ্বলে উঠল সাউতাবাইয়ের দুচোখে। ‘চিৎকার করে পুরো বিশ্বকে জানিয়ে দেবো, চীনা শুয়োরগুলোকে থামানোর জন্য অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের কিছু করতে হবে। রিএডুকেশন ক্যাম্পগুলোতে যা হচ্ছে তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। মানবতা সেখানে প্রতিনিয়ত গুমরে গুমরে কাঁদে। সেখানকার বন্দীরা প্রতিরাতে ঘুমাতে যায় নিজেদের মৃত্যু কামনা করে।’

দংশন
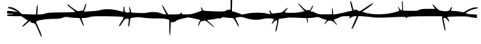
ইস্তাম্বুলের পাথুরে রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে সুদর্শন এক যুবক। ঝাড়া ছ ফুট লম্বা। ব্যায়াম করা পেটানো শরীর। ব্ল্যাক অয়েলস্কিন জ্যাকেটের নিচে ঢাকা থাকলেও মাসলের অবস্থান স্পষ্ট। ব্যস্ত পথচারীদের কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছে ওকে। তারপর যে যার পথে চলে চাচ্ছে। কোনো দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যুবকের। নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে ওকে পৌঁছাতে হবে নির্ধারিত সময়ে। রোলেক্সের হাত ঘড়িটার ওপর একবার চোখ বুলাল সে। আর ৫ মিনিট বাকি। হাঁটার গতিটা একটু বেড়ে গেল যুবকের। হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক ধুকপুক করছে অনেকক্ষণ থেকেই। মনে জোর আনার চেষ্টা করল ও। জানে না কী অপেক্ষা করে আছে তার জন্য! কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

পাঠক, আপনিও ডেকে নিন আল্লাহকে। কারণ সামনে যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনতে যাচ্ছেন, মনে হয় না তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি আপনার আছে।

ওক গাছের নিচে পার্কের বেঞ্চে হেলান দিয়ে আনমনে বসে আছেন মধ্যবয়স্ক এক লোক। চোখে চশমা। মাথার মাঝ বরাবর চুল কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে। লোকটার দিকে চোখ পড়তেই হাঁটার গতি আরও দ্রুত হলো যুবকের। এতক্ষণে আনমনে বসে ছিলেন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। যুবক কাছাকাছি হতেই খেয়াল করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন নার্ভাস ভঙ্গিতে। শেষ কয়েকটা ধাপ লম্বা পা ফেলে অতিক্রম করল যুবক। হাত বাড়িয়ে দিলো মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে।

‘আব্দুওলী?’

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। আগন্তুক যুবক এবার পরিচয় দিলো নিজের, 'আমি স্টিভ চাও, আল জাজিরার সাংবাদিক। আমার সাথেই দেখা করার কথা ছিল আপনার।'[১৩৫]

আব্দুওলী থাকতেন কাশগড়ে। চীনের পূর্ব তুর্কিস্তানে। চীন সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে ইস্তাম্বুল পালিয়ে আসার আগ পর্যন্ত বাচ্চাদের উইঘুর ভাষা শেখাতেন।

উইঘুরদের ভাষা খুবই মধুর আর পুরোনো। প্রায় ১,৫০০ বছরের পুরোনো। অনেক সুন্দর সাহিত্য লেখা হয়েছে এই ভাষায়। আব্দুওলী তার পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন বাচ্চাদের উইঘুর ভাষা শেখানোর কাজে। কিন্তু হঠাৎ করেই স্কুলে আসা বন্ধ করে দিলো বাচ্চারা। সরকার উইঘুর ভাষা শেখানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। স্কুল বন্ধ হলো আর আব্দুওলীকেও ধরে নিয়ে গেল ওরা কারাগারে। ১৫ মাস উরুমচির তিনটি ভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কাটাতে হয় আব্দুওলীকে। নিজে তো অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, সেই সাথে খুব কাছ থেকে দেখেছেন উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীন পুলিশের চালানো বর্বরতা। ইস্তাম্বুলে পালিয়ে এসে এখন তিনি ক্যাম্পেইন করছেন চীনের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বিরুদ্ধে।

'কেমন আছেন?' সাংবাদিক স্টিভ চাও জিজ্ঞাসা করলেন।

দীর্ঘশ্বাস আড়াল করার কোনো চেষ্টা গোপন করলেন না আব্দুওলী। শান্ত ভেজা গলায় বললেন, 'বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না, কতটা ক্ষত আর ক্ষতি বুকে নিয়ে বেঁচে আছি আমরা। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সেই ভয়াবহ দিনগুলো পেছনে ফেলে সেই কবেই নতুন আশা-ভরসায় বুক বেঁধে এসেছিলাম ইস্তাম্বুলে। আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করব। কিন্তু হলো কই? এখনো ক্যাম্পের স্মৃতিগুলো প্রতিটি মুহূর্তে পিছু ছোটে। ক্যাম্পের এক একটা রাত ধারালো ছুরি হয়ে ফালাফালা করে দেয় আমাদের ভেতরটা। আমরা বোধহয় কখনোই আর স্বাভাবিক হতে পারব না।

চীন সরকারের অফিসারগুলোর সব কয়টা ম্যানিয়াক, স্যাইডিস্ট। হিটলার যেভাবে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদীদের মেরেছিল ঠিক সেভাবেই ওরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে, করছে। ওরা চায় দুনিয়ার বুকে একজন উইঘুরও যেন স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে বেঁচে না থাকে। ওরা আমাদের পরিচয় মুছে ফেলতে চায়। আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়, আল্লাহ বলে কেউ নেই। চীনা কমিউনিস্ট সরকারই তোমাদের রব, তোমাদের আল্লাহ।'

---

[১৩৫] Nowhere To Call Home | 101 East, Al Jazeera English, January 31st, 2019. https://tinyurl.com/y4oljnj3

'তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, চীন সরকার এ যুগের হিটলার?' স্টিভ চাওয়ের এই প্রশ্নে প্রবল বেগে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন আব্দুওলী।

কিছুটা ভেবে নিয়ে, যেন নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছেন বা সাহস দিচ্ছেন, বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা বলা শুরু করলেন আব্দুওলী।

'...প্রথম দিন ছিল ভয়াবহ। আমার জীবনে এ রকম কোনো দিন আগে আসেনি। এর পরেও আসেনি। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তারপর ইন্টারোগেশন রুমে নিয়ে গিয়ে ইস্পাত কঠিন স্বরে আদেশ করল, প্যান্ট খোল।

আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

'প্যান্ট খোল!', খ্যাঁকিয়ে উঠল পুলিশ অফিসার। যেন বাজ পড়ল ঘরের ভেতর।

ওরা জোর করে আমার প্যান্ট খুলল। তারপর একে একে ২০ জন পুলিশ আমাকে অ্যাবিউস (নির্যাতন) করল...' শেষের দিকে গলা ধরে এল আব্দুওলীর। চোখমুখ কুঁচকে মাথা নাড়িয়ে ভয়ংকর সেই সময় ভুলে থাকতে চাচ্ছেন, কিন্তু পারছেন না। মাথার মধ্যে ঘাই মেরে যাচ্ছে নরকে কাটানো সময়গুলোর কথা, দপদপ করে আগুন জ্বলছে মাথায়।

'অ্যাবিউস বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাচ্ছেন?' নরম গলায় প্রশ্ন করলেন স্টিভ চাও।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন আব্দুওলী। মনের সাথে বোঝাপড়া করে শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন খুলে বলবেন সবকিছু। 'ওরা আমার ওপর এমন নির্যাতন চালাল যা কোনো পুরুষ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না। ২০ জন পুলিশ আমাকে...', গলা ধরে এল আব্দুওলীর। '২০ জন পুলিশ আমাকে একে একে ধর্ষণ করল। আমি একজন পুরুষ, তারপরেও ওরা আমাকে ধর্ষণ করল! কী লজ্জা! কী লজ্জা! এই প্রথম আমি কাউকে এ কথা জানালাম...'

অসহ্য কষ্ট পিষে দিয়ে পার হতে থাকল মুহূর্তগুলো। কেউ কোনো কথা বলছে না। এখন কিছু বলা বড় দুঃখের, বড় কষ্টের।

অনেকক্ষণ পর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আব্দুওলীই প্রথম কথা শুরু করলেন। 'মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য আমার ওপর বন্দীদের লেলিয়ে দিত পুলিশ। মাদকাসক্ত, খুনী এমন ক্রিমিনালদের সাথে একই সেইলে রাখত। ওরা আমাকে বেধড়ক পেটাত। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা, যখন যার মন চাইত এসে মারত। গার্ডদের কাছে সাহায্য চাইতাম। ওরা মুখ ঘুরিয়ে নিত। দেখেও না দেখার ভান করত। আমাকে দিয়ে স্বীকারোক্তি দেয়াতে চাইত ওরা—আমি টেরোরিস্ট, আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী!

দেখুন, আমি একজন স্কুলশিক্ষক। সারাজীবন পড়াশোনা নিয়ে কাটিয়েছি। টেরোরিস্ট হতে যাব কেন? ওদের প্রশ্ন করতাম আমি। ওরা উত্তর দিত ওদের ভাষায়–আরও বেশি মারধোর করে! ওরা শুধু এই একটা ভাষায় বোঝে!

১৫ মাস পর জেল থেকে ছাড়া পাই আমি। পুলিশ আবার ক্যাম্পে পাঠাবে, এই ভয়ে স্ত্রী আর দুই মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে আসি ইস্তাম্বুল। শাস্তিস্বরূপ আমার পরিবারের সদস্যদেরকে একে একে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠায় চীন সরকার। আমার মা, বোন... সবাইকে।

আমার বোন...একদম পিঠাপিঠি আমরা। ওর সাথে হেসেখেলেই বড় হয়েছি। হাইস্কুলে ভূগোল পড়াত সে। ওকেও ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। ছোট ছোট দুই ছেলে আছে ওর। একটা ছয় বছরের আর একটা আরও ছোট, মাত্র দুই বছরের। এদের কী হবে? কে এদের দেখাশোনা করবে?'

হুড়মুড় করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আব্দুওলী।

স্থির, নিষ্কম্প চেহারা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে স্টিভ চাও। ওর চোখেও বৃষ্টি এল বলে।

'এখন আমার সব চিন্তা বোনকে নিয়ে। আমি পুরুষ, আমার সাথেই পুলিশ যা ব্যবহার করেছে; ওর সাথে না জানি কী করছে! দুশ্চিন্তায় ঘুমুতে পারি না আমি!'

বোনকে নিয়ে চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে আব্দুওলীর।

দুই.

আমার নাম বেরিক।

আমি একজন কারারক্ষী।

এখন কাজ করছি ডাওয়ানচিং (Dawanching) এর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। খুব বেশিদিন হয়নি এই ক্যাম্পের বয়স।

কারারক্ষী হবার আগে আমি ছিলাম ওয়েডিং ফটোগ্রাফার। বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিডিও করা, ছবি তোলা এসবই ছিল আমার কাজ। ২০১৬ সালের দিকে এসে ব্যবসার লাল বাতি জ্বলে গেল। ২০১৭ সালের সময়টাতে পুলিশ প্রসাশনে চাকরি করতে চাওয়ার ঝোঁক শুরু হলো সবার মধ্যে। বেতনের অঙ্ক বেশ মোটা দেখে আমার মা উৎসাহ দিলো বেশ। পুলিশ প্রশাসনের সহযোগী বাহিনীতে যোগ দেবার পরপরই বুঝতে পারলাম বড় একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। আফসোসে হাত কামড়ানোর অবস্থা! কিন্তু তখন আর

কিছু করার ছিল না। উপায় ছিল না পিছু ফেরার।

ছুটিছাটা নামের কোনো বস্তু এই চাকরিতে নেই। তুচ্ছ কারণে বেতন কেটে নেবার ঘটনা ঘটে প্রতিনিয়ত। বেতন দিতে দেরি করে। মাঝে মাঝে মাসের পর মাস চলে যায়, কিন্তু আমরা বেতন পাই না। অফিসের অবস্থা ভয়াবহ। সব সময় বন্দুকের ছিলার মতো টানটান রাখতে হয় আমাদের স্নায়ু। ঠিকঠাকমতো ঘুম হয় না। দিনের পর দিন এভাবে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করলে শরীরে যে অসুখ বাসা বাঁধবে তা বলাই বাহুল্য।

২০১৮ সালের মাঝামাঝি আমাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ডিউটি করতে পাঠানো হলো। ডিউটি পড়ল সিসিটিভি ক্যামেরার কন্ট্রোল রুমে। ওয়েডিং ফটোগ্রাফার হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইলো ওরা। রাতের শিফটে ডিউটি করতে হতো। সিসিটিভি ক্যামেরার কন্ট্রোল রুমে বসে ক্যাম্পের কোথায় কী হচ্ছে, সবকিছুর ওপর কড়া নজর রাখতে হতো আমাদের।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আকার বাড়ানোর কাজ চলছিল তখন। কাজ শেষ হবার পরপরই একদিন তিন হাজার স্কুলপড়ুয়া মেয়ে নিয়ে আসা হলো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। ওদের বয়স খুবই কম, টেনেটুনে ১৮ হবে হয়তো।

সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো মেয়েদের। সামনের সারির একটা মেয়ে আমাকে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি আমার শরীর ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারো, শুধু আমাকে একবার এই জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে যাও... প্লিজ!' অনুনয় ঝরে পড়ল মেয়েটার গলায়। আমার বুকের ভেতরটা কে যেন ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিল। ওর চোখের দিকে তাকানোর সাহস পেলাম না। সেই থেকে মাথার ভেতর সারাক্ষণ ঘুরতে থাকে মেয়েটির ব্যথাতুর মুখের ছবি, ভুলতে পারি না আমি। ভুলতে পারি না তার কথা। মাথা থেকে তাড়াতে চাইলেও একটু পরেই ফিরে আসে। গলার কাছটা শক্ত হয়ে যায় বেদনায়। ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে মস্তিষ্কে আঘাত করে তার বলা প্রত্যেকটা শব্দ। পাগল হয়ে যাবার দশা আমার।

মাঝে মাঝে বড়কর্তারা টহল দিতে আসে কন্ট্রোল রুমে। কাজ দেখার নাম করে। এসব আসলে ছুতো, ওরা আসে সুন্দরী মেয়েদের বাছাই করতে। 'এই যে তুমি, ওই মেয়েটার মুখ একটু যুম করে দেখাও তো, কতটা সুন্দরী সে দেখি ভালো করে' এ রকম হুকুম প্রায় নিত্যদিনের ব্যাপারে। ক্যাম্পের সবচেয়ে সুন্দরী, ডাঁসা মেয়ে খুঁজে দেবার হুকুম ওরা আমাদের দেয় কৌতূক মিশ্রিত কণ্ঠে। এ ধরনের হুকুম আমি সব সময় কৌশলে এড়িয়ে যাই।

মেয়ে পছন্দ হয়ে গেলে অফিসাররা তাদের অধীনস্থ কাউকে পাঠিয়ে দিত সেই মেয়েটাকে অফিসে ডেকে নিয়ে আসার জন্য...‘বলবে, স্যার সামান্য কিছু ব্যাপারে আলাপ করার জন্য ডেকেছেন। রুটিন ওয়ার্ক আরকি।’

অফিস বলতে আসলে রান্নাঘর বোঝানো হয়। সেখানে কোনো ক্যামেরা নেই, কাজেই রান্নাঘরে কে কী করল তা টের পাবার সম্ভাবনা কাকপক্ষীরও নেই। ও ভালো কথা, ‘রুটিন প্রশ্ন’ করার জন্য এভাবে মেয়েদের ডেকে নিয়ে আসার কাজটা রাতে করা হয় না, করা হয় দিনে। তবু এভাবে ডেকে নিয়ে মেয়েদের সাথে অফিসাররা কী ধরনের ‘আলাপ’ করে, সেটা বুঝতে কারোরই সমস্যা হয় না।

রান্নাঘরে দুটো টেবিল আছে। একটা টেবিলে খাওয়া-দাওয়া হয়। অন্য টেবিলটা রাখা হয়েছে ধর্ষণ করার জন্য। বেশির ভাগ সময়ই অফিসাররা একা ধর্ষণ করে। অবশ্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে নিজের খায়েশ মেটানোর পর মেয়েদের তুলে দেয় অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে। গণধর্ষণ করে ওরা। তারপর হতভাগ্য মেয়েদের ফেরত পাঠানো হয় সেলে।

চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে না মেয়েদের কেউই, বাধা দেবার চেষ্টাও করে না। চুপ করে থাকে পুরো সময়। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কারও কাঁদার অনুমতি নেই, আবেগ প্রকাশের সুযোগ নেই, সুযোগ নেই এগুলো নিয়ে কথা বলার। মেয়েগুলোর মনের ভেতরে কী ঝড় চলছে তা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। পাথরের মতো নিশ্চল থেকে পুরো অত্যাচার সহ্য করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে অশ্রুর নীরব অঝোর ধারা গড়িয়ে পড়ে দুগাল বেয়ে। গলে গলে পড়ে যায় মনের অব্যক্ত যন্ত্রণা...।[১৩৬]

খুব কম তথ্যই বের হয়ে আসে পূর্ব তুর্কিস্তানের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলো থেকে। দুর্লভ এসব তথ্যের উৎস বিবেকের তাড়নায় দংশিত বেরিকের মতো কোনো কারারক্ষী, সরকারি কর্মকর্তা বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সাবেক কোনো বন্দী। কিন্তু যতটুকু তথ্যই বের হয়ে আসুক না কেন, গা শিউরে ওঠার জন্য তা যথেষ্ট। এসব জেনে মানবতার ওপর থেকে বিশ্বাস যদি কেউ হারিয়ে ফেলে, তাহলে আপনি তাকে দোষ দিতে পারেন না কোনোমতেই।

রুকাইয়া পারহাত ইসলামিক স্টাডিস নিয়ে পড়াশোনা করতেন। চীনা পুলিশ ধরে নিয়ে যায় উনাকে। চার বছর ক্যাম্পে থাকার সময় অসংখ্যবার গার্ডদের হাতে ধর্ষিত হয়েছেন উনি। ক্যাম্পের দুর্বিষহ স্মৃতি ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন

---

[১৩৬] A Letter from A Prison Guard in the Newly Built Concentration Camp in Dawanching, Erkin Azat, May 17th, 2019. https://tinyurl.com/w9xmnf9

তুরস্কতে। আসলেই কী ভুলতে পেরেছেন ভয়াল সেই স্মৃতিগুলো? নাকি এখনো ছায়া হয়ে আঠার মতো লেগে আছে সঙ্গে?

দোভাষীর মাধ্যমে হিমশীতল কণ্ঠে রুকাইয়া বললেন, 'বন্দীদের মধ্যে যাদের বয়স ৩৫ এর নিচে, তাদের সবাইকে ধর্ষণ আর যৌন নির্যাতন করত ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ। নারী, পুরুষ বাছবিচার করে না ওরা। সবাইকেই যৌন নির্যাতন করে!'

জি পাঠক, আপনি ঠিকই পড়েছেন। ৩৫ বছরের কম যেকোনো বন্দী–হোক সে পুরুষ বা নারী–চীনা পুলিশ তাদের ধর্ষণ করে, যৌন নিপীড়ন করে! এই মুশরিক চীনাদের পক্ষে আর কতটা নীচে নামা সম্ভব?

'সপ্তনরক' শিরোনামের প্রবন্ধে সাইরাগুল সাউতাবাইয়ের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম আমরা। চলুন আবারও তার কাছে ফিরে যাই। শুনি ক্যাম্পে হওয়া ধর্ষণের ব্যাপারে কী বলার আছে ভদ্রমহিলার...

'ক্যাম্পে সবচেয়ে করুণ অবস্থার মধ্যে ছিল মেয়েরা। চীনাদের পাশবিকতা, নীচতার ঝড়ঝাপটা ওদের ওপর দিয়েই সবচেয়ে বেশি গেছে। প্রতিরাতে খুলে খুলে পড়েছে চীনাদের মানুষিক মুখোশ, মুখোশের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে এক একটা রক্তখেকো নেকড়ে।

নিয়ম করে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত পুলিশ। সারারাত ওদের ওপর চলত নির্যাতন। পুলিশ ছিল সেখানে সর্বেসর্বা। যা খুশি করতে পারত। কারও কাছে জবাবদিহির ভয় নেই। যাকে খুশি তাকেই ধর্ষণ করার জন্য নিয়ে যেতে পারত। গণধর্ষণের অনেক ঘটনা সেখানে ঘটেছে। আমি একবার ক্লাস নিচ্ছিলাম। একটা মেয়ের ক্লাসে আসতে একটু দেরি হয়েছিল। আধা ঘণ্টার মতো। পুলিশ তাকে সিটে বসতে বলল, খুব সম্ভবত শারীরিক সমস্যার কারণে ও বসতে পারছিল না। আর যায় কোথায়–সাথে সাথে ওকে ব্ল্যাকরুমে নিয়ে গণধর্ষণ করে চীনা কুত্তাগুলো।

আমাদের সবার চোখের সামনেই একটি মেয়েকে গণধর্ষণ করেছিল চীনারা। সেই স্মৃতি আজও দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়ায় আমাকে। রাতে ঘুমাতে পারি না। এত ভুলে থাকতে চাই তবু ভুলতে পারি না। বরং আরও বেশি করে মনের ভেতরে গেঁথে যায়। সমস্ত অণু-পরমাণু, মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি কোষ থেকে ঘৃণা উথলে ওঠে...। থু! থু! চীনারা মানুষ না, পশু বললেও পশুদের অপমান করা হয়!

একদিন পুলিশ আমাদের বলল, 'রিএডুকেশন ক্যাম্পে থেকে বন্দীদের কেমন উন্নতি হলো, তা আমরা যাচাই করতে চাই।'

২০০ বন্দীকে বাছাই করা হলো। ২০০ জন নারী-পুরুষ সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

এক মেয়েকে সামনে ডেকে নেয়া হলো। বলা হলো, ‘পাপের স্বীকারোক্তি দাও।’

মেয়েটি আমাদের দিকে ফিরে উঁচু গলায় তার অপরাধ বলে যাচ্ছিল…

‘আমি আগে খারাপ ছিলাম। চীনা ভাষা জানতাম না। এখন শিখে ফেলেছি। কোনো সন্দেহ নেই আগের চাইতে অনেক ভালো একজন মানুষে পরিণত হয়েছি আমি।’ মেয়েটির কথা শেষ হলো একসময়। নেমে এলো নীরবতা।

এক পুলিশ সরু চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে সাপের মতো হিসহিস কণ্ঠে হুকুম দিলো, ‘কাপড় খোলো।’

স্তব্ধ, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা।

চীনারা অপেক্ষা করল না।

জোর করে কাপড় খুলে মেয়েটাকে ওরা ধর্ষণ করল।

একের পর এক!

২০০ জন বন্দীর সামনে!

২০০ মানবসন্তান দাঁড়িয়ে আছে আর চীনা শুয়োরগুলো একের পর এক মুসলিম মেয়েটাকে ধর্ষণ করছে। খিস্তি আউড়াচ্ছে, বিদ্রুপ করছে!

নিঃশব্দ আর্তচিৎকারে পুড়ে চলেছে আমার মন। কিছু করার ছিল না আমাদের সেখানে। ধর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় আমরা কী করি, তা দেখার জন্য কড়া চোখে তাকিয়ে ছিল পুলিশ অফিসাররা। যারা মাথা ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল, যারা চোখ বুজে নিজের অসহায়ত্ব ভুলে থাকার চেষ্টা করল, তীক্ষ্ণ বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল যাদের চোখে, নিষ্ফল ক্রোধে যারা হাত মুষ্টিবদ্ধ করল, যারা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকিয়ে থাকল–তাদের সবাইকে, সবাইকেই সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। কোনো দিন তাদের আর দেখেনি কেউ!’[১৩৭]

সাউতাবাইয়ের মতো ক্যাম্পফেরত অনেক নারী জানিয়েছেন রাতের বেলা গার্ডরা অল্পবয়স্কা, সুন্দরী, অবিবাহিতা মেয়েদের রুম থেকে ডেকে নিয়ে যায়। যাদের পছন্দ হয় তাদের মাথায় কালো হুডি পরিয়ে নিয়ে যায় গার্ডরা। সারারাত ওরা আর সেলে

[১৩৭] A Million People Are Jailed at China’s Gulags. I Managed to Escape. Here’s What Really Goes on Inside. David Stavrou. Hareetz, October 18th, 2019. https://tinyurl.com/y6m9kjl4

ফিরে না। গণধর্ষণের শিকার হয়ে সকালের দিকে কেউ কেউ ফিরে আসত। কেউ আর কখনোই ফিরত না। হারিয়ে যেত চিরদিনের জন্য!

গুলবাহার জালীল শোনাচ্ছেন তার নিজের করুণ কাহিনি। ‘স্টিলের একটা চেয়ারে আমাকে ২৪ ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল ওরা। এই পুরো সময়টুকু নড়তে দেয়নি, এক ফোঁটা পানিও দেয়নি। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আমাকে হসপিটালে ভর্তি করানো হয়। তারা আমাকে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানি করত। আমি এটা কুরআন ছুঁয়ে বলতে পারব। যখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, ‘তোমরা এসব কী করছ? তোমাদের কি মা বোন নেই?’ ওরা জবাব দিলো, ‘নিজের দিকে তাকাও। তুমি তো আমার মা বোন নও।’ আমি নিজের দিকে তাকালাম। দেখলাম আমার পুরো শরীর আর মাথা বিভিন্ন আঘাতে ভরা। কোনো অনুভূতি কাজ করছে না। আসলেই তো, আমি তো ওদের মা বোন নই।

আমি আমার ধর্ষকদের নাম বলতে পারব। একটা জায়গা ছিল সেখানকার ঘরগুলোতে সিসিক্যামেরা ছিল না। আর দেয়াল ছিল খুব পুরু। ঘরের ভেতরের চিৎকার বাইরে থেকে শোনা যেত না। সেখানে ধর্ষণ করা হতো। ধর্ষণ খুব সাধারণ ঘটনা ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের একটা হাতিয়ার ছিল এই ধর্ষণ। প্রতি দশ দিন পরপর দশজন পুলিশ আর তিনজন অফিসার অস্ত্রহাতে আসত। পুলিশগুলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত আর অফিসাররা আমাদেরকে উলঙ্গ হতে বাধ্য করত। এই উলঙ্গ অবস্থায় আমাদের তিনবার ওঠবস (অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে) করতে হতো। আমি জানি না তারা আসলে কী চাইত? তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সম্মানহানি করা।’[১৩৮]

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পাওয়া অসংখ্য বন্দিনী জানিয়েছেন, ‘আমাদের বাধ্য করা হতো নগ্ন হয়ে একসাথে গোসল করতে! সিসিটিভি ক্যামেরার সামনেই!’

---

[১৩৮] مسلمة من الإيغور: كورونا وحقنها لنفقد الذاكرة بمعسكرات الاعتقال (فيديو) - http://mubasher.aljazeera.net/news/مسلمة-من-الإيغور-عرونا-وحقنونا-لنفقد-الذاكرة-بمعسكرات-الاعتقال-فيديو
বাংলা সাবটাইটেল- https://tinyurl.com/yxh65b8y
DOAM - Documenting Oppression Against Muslims ফেইসবুক পেইজে ২৭ মে ২০২০ সালে প্রকাশিত ভিডিও, #Uyghur Muslim women raped in Chinese concentration camps. Testimony of Chinese Concentration Camp Survivor Gulbihar Jalilova. #Uyghurs #China- https://tinyurl.com/y49gjvs5
Nowhere To Call Home | 101 East, Al Jazeera English, January 31st, 2019. https://tinyurl.com/y4oljnj3
Surviving China’s Uighur camps. France24 News. May 10th, 2019. https://tinyurl.com/y4s4kvpw

নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতায় পিছিয়ে ছিল না চীনা মহিলা গার্ডরাও। ৪০ বছরের গুলজিরা আউলখান দেড় বছর ক্যাম্পে বন্দী ছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন, 'নারী গার্ডরা চুইংগাম চিবুতে চিবুতে আমাদের কাছে আসত। আমাদের যোনিতে চুইংগাম সেঁটে দিত। তারপর একটা একটা করে সেখানকার পশম উপড়াত। পুরো সময়টাতে নোংরা রসিকতা করত ওরা একে ওপরের সাথে।'

মহিলা গার্ডরা গোলমরিচের গুঁড়োর সাথে পানি মিশিয়ে শরবতের মতো বানাত। গোসল করার জন্য তো বন্দীদের আগেই নগ্ন করেছে, এবারে এই তরল বন্দিনীদের হাতে দিয়ে বলত তোমাদের যোনিতে এটা ছিটাও। যারা গার্ডদের কথা শুনত না তাদের ভাগ্যে জুটত কঠোর অত্যাচার। যারা শুনত তারা ভাবত গার্ডদের কথা না শুনলেই বোধহয় ভালো হতো। গোলমরিচের গুঁড়ো মিশ্রিত পানি ঢালার পর মনে হতো যেন আগুন লেগে গেছে ওখানে। পুড়তে পুড়তে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিতে দিতে গড়িয়ে নামত পানি।

গোলমরিচের গুঁড়ো মেশানো পানি।[১৩৯]

চারদিকে আজ নারীবাদ, নারীমুক্তির জয়জয়কার। নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য প্রগতির ফেরিওয়ালারা শেখাচ্ছে মেয়েদের একান্ত শারীকিক বিষয় নিয়েও ছেলেবন্ধু বা অন্য কোনো পুরুষের সাথে আলোচনা করতে হবে। এই বিচিত্র 'স্বাধীনতার' সবক দেয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। আর সেই একই পৃথিবীতে এভাবে দিনের পর দিন হান চাইনিযদের বিষাক্ত থাবায় রক্তাক্ত হচ্ছে উইঘুর নারীরা! কেউ কিছু বলছে না!

চারদিকে মানবতা আর মানবাধিকারের বুলি। কিন্তু সেই পৃথিবীতে চীনা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রুটিন করে ধর্ষিত হচ্ছে মানবতা। তবু কারো মুখে টু শব্দটি নেই!

কী অদ্ভুত বৈপরীত্য।

ভুলে গেছে সবাই উইঘুরদের, ভুলে গেছে সবাই। সৌর জগতের এই গ্রহে বেঁচে আছে ৭০০ কোটি মানুষ; কিন্তু মরে গেছে মানবতা!

মানবতার লাশ গলে গেছে।

পচে গেছে!

---

[১৩৯] Abortions, IUDs and sexual humiliation: Muslim women who fled China for Kazakhstan recount ordeals. Amie Ferris-Rotman. The Washington Post, October 5th, 2019. https://tinyurl.com/yxm6tjxp

জবানবন্দী

কালবীনূর সিদিক প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক চীনা ভাষার শিক্ষক। চীনের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে শিক্ষক হিসেবে ছয় মাস কাজ করেছেন। ক্যাম্পে চীনাদের নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ দেখেছেন খুব কাছ থেকে। দীর্ঘদিন বাকি দুনিয়ার কাছ থেকে সবকিছু গোপন করে রাখতে হয়েছে তাকে। চীন থেকে পালিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছিলেন চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হয়ে। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলার মতো মানসিক শক্তি প্রথম দিকে তার ছিলো না। তারপর একসময় Dutch Uyghur Human Rights Organization (DUHRO) এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাদের কাছে খুলে বলেন অনেক কিছুই। তার এই জবানবন্দী মিলে গেছে চীনের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ভয়াবহতার ব্যাপারে ভুক্তভোগীদের বরাতে পাওয়া তথ্য উপাত্তের সাথে[১৪০]।

সেই নারকীয় অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বর্ণনা আমরা শুনবো তার মুখ থেকেই।

কালবীনূর সিদিকের জবানবন্দী…

[140] Qelbinur Sidik – A twisted life. Dutch Uyghur Human Rights Foundation. Uighur Times, August 17th, 2020.
https://tinyurl.com/y3zo3fop
Confessions of a Xinjiang Camp Teacher Qelbinur Sedik reveals the horrors she witnessed in the camps, where she was forced to teach Mandarin in 2017. Ruth Ingram. The Diplomat, August 19, 2020. https://tinyurl.com/y3fc4kbf

টুকরো টুকরো আভাস অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ছাপোষা জীবনে মজে থাকা আমরা খেয়াল করিনি। চোখে পড়েছে কিন্তু দেখিনি। শুনেছি, কিন্তু কান দেইনি। ক্ষণিকের অস্বস্তি আর ভয় ঝেড়ে ফেলে বারবার ডুবে গেছি রুটিনবাঁধা জীবনের অভ্যস্ত আলিঙ্গনে।

২০০৪ সাল থেকে উইঘুর স্কুলগুলোতে ম্যান্ডারিন চাইনিয শেখানো বাধ্যতামূলক করা হল। বলা হল এখন থেকে স্কুলগুলোতে উইঘুর আর চাইনিয, দু' ভাষাই শেখানো হবে। দু' ভাষার কথা বলা হলেও আসলে ম্যান্ডারিন শেখানোয় অনেক বেশি জোর দেয়া হতো। খচখচানি লাগছিলো, কিন্তু আমরা তেমন একটা গা করলাম না। পরের বারোটা বছর ধরে থেকে থেকে ছড়ানো ছিটানো অনেক কিছুই কানে আসলো। কিন্তু নিরাপদ অভ্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে মনোযোগ দিতে ইচ্ছে হল না।

২০১৪ তে আকসুতে থাকা আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে অদ্ভূত এক কথা শুনলাম। আকসুতে নাকি জনসম্মুখে আদালত বানিয়ে কিছু উইঘুরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। বরাবরেই মতোই তেমন একটা মনোযোগ দিলাম না।

২০১৬ সালে একটা গুজব শুনলাম সেই একই বন্ধুর কাছ থেকে। নামায পড়ার কারণে নাকি মানুষকে গ্রেফতার করে করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। সেই বন্ধুর নিজের বাবা, মা, আর তিন ভাইকেই নাকি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বলেছে,

তোরা নামায পড়েছিস মানে তোদের ১০ বছর জেলে কাটাতে হবে।

কুরআন পড়েছিস মানে ৮ বছর জেলে কাটাতে হবে'।

আগেরগুলোর মতো এ খবরটাও তেমন পাত্তা পেলো না আমার কাছে।

সেই সহকর্মীর কাছ থেকেই আরেকদিন শুনলাম, মেয়েদের দলে দলে ডেকে নিয়ে বাধ্যতামূলক অপারেশন করানো হচ্ছে। ওদের বন্ধ্যা বানাচ্ছে চীনারা। ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড দিয়ে। তবু শ্রাগ করে ভুলে থাকার চেষ্টা করলাম। 'আরে আমাদের সাথে অমন কিছু হবে না', নিজেকে প্রবোধ দিলাম আমি।

২০১৬ তে পূর্ব তুর্কিস্তান শাসনের দায়িত্বে আসলো চেন চোয়াংগোয়া। পাইকারী নৃশংসতার ফেরিওয়ালা লোকটা। এর আগে তিব্বতে চরম অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছিল। সেই বছর থেকে সব কিছু খুব দ্রুত, খুব ভয়ংকরভাবে বদলাতে শুরু করলো।

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে ভালো, নির্ভরযোগ্য শিক্ষকদের বাছাই করলো সরকার। পরিবার, রাজনৈতিক অবস্থান, সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ওরা। সব পরীক্ষার পর যাদের বাছাই করা হল, আমি তাদের একজন।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে আমাকে ডেকে পাঠানো হল টাউনহলে। বলা হল, এখন থেকে আমার কাজ হচ্ছে নিরক্ষরদের চাইনিয ভাষা শেখানো। কিন্তু অদ্ভূত ব্যাপার হল, এই আপাত নিরীহ কাজের জন্য আমাকে গোপন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হলো। মার্চের ১ তারিখে এক বাসস্টপে গোপনে এক পুলিশ অফিসারের সাথে দেখা করলাম। সেই আমাকে প্রথমবারের মতো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

চারতলা বিল্ডিং। চারদিকে উঁচু দেয়াল, কাঁটাতার। একটা ধাতব ইলেকট্রিক দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে সশস্ত্র পুলিশ, কয়েক ডজন কর্মী, নার্স, শিক্ষক আর ক্যাম্প পরিচালক। পুরো ক্যাম্প সিসিটিভিতে ঠাসা। আমাকে কন্ট্রোল রুমে নিয়ে গেল। মনিটরে দশটা সেল দেখতে পেলাম। ইনফ্রারেড ক্যামেরার সুবাদে সেলগুলোর ভিতরটা দেখতে পারছিলাম। প্রতি সেলে দশ জনের মতো বন্দী। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোন বাতি নেই। জানালা নেই। বিছানা নেই। মেঝেতে কম্বল পাতা। জমাটবাঁধা, নিস্তব্ধ অন্ধকারে ডুবে আছে বন্দীরা।

মোট ৯৭ জন বন্দী। আমার ছাত্র। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ থেকে ওরা ক্যাম্পে। ৭ জন মহিলা, তাঁদের মধ্যে ৩ জন ছিল অতিবৃদ্ধা। প্রায় সবারই তখনো চুল, দাড়ি ছিল। গণহারে চুল দাড়ি কামিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা আরো পরে শুরু হয়েছিল।

ক্লাসে দশ জন করে ঢুকছিল ওরা। হাত পা শেকলে বাঁধা। প্রত্যেকের জন্য একটা ছোট প্লাস্টিকের চেয়ার বরাদ্দ। টেবিল নেই। চীনা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের 'ক্লাসে' টেবিলের দরকার পড়ে না। সবাই বসার পর আমাকে ঢুকতে দেয়া হল। সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকা বাপদাদার বয়েসী দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মানুষদের দেখে অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ থেকে সালাম বের হয়ে গেল। কেউ জবাব দিলো না। মাথা নিচু করে মূর্তির মতো বসে রইলো সবাই। কেউ কেউ অস্ফুট স্বরে কেঁদে উঠলো। বুঝলাম সালাম দিয়ে নিষিদ্ধ এবং চরম বিপদজনক একটা কাজ করে ফেলেছি। ভয়ে ভয়ে রুমের সিসি ক্যামেরাগুলোর দিকে তাকালাম।

দুইঘণ্টা টানা ক্লাসের পর বিরতি। লাঞ্চ আসলো। খাবার ভাগ করে দেয়ার কাজে হাত লাগালাম। বলা হল প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ এক বাটি পানিতে ভেজানো ভাত আর একটা করে সেদ্ধ রুটি। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম বাটিতে ভাত নেই বললেই চলে। দুজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে মায়া হল আমার। একটা করে রুটি বেশি দিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ গার্ড এসে খাবারের হিসেব মেলাতে শুরু করলো। প্রায় ধরাই পড়ে যাচ্ছিলাম, শেষমেষ একজন সহকর্মী উদ্ধার করলো আমাকে। গার্ডকে বললো সে গুণতে ভুল করেছিলো।

সকাল থেকে চলা পুরো ব্যাপারটা মনের ওপর খুব বেশি চাপ ফেলছিল। এক কাপ চা বানিয়ে খেতে চাইলাম। মগে পানি নেয়া মাত্রই হইহই করে ছুটে এল এক সহকর্মী। এই পানি দিয়ে চা বানানো যাবে না। বন্দীদের জন্য সরবরাহকৃত পানি মানুষের খাবার উপযুক্ত না।

আমার 'ছাত্র'দের কথা আমার আজও মনে পড়ে। একজনের নাম ছিল উসমান। ভীষণ স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম। চীন সরকার তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আগে উসমান ছিল উরুমচির সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীদের একজন। প্রতি ক্লাস শেষ হবার পর উসমান কাতর স্বরে অনুরোধ করতো, 'ম্যাডাম, দয়া করে আমাকে আর একটু সময় ক্লাসে কাটাতে দিন। জানালার ঐ ছোট্ট ফুটো দিয়ে আসা সূর্যের আলোটা একটু গায়ে মাখতে দিন। অনেকদিন হল, সূর্য দেখি না...”

হঠাৎ ক্লাসে আসা বন্ধ করে দিল উসমান। শুনলাম রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গেছে। হাই ব্লাড প্রেশার ছিল ওর।

আর একটা ছেলে ছিল। সেলিম। খুব পছন্দ করতাম ওকে। চটপটে খুব। বেচারা ভেবেছিল তাড়াতাড়ি চাইনিয শিখতে পারলে হয়তো তাড়াতাড়ি ক্যাম্পের নরক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেলিম মুক্তি পেল। তবে অন্যভাবে। অসুস্থ হয়ে পড়লো সে একদিন। ইনফেকশন। ক্যাম্পের ভয়ংকর পরিবেশে চিকিৎসা ছাড়া মামুলি ইনফেকশন খুব অল্প সময়ে খুব খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গেলো। শেষমেশ একরকম বাধ্য হয়ে ওকে হাসপাতালে নিলো বিরক্ত চীনা গার্ডরা। কিন্তু রাস্তাতেই মরে মুক্তি পেল সেলিম।

উসমান আর সেলিম মারা গেল ক্যাম্পে আমার চাকরির প্রথম তিন সপ্তাহের ভেতরেই। সময়ের সাথে সাথে লম্বা হতে থাকলো মৃতের তালিকা। প্রথম প্রথম সবাই ছিল চমৎকার স্বাস্থ্যের। আমার চোখের সামনেই ওরা দুর্বল হতে থাকলো। ক্ষয়ে যেতে, ভেঙ্গে যেতে থাকলো। অনেকে হাঁটতে পর্যন্ত পারতো না। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ধুঁকেধুঁকে মরছিল মানুষগুলো। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার।

মার্চের বিশ তারিখে, ক্যাম্পের নীচতলা নতুন ছাত্রছাত্রীতে কানায় কানায় ভরে গেল। আমার প্রথম দিকের বন্দীরা ছিল দ্বীনদার মুসলিম, অধিকাংশই বয়স্ক। কিন্তু এবারে দেখলাম বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী অথবা কলেজ ভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এসেছে চীনারা। ওদের অপরাধ হল ফেইসবুক ব্যবহার করা! ব্যস, এটুকুই! ফেইসবুক ব্যবহার করার ভয়ংকর অপরাধে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ঠাঁই হয়েছে ওদের।

নতুন বন্দীদের সবাই উচ্চশিক্ষিত। চোস্ত ম্যান্ডারিন বলে সবাই। এদের আমি কী চাইনিয শেখাবো?

বন্দীদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রোপাগ্যান্ডামূলক গান আর জাতীয় সঙ্গীত শেখাতে বলা হলো আমাকে।

ক্লাসে ঢোকার দরজা একটা শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। পুরোপুরি খুলতো না। বন্দীরা ক্লাসে ঢুকতো হামাগুড়ি দিয়ে। শেকলের নিচ দিয়ে। ওদেরকে বাধ্য করতো গার্ডরা। আমার সাথে চোখাচোখি হতো ওদের।

দেখতাম ওদের চোখ থেকে দুঃসহ যন্ত্রণা ঝরে পড়ছে। প্রতি ঘণ্টায় একশো জন করে নতুন ছাত্র ছাত্রী আসতো। এভাবেই অবর্ণনীয় কষ্ট নিয়ে দিন যেতে থাকলো একের পর এক। কী নরক যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছি, কোন ভয়ংকর অপরাধের ভাগীদার হয়েছি - স্বামীকে ছাড়া আর কাউকে তা বলতে পারতাম না।

ক্যাম্পের বাইরেও পরিস্থিতি খারাপ হওয়া শুরু করলো। আশেপাশে ব্যাপক ধরপাকড় চলছিলো। বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ। আমাদের মহল্লায় প্রায় ৬০০ মানুষ থাকতো। দুই বছরের মাঝেই নিখোঁজ হয়ে গেল ১৯০ জন। উইঘুরদের খালি হওয়া অ্যাপার্টমেন্টগুলো দখল করে নিলো হান চাইনিয অভিবাসীরা।

ক্যাম্পে নতুন বন্দী আসতেই থাকলো। ছয় মাস পর বন্দীর সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে গেল। প্রতি সেলে ৫০ থেকে ৬০ জন করে থাকতো। ছোট্ট সেলে পা রাখার জায়গা থাকতো না। সবাই গায়ে গায়ে লেগে শুয়ে থাকতো। প্রতিদিন দুই, তিন, পাঁচ, সাতজন করে বন্দীকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো।

ক্যাম্পের টর্চাররুম ছিল বেইসমেন্টে। ক্যাম্পের এক পুলিশ অফিসার একদিন বেশ আগ্রহ নিয়ে টর্চারের পদ্ধতিগুলো নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিল ...

ইলেকট্রিক শক ৪ ধরণের -

১। ইলেকট্রিক চেয়ার,

২। ইলেকট্রিক গ্লাভস,

৩। ইলেকট্রিক হেলমেট, আর

৪। মলদ্বারের ভেতর ইলেকট্রিক ব্যাটন ঢুকিয়ে তারপর শক দেয়া...

বন্দীদের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতো পুরো বিল্ডিং জুড়ে। ক্যাম্পের নিষ্প্রাণ দেয়ালগুলো যেন আর্তনাদে সাড়া দিতো। গমগম করতো। ক্লাসে বসে কিংবা লাঞ্চ করার সময়ও আমি তা স্পষ্ট শুনতে পেতাম।

আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার ঠিক আগে আগে, মানে ২০১৭ এর সেপ্টেম্বরে আমাকে পাঠানো হল অন্য এক ক্যাম্পে। ক্যাম্পটা উরুমচিতেই ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। শহরের একদম প্রাণকেন্দ্রে ছিল এই ক্যাম্প। একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। অন্য আর দশটা বিল্ডিং থেকে আলাদা করার কোনো উপায় নেই। বিল্ডিং এর সামনের দিকটাতে বড় করে লিখা ছিল -

অবসর কেন্দ্র!

ক্যাম্পটা ছিল বিশাল। প্রায় ১০ হাজার নারী বন্দী ছিল সেখানে। তার মধ্যে টেনেটুনে ষাট জনের মতো হবে যাদের বয়স ষাটের বেশি। বাকিরা সবাই অল্পবয়স্কা। তরুণী, যুবতী। সুন্দরী। এই মেয়েরা সবাই অবস্থাসম্পন্ন ঘর থেকে আসা। তাদের কেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল জানেন?

ওরা অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, তুরস্ক বা ইউরোপে পড়াশোনা করতো। ব্যাস! এই অপরাধে উচ্চশিক্ষিতা এবং বেশ কয়েকটা ভাষা ঝরঝর করে বলতে পারা সুন্দরী উইঘুর তরুণীদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে এসেছে চীনারা!

ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল এই হতভাগ্য মেয়েরা। আর সে সময়েই তাঁদের গ্রেফতার করে ওয়রা। আমার মেয়ে ইউরোপের একটা দেশে পড়াশোনা করে। ওকে নিয়ে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিলাম। মৃত্যুশীতল একটা ভয় আমাকে অষ্টপ্রহর তাড়া করে বেড়াত। আমার মেয়েকেও যদি চীনারা এভাবে ধরে নিয়ে আসে ক্যাম্পে? তখন কী হবে? ইয়া আল্লাহ, রক্ষা করো! এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না। সিদ্ধান্ত নিলাম, চীন যদি আমার মেয়েকে দেশে ফিরতে বাধ্য করে তাহলে আমি আত্মঘাতী হব। নিজের হাতে নিজেকে শেষ করে দেবো।

ক্যাম্পে বন্দীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই। শুধু একটা বালতি। সেই বালতি সপ্তাহে মাত্র একদিন খালি করা হয়। প্রতিদিন সকালে প্রত্যেক বন্দী মাত্র ১ মিনিটের জন্য বালতি ব্যবহারের সুযোগ পায়। আর এক মাসে গোসল করার সুযোগ পায় মাত্র ১ বার। খুবই নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। নোংরা পরিবেশে বন্দীরা মুড়ি মুড়কির মতো অসুস্থ হয়ে পড়ত।

সোমবার ছিল ওষুধ খাবার দিন। দশ হাজার বন্দীকে লাইনে দাঁড় করানো হতো। তারপর একে একে সবাইকে ইনজেকশন দিত নার্স। আরেকজন নার্স বন্দীদের রক্ত নিত আর সাদা রঙের একটা ওষুধ খেতে দিত। প্রচণ্ড কৌতূহল হতো আমার।

কী করা হচ্ছে এভাবে রক্ত নিয়ে?

কী খাওয়ানো হচ্ছে?

কেন ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে ওদের? কী হচ্ছে আসলে?

প্রচণ্ড কৌতূহল হতো। আমার প্রশ্নের জবাবে এক নার্স মুখস্থ উত্তর দিয়েছিল,

> *"আসলে বন্দীদের ক্যালসিয়াম দরকার। কারণ তারা সূর্যের আলো পায় না। অন্ধকারে কাটাতে হয় অধিকাংশ সময়। ইনজেকশন দিয়ে ওদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করা হয়। কারো কোনো সংক্রামক রোগ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য রক্ত নেয়া হয়। আর শেষ ওষুধটা খাওয়ানো হয় যাতে বন্দীদের ভালো ঘুম হয়।"*

নার্সের ব্যাখ্যা শুনে আমার কৌতূহল কমলো না। বরং আরো বেড়ে গেল। ক্যালসিয়াম দরকার মানুষের শরীরের জন্য। কিন্তু এতো?

হচ্ছেটা কী আসলে?

একদিন ক্লাসরুমে যাবার পথে এক মহিলা গার্ডের সাথে দেখা হয়ে গেল। এক বন্দীর মরদেহ নিয়ে যাচ্ছিলো সে। এই নারী পুলিশ সদস্যও ছিল উইঘুর। বন্দীদের বাইরে পুরো ক্যাম্পে উইঘুর বলতে আমরা কেবল দুজনই ছিলাম। বাকিরা সবাই হান। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম ভাগ্যক্রমে ওখানে কোন সিসিটিভি ছিল না। নার্স আমাকে ফিসফিসিয়ে বললো,

> *"আমরা বন্দীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পিল খেতে দেই। এমনকি রুটির মধ্যেও ওষুধ মিশিয়ে দেই। কিন্তু তারপরও এই বন্দীর মাসিক হচ্ছিল। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল। এক পর্যায়ে মারা যায় সে। দয়া করে কাউকে কখনো এসব বলবেন না। সমস্যা হবে!"*

দশ হাজার উইঘুর কাযাখ মেয়েদের জন্য নির্ধারিত এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সব অফিসার ছিল হান পুরুষ। ক্লাস চলাকালীন সময়ে হুটহাট মেয়েদের ডেকে নিয়ে যেতো চীনারা। একদিন ক্লাস চলার সময় বিশ বছরের একটা মেয়েকে ডেকে নিয়ে গেল। 'ইন্টারভিউ' এর জন্য। দু' ঘণ্টা পর মেয়েটা যখন ফিরলো তখন ঠিকমতো বসতেও পারছিলো না সে। মেয়েটার অস্ফুট কান্না শুনে পুলিশ অফিসার খেঁকিয়ে উঠলো। আবার নিয়ে গেল মেয়েটাকে। তারপর ওকে আর কখনো দেখিনি...

ক্যাম্পে কাজ করা এক মহিলা পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে একদিন শুনলাম, প্রতিদিন চার-পাঁচটা করে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে অফিসাররা গণধর্ষণ করে। অনেক সময় ওদের যোনি আর মলদ্বারে ইলেকট্রিক ব্যাটন ঢুকিয়ে শক দেয় চীনারা।

২০১৭ এর ডিসেম্বরে একদল তরুণ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারো কারো ওপর নির্যাতনের মাত্রা এতোটাই ভয়াবহ ছিল যে তাদের হাত বা পা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

পচন ঠেকানোর জন্য কেটে ফেলতেও হয়েছে। নির্যাতনের কারণে অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

এতো পাপের ভাগীদার হয়েও শেষরক্ষা হলো না। বাঁচতে পারলাম না। ২০১৭ সালের জুলাইয়ে বিনামূল্যে গাইনী টেস্ট করানোর জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হলো। বাধ্য হয়ে জুলাইয়ের ১৮ তারিখে হাজির হলাম পরিবার পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্টে। হাসপাতালের বাইরেও লম্বা লাইন। সব উইঘুর। একজনও হান চাইনিয নেই। ১৮-৫৯ বছরের সব উইঘুর নারীদের জন্য এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

'যদি সহযোগিতা না করো তাহলে শাস্তি পেতে হবে' — সাফ জানিয়ে দিয়েছিল চীনারা।

ক্যাম্পে কাজ করা আমি ঠিকই জানতাম এই শাস্তির অর্থ কী!

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমার পালা আসলো। ওরা আমাকে ডেকে এনেছিলো টেস্টের কথা বলে। কিন্তু কিসের কী! টেস্টের ধারে কাছেও গেলো না। আমাকে শুতে বাধ্য করলো ওরা। তারপর আমার দু' পা দুপাশে টেনে ধরে জোর করে আমার শরীরের ভেতরে গর্ভনিরোধক ডিভাইস বসিয়ে দিল। আমি খুব কাঁদছিলাম। ব্যথায়, অপমানে, লজ্জায়। মনে হচ্ছিলো ওরা আমার ওপর মানসিক এবং যৌন নির্যাতন করেছে!

আমার মেয়ে ইউরোপে ছিল। ওর বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ইউরোপ যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু চীন সরকার আমাকে যেতে দিলো না। উল্টো বিয়ের দুদিন পর পুলিশ আমাকে রিমান্ডে নিয়ে গেল। ৫ দিনের জন্য। মেয়ে ইউরোপে কী করছে, কী পড়ছে, কোথায় থাকে সবকিছু জানতে চায় ওরা। অন্যান্য প্রবাসী উইঘুরদের মতো আমার মেয়েকেও হেনস্থা করার মতলব ছিল ওদের।

২০১৭ সালের নভেম্বর নাগাদ এই গর্ভনিরোধক ডিভাইসের যন্ত্রণা আমাকে পাগল করে তুলছিলো। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আমার। আমি আর নিতে পারছিলাম না। একজন রক্ত মাংশের মানুষ কতোটা নিষ্ঠুর আচরণ নিজের চোখে দেখে স্বাভাবিক থাকতে পারে! সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেলাম আমি।

আমার স্বামী একদিন পরামর্শ দিল হাসপাতালে যাবার। আমার বসের সংগেও সেদিন দেখা হল। তাকে বললাম আমার সমস্যার কথা। সে বলল, ক্যাম্পে পড়ানোর জন্য বিকল্প কাউকে খুঁজে দিতে হবে। আমি আমার এক সহকর্মীর কথা বসকে বললাম।

তারপর কী থেকে যে কী হয়ে গেল...সব কিছু এখন আর মনে নেই ঠিকমত। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম এক মাসের মত। এরপর থেকে আর কখনো ক্যাম্পমুখো হইনি।

২০১৯ সালে আবার রক্তপাত শুরু হল। আমার এক আত্মীয়ের হাসপাতালে গিয়ে গর্ভনিরোধক ডিভাইস বের করলাম। কাজটা ছিল খুবই বিপদজনক। চীন সরকার জানতে পারলে আর রক্ষা ছিলো না!

তারপর বহুকষ্টে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমি চীন থেকে পালিয়ে ইউরোপ চলে আসি। কিন্তু ক্যাম্পের কথা আজো ভুলতে পারি না। কাউকে বলতেও পারি না। বুকের ভেতর সবসময় ভাঙচুর চলতে থাকে। হান চাইনিযদের যে নির্দয়, নিষ্ঠুর আচরণ আমি দেখেছি তার ভার বহন করা খুব কষ্টকর। মানব ইতিহাসের অন্যতম নিষ্ঠুর নির্যাতনের স্বাক্ষী আমি। এই অপরাধের অংশীদার আমি। মানবতার এই অধঃপতনের ইতিহাস আমি কখনোই ভুলতে পারবো না।

ভয়াবহ স্মৃতিগুলো আততায়ীর মতো দিনরাত তাড়া করে ফেরে আমাকে। ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেলেও স্মৃতির এই দংশন থেকে মনে হয় না আর মুক্তি পাব।

অন্তত মৃত্যুর আগে!

গিনিপিগ

প্রথমে দেখলে মনে হবে মজার কোনো খেলা। সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কিছু মানুষ। প্রত্যেকের বামে হাতে উল্কি। উল্কিতে বিশেষ একটা নম্বর লেখা। একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম। একটু দূরে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো হাসিমুখের এক লোক খাতা আর কলম নিয়ে একটা পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আয়েশি ভঙ্গি। লোকটার মুখে হাসি থাকলেও চোখ হাসছে না। সাপের মতো ঠান্ডা দুচোখ।

'রেডি?' সারিবেঁধে দাঁড়ানো মানুষদের প্রশ্ন করল হাসিমুখের লোকটা। ওরা নীরব থাকল। টেনশনে ভেঙে পড়ছে অনেকে। অনেকেই চুপচাপ স্থির হয়ে আছে। মনে কী চলছে বোঝা যাচ্ছে না। ঝড় আসার আগের পরিস্থিতির মতোই শান্ত ওরা।

'আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করতে পারি।' প্রত্যাশিত উত্তর না পেয়েও মুখের হাসি সরলো না ঠান্ডা চোখওয়ালার।

শুরু হলো খেলা।

এক একজন লোক, 'ঠান্ডা চোখের' সামনে দিয়ে দৌড়ে পার হয়ে গেল। আর সে খাতাতে টুকে নিল কিছু তথ্য। কে কতটা জোরে দৌড়াতে পারল, কত কম সময় নিল ইত্যাদি।

তথ্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই সারিবেঁধে দাঁড়ানো লোকদের দুভাগে ভাগ করা হবে। একদলকে বহাল রাখা হবে আগের কাজেই–ফ্যাক্টরির শ্রমদাস হিসেবে। অন্য দলকে পাঠানো হবে কয়েকটি জায়গায়। বুড়ো, অথর্ব, কাজ করতে অক্ষম লোকদের পাঠানো হবে গ্যাস চেম্বারে। এই ধরনের কাউকে কাউকে পাঠানো হবে ক্রিমোটোরিয়ামে–জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। আবার কাউকে

কাউকে পাঠানো হবে বিভিন্ন টপ সিক্রেট ল্যাবে। নৃশংস মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট চালানো হবে ওদের ওপর![১৪১]

পাঠক আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই ঠান্ডা চোখের লোকটার সঙ্গে। অত্যন্ত মেধাবী এই লোকটা জার্মান, নাম ড. জোসেফ ম্যাঙ্গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের বইগুলোতে যাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় 'মৃত্যুর ফেরেশতা' হিসেবে। ড. জোসেফ ম্যাঙ্গেল, 'অ্যানজেল অফ ডেথ'!

নাৎসি জার্মানি গড়ে তুলেছিল অনেকগুলো টপ সিক্রেট মেডিকেল ল্যাব। এই ল্যাবগুলোতে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের নিয়ে গা শিউরে ওঠা সব এক্সপেরিমেন্ট চালানো হতো! তখনকার সময়ের প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস, যক্ষ্মার মতো রোগের জীবাণু বন্দীদের শরীরে প্রবেশ করানো হতো। তারপর পিল বা ইনজেকশন দিয়ে এসব রোগের পরীক্ষামূলক প্রতিষেধক দেয়া হতো বন্দীদের। কোনো কোনো বন্দীকে বিষ খেতে দেয়া হতো গোপনে। বন্দীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা হতো। অথবা সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হতো। তারপর লাশ কেটেকুটে দেখা হতো বিষ বন্দীর শরীরে কী প্রভাব ফেলল। কম সময়ে কম খরচে গণহারে বন্ধ্যাকরণের উপায় জানতে চালানো হতো একের পর এক রোমহর্ষক পরীক্ষা। এক্সরে রেডিয়েশনের সম্মুখীন করা হতো নারী-পুরুষ সবাইকে। কোনোপ্রকার অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়াই পুরুষদের লিংগ কেটে নেওয়া হতো। ক্রস সেকশন করে দেখা হতো রেডিয়েশনের ফলে লিংগে কেমন পরিবর্তন এল।

বুঝতেই পারছেন, এই অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য বন্দীদের নির্বাচন করার কাজটা ছিল বেশ কষ্টকর। নির্দয় নাৎসি ডাক্তাররাও এই কাজটা করতে চাইত না। তাদের হয়ে এই কাজটা করে দিত ড. জোসেফ ম্যাঙ্গেল—অ্যানজেল অফ ডেথ।

সে নিজেও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ল্যাব গড়ে তুলেছিল। আউশভিৎস ক্যাম্পে পুরো নরক গুলজার করে ছেড়েছিল। যমজ বাচ্চাদের নিয়ে তার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এমন কিছু নেই যা যমজদের শরীরে ইনজেকশন দিয়ে ম্যাঙ্গেল ঢোকায়নি। ক্লোরোফরম থেকে শুরু করে পেট্রোল, বাদ দেয়নি কিছুই। খুব কষ্ট দিয়ে বাচ্চাদের হাতে বা পায়ে গ্যাংগ্রিনের সংক্রমণ ঘটাত সে। তারপর নিজের আবিষ্কৃত ওষুধ পরীক্ষা করত ওদের ওপর। চোখের মণির রং নিয়েও অনেক আগ্রহ ছিল ম্যাঙ্গেলের। বন্দীদের শরীর থেকে কেটে নিয়ে সংগ্রহ করেছিল হাজার হাজার চোখ। ছবি বা শোপিস সাজিয়ে রাখার মতো করে সাজিয়ে রেখেছিল দেয়ালে।[১৪২]

[১৪১] Night, Elie Wiesel. https://tinyurl.com/y৭৯euleu
[১৪২] How Josef Mengele Became The Angel Of Death, Richard Stockton. June

পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে ভাবতে শুরু করেছেন, উইঘুরদের কথা বলতে গিয়ে ম্যাঙ্গেল আর নাৎসিদের চালানো হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টের কথা কেন টানছি?

কারণ আছে।

নাৎসিদের মতো করেই যে উইঘুরদের ওপর মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে হান চাইনিযরা!

ক্যাম্পফেরত বেশ কয়েকজনের মুখ থেকে শোনা যাক উইঘুরদের ওপর চালানো মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টের কথা।

সাইরাগুল সাউতাবাই বলছেন,

'বন্দীদের অজান্তেই ক্যাম্পে তাদের ওপর খুব ঠান্ডা মাথায় নানা মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট চালাত চীনারা। বড় এক মাস্টারপ্ল্যানের অংশ এটা। আমার কাছে এমনটাই মনে হয়েছে। তা না হলে এত ঘনঘন কেন বন্দীদের ধরে নিয়ে মেডিকেল চেকআপ করানো হতো? বিভিন্ন টেস্ট করানো হতো? জোর করে ইনজেকশন দিত ওরা। পিল খেতে বাধ্য করত। বলত, 'রোগব্যাধি থেকে এগুলো তোদের রক্ষা করবে।' একদম মিথ্যে কথা; বরং এই ওষুধ খেয়েই অনেক বন্দী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। একজন নার্স আমাকে একবার চুপি চুপি জানিয়েছিল, 'কক্ষনো ওসব ওষুধ খাবেন না। এগুলো খুবই ক্ষতিকর।'

পিল খাওয়ার পর বন্দীরা দুর্বল হয়ে যেত। মাসিক বন্ধ হয়ে যেত মহিলাদের। একদিকে সুস্থ বন্দীদের জোর করে পিল খাওয়ানো হতো, ইনজেকশন দেয়া হতো। আবার কারও যখন আসলেই ওষুধের দরকার পড়ত, তখন চিকিৎসা দেয়া হতো না।'[১৪৩]

আরেকজন ক্যাম্পফেরত নারী মিহিরগুল তারসুন। তিনি শোনাচ্ছেন পাতেমহান নামের এক নারীর মর্মান্তিক কাহিনি।

'পাতেমহানকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে আসে তখন তার বাচ্চারা বাড়ির পেছনের উঠোনে লুকিয়ে ছিল। বাচ্চাদের কথা মনে করে মাথানিচু করে কাঁদত সে। বুকখালি

6th, 2016. https://tinyurl.com/y7sxb6x9

The twins of Auschwitz, Andy Walker. BBC News, January 28th, 2015. https://tinyurl.com/wkd8kvq

Lifton, Robert Jay, 1926- author. (16 May 2017). The Nazi Doctors: medical killing and the psychology of genocide. ISBN 978-0-465-09339-7. OCLC 1089625744

[১৪৩] A Million People Are Jailed at China's Gulags. I Managed to Escape. Here's What Really Goes on Inside. David Stavrou. Hareetz, October 18th, 2019. https://tinyurl.com/y6m9kjl4

করা দীর্ঘশ্বাসে গুমোট হয়ে যেত ৪৩০ স্কয়ার ফিটের সেলটা। অচেনা একধরনের পিল খেতে বাধ্য করা হয়েছিল আমাদের। সেই সাথে সাদা রঙের কিছু তরল ওষুধ। পিল খাবার পরে মাথার ভেতর সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। আমরা মূর্ছা গেলাম। এরপর থেকে আমাদের চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝেই এলোমেলো হয়ে যেত। সাদা লিকুইড খাবার পর একেকজনের শরীর একেক রকমভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল। অধিকাংশের মাসিক বন্ধ হয়ে গেল। আবার কয়েকজনের মারাত্মক ব্লিডিং হলো। পিলের প্রভাবেই পাতেমহানের ব্লিডিং শুরু হয় একদিন। এক মাস ধরে ব্লিডিং হতে থাকে তার। এই পুরো একটা মাস ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ ওর কোনো ধরনের চিকিৎসা করেনি। আমাদের থাকার সেলগুলো ছিল খুব ছোট। সব বন্দী একসঙ্গে ঘুমুতে পারত না। পালাক্রমে ঘুমুতে হতো। একদল যখন ঘুমুত বাকিরা তখন দাঁড়িয়ে থাকত। একরাতে পালা করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কাটা গাছের মতো ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল পাতেমহান। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। ছুটে এল মাস্ক পরা বেশ কয়েকজন লোক। পা ধরে টেনে নিয়ে গেল। তারপর থেকে পাতেমহানের আর কোনো খবর আমরা কেউ জানি না।’[১৪৪]

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়া গুলবাহার জালীলের ভাষ্যমতে ইনজেকশন দেয়া হতো প্রতি দশ দিন পরপর। আর আল্ট্রাসনোগ্রাফি হতো রুটিন করে।[১৪৫]

আট মাস ক্যাম্পে কাটিয়েছেন যারকিয়ানবেক ওতান। ৩২ বছরের যুবক ওতান জানাচ্ছেন, ‘ক্যাম্পে আমাদের কাছ থেকে সব কাপড় নিয়ে গিয়েছিল ওরা। একধরনের ক্যাম্প ইউনিফর্ম দেয়া হয় আমাদের। বলা হয়, এই বিশেষ পোশাক আমাদেরকে নাকি ফ্লু এবং এইডস থেকে সুরক্ষা দেবে! আসলেই ফ্লু এবং এইডস থেকে সুরক্ষা দিয়েছে কি না বলতে পারব না, তবে ওদের ইউনিফর্ম ছিল খুব ভারী আর অস্বস্তিকর। শরীরের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাম্পের বন্দিত্বের পর আমি সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। মাঝে মাঝেই স্মৃতিশক্তি কাজ করে না ঠিকঠাকমতো।’[১৪৬]

৩২ বছর বয়সী রাখিমা সেনবাই গ্রেফতার হন স্মার্টফোনে হোয়াটসঅ্যাপ রাখার অপরাধে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাবার সাথে সাথেই এক নারী চাইনিয ডাক্তার জোর

---

[১৪৪] Video: In Full – Ex-Xinjiang detainee Mihrigul Tursun’s full testimony at the US congressional hearing. Hong Kong Foreign Press, December 8th, 2018. https://tinyurl.com/u4mwf7g

[১৪৫] Bloody Harvest—How Everyone Ignored the Crime of the Century. Aaron Sarin. Quillette, January 3rd, 2020. https://tinyurl.com/te6lshr

[১৪৬] A Million People Are Jailed at China’s Gulags. I Managed to Escape. Here’s What Really Goes on Inside. David Stavrou. Hareetz, October 18th, 2019. https://tinyurl.com/y6m9kjl4

করে তার যোনিতে Intrauterine contraceptive device (IUD)[১৪৭] (গর্ভনিরোধে ব্যবহৃত এক ধরণের যন্ত্র) বসিয়ে দেয়। রাখিমা সেনবাই বাধা দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ডাক্তার কোনো কথা শোনেনি। সাফ সাফ জানিয়ে দেয়, 'ক্যাম্পে আসা প্রত্যেক মেয়েকে এটা নিতেই হবে।'

গুলজাহান নামের একজন কাযাখ এক্টিভিস্ট জানাচ্ছেন, 'সাত সাতজন ক্যাম্পফেরত নারী আমাকে বলেছেন, শরীরে গর্ভনিরোধক ডিভাইস স্থাপন করতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। মাত্র কিছুদিন হলো আমি এসব ব্যাপারে কাজ করা শুরু করেছি। এরই মধ্যে সাতজন নারী এসে আমাকে গর্ভনিরোধক ডিভাইসের কথা বলেছেন, সামনে না জানি আরও কত কী অপেক্ষা করছে!'[১৪৮]

শুধু ক্যাম্পেই নয়, বরং ক্যাম্পের বাইরেও উইঘুর নারীদের বাধ্য করা হচ্ছে IUD ব্যবহার করার জন্য। জোর করে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। ২০১৪ সালে ২ লাখ উইঘুর নারীর শরীরে গর্ভনিরোধক ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে সেটা ৬০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৩০ হাজারে। অথচ এই সময় চীনের অন্যান্য প্রদেশে গর্ভনিরোধক ডিভাইস ব্যবহার অনেক কমে গেছে।[১৪৯]

২০১৭ এর ডিসেম্বরে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয় ৩৮ বছর বয়সী গুলজিরা মজদিনকে। কারণ, এই নারী মোবাইল ফোনে ওয়াটসঅ্যাপ রাখার দুঃসাহস দেখিয়েছে! প্রথমে তাকে কয়েকদিন গৃহবন্দী করে রাখা হয়। নিকটস্থ হাসপাতালের ডাক্তাররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওকে। বের হয় গুলজিরা ১০ সপ্তাহের গর্ভবতী!

তারপরেও কনসেন্ট্রশেন ক্যাম্পে পাঠানো হয় তাকে। কর্তৃপক্ষ বলে, 'তোমার তিনটা বাচ্চা তো রয়েছেই। আবার কেন মা হবে তুমি? তোমার গর্ভপাত করতে হবে।' পরের মাসে ডাক্তারেরা গুলজিরার গর্ভ থেকে ভ্রূণ কেটে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে নিয়ে আসে–কোনো রকমের অ্যানেস্থেশিয়া ব্যবহার করা ছাড়াই। যন্ত্রণার প্লাবন বয়ে যায় গুলজিরার ওপর দিয়ে। এখনো গর্ভপাত-পরবর্তী জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি গুলজিরা। দেহের ক্ষতি হয়তো একদিন পুষিয়ে নিতে পারবে ও। কিন্তু হৃদয়ে যে গভীর ক্ষত জন্ম নিয়েছে তা কি কখনো পূরণ হবে? হৃদয়ে শেকড় গাড়া বিষকাঁটা কী কখনো

---

[১৪৭] প্রাগুক্ত

[১৪৮] Abortions, IUDs and sexual humiliation: Muslim women who fled China for Kazakhstan recount ordeals. Amie Ferris-Rotman. The Washington Post, October 5th, 2019. https://tinyurl.com/yxm6tjxp

[১৪৯] China imposes forced abortion, sterilisation on Uyghurs, investigation shows। ABC News, June 30th, 2020. https://tinyurl.com/yb9dedaq

গোলাপে পরিণত হবে?

কাযাখস্তানের আলমাতেই শহরে বসে সাক্ষাৎকার দেবার সময় ম্লান মুখে গুলজিরা বলছিলেন, 'গর্ভপাতের দিন দুজন মানুষ বিদায় নেয় দুনিয়া থেকে। আমার গর্ভের সন্তান আর আমি!'

'এক পরিবার, এক সন্তান' নীতি থেকে চীন সরে এসেছে অনেক আগেই। কিন্তু উইঘুর-কাযাখদের বেলায় সে হিসেব আলাদা।

২০১৬ এবং ২০১৭ এই দুই বছর দুইবার কাযাখ গোত্রের এক নারী গর্ভপাত করতে বাধ্য হন। এই নারীর আত্মীয়স্বজন এখনো চীনে বাস করেন। নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে স্বজনদের খুঁজে বের করে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে—এই ভয়ে মিডিয়ার সামনে আসতে চান না উনি। ভদ্রমহিলার আইনজীবী আইমান উমারোভা—যিনি একজন মানবাধিকারকর্মী—জানাচ্ছেন, 'মুসলিম নারীদের ওপর চীন সরকার একটা ছক ধরে ঠান্ডা মাথায় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, জোরপূর্বক গর্ভপাত, জন্মনিরোধক পিল খেতে বাধ্য করা ইত্যাদি ব্যবহার করছে মুসলিম নিপীড়নের অস্ত্র হিসেবে।'

ওয়াশিংটন পোস্টের একজন সাংবাদিক দেখা করেন দুজন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকের সঙ্গে। দুজনের স্ত্রীই উইঘুর, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী। অস্ট্রেলিয়ানদের একজনের নাম আলমাস নিযামিদিন। অসহায় কণ্ঠে নিযামিদিন বললেন, '২০১৭ সালে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আমার স্ত্রীকে গর্ভপাত করতে বাধ্য করা হয়।'[১৫০]

গুলজিরা আয়উলখানের অভিজ্ঞতা একটু অন্যরকম। তিনি জানাচ্ছেন, 'নতুন এই ক্যাম্পে আমাদের উৎসাহিত... না, ঠিক উৎসাহিত না, আসলে বাধ্য করা হতো মাসে একবার স্বামীদের সঙ্গে ক্যাম্পে সময় কাটানোর। স্বামীর সঙ্গে সময় কাটানো মানে বুঝছেন তো?

আমার স্বামী তো চীনে ছিল না, কাজেই আমাকে ওরা কিছু বলত না। কিন্তু যাদের স্বামী চীনে থাকত, তাদেরকে অবশ্যই মাসে একবার নিজেদের স্বামীর সঙ্গে দুঘণ্টা একসাথে থাকতে হতো। নির্দিষ্ট দিন বন্দী কোনো নারীর স্বামীকে নিয়ে আসা হতো ক্যাম্পে। স্বামীকে বলে দেয়া হতো, আসার সময় যেন চাদর নিয়ে আসে। তারপর বন্দী নারীকে পিল খাইয়ে পাঠিয়ে দেয়া হতো একটা কক্ষে। ঘড়ি ধরে দুঘণ্টা স্বামীর সঙ্গে সেই কক্ষে

---

[১৫০] Abortions, IUDs and sexual humiliation: Muslim women who fled China for Kazakhstan recount ordeals. Amie Ferris-Rotman. The Washington Post, October 5th, 2019. https://tinyurl.com/yxm6tjxp

সময় কাটাতে হতো তাকে।

বয়স্কা মহিলাদেরও বাধ্য করা হতো এই কাজে। আমাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধা ছিলেন। খুবই বয়স্ক। উনাকে পর্যন্ত ছাড় দেয়নি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ। কেন সে তার স্বামীকে ডেকে পাঠাচ্ছে না–এই নিয়ে দিনরাত বৃদ্ধাকে বিদ্রুপ করত ওরা। শেষমেশ কোনো উপায় না পেয়ে সেই বেচারিকেও দুই ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হয় স্বামীর সঙ্গে।

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুব রহস্যময় মনে হতো। স্বামীর সঙ্গে সময় কাটানোর আগে মেয়েদের ওরা যে পিল খেতে দিত সেটা খুব সম্ভবত জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল। কেউ যদি গর্ভধারণ করে ফেলে, তাহলে গর্ভপাত করানো হতো। আপত্তি জানালেই পাঠিয়ে দেয়া হতো আরও ভয়ংকর, আরও কুখ্যাত কোনো ক্যাম্পে।

আমার মনে হয়, বন্দিনীদের ওপর নতুন ধরনের কোনো ওষুধের পারফর্মেন্স পরীক্ষা করত চাইনিয কর্তৃপক্ষ। না হলে এভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় কাটাতে বাধ্য করার কারণটা কী?

একটা টিকাও দেয়া হলো আমাকে। ওরা বলল, ক্যাম্পে ফ্লু যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য এই প্রতিষেধক দেয়া। এক মাস পর তারা আমাদের রক্ত নিয়ে গেল পরীক্ষা করার জন্য। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই বলা নেই কওয়া নেই হুট করে এসে রক্ত নিয়ে যেত। এভাবে রক্ত নিয়ে ওরা কী যে করত আল্লাহ মাবুদই জানেন! বোধহয় কোনো মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিল আমাদের ওপর!’

উইঘুর শিশুরাও রেহায় পায়নি চাইনিযদের মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টের হাত থেকে। কিন্ডারগার্টেন-পড়ুয়া উইঘুর শিশুদের রোজ সকালে স্কুল গেটে একধরনের অজানা ‘ভিটামিন’ মেশানো তরল খাওয়াচ্ছে হান চাইনিযরা।[১৫১]

ক্যাম্পফেরত ব্যক্তিদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, নাৎসিদের মতো করেই বন্দীদের ওপর বিভিন্ন অমানবিক মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে হান চাইনিযরাও। তবে হান চাইনিযদের মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টের বীভৎসতা কী নাৎসিদের মতোই, নাকি তার চাইতেও বেশি? এখন এই প্রশ্নের উত্তর সুনিশ্চিতভাবে দেয়া সম্ভব না। সূত্রগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, এক করে মালা গেঁথে সিদ্ধান্তে পৌঁছার উপায় নেই।

তবে অন্য একটা গা শিউরে ওঠা সত্য প্রকাশিত হয়েছে এরই মধ্যে। কী সেই সত্য? আলোচনা আসছে সামনের লেখাতেই ইনশা আল্লাহ!

---

[১৫১] Dr. Erkin Sidick, Twitter Post, April 5th, 2020. https://tinyurl.com/y4xyhhqf

কসাইখানা
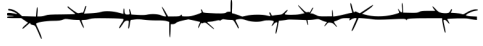
এক.

মুখের মাস্ক খুলে ফেলেছে আগেই, হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হলো মাত্র দুদিন আগে চল্লিশতম জন্মদিনের কেক কাটা সার্জন। একসময় একহারা গড়ন ছিল, এখন পেটে চর্বি জমেছে। চশমটা নাকের ডগা বরাবর নেমে এসেছিল, ঠেলে ওপরে তুলে দিলো সার্জন। চশমার পেছনের চোখদুটো গাঁজাখোরদের মতো লাল। না, সার্জন গাঁজা খায়নি; পরপর কয়েকটা রাত প্রায় নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে তাকে ওটিতে। রোগীর চাপ বেড়েছে। মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত। অপারেশন একদম সাকসেসফুল। তবে রোগীকে বাঁচানো যায়নি! অবশ্য বাঁচানোর ইচ্ছেও ছিল না!

রোগীকে অজ্ঞান করা হয়নি, লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দেয়া হয়েছিল। হাত-পা হ্যান্ডকাফ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল বেডের সঙ্গে। মুখে স্কচটেপ প্যাঁচানো। বেচারাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানো হয়েছিল মেডিকেল চেকআপের কথা বলে। বিন্দুমাত্র ধারণাও করতে পারেনি বেচারা কয়েক মুহূর্ত পর কী ঘটতে চলেছে তার সাথে!

অপারেশনের সময় রোগীর চোখ বেঁধে রাখে আমাদের এই সার্জন। আজকেও সেটাই করা হয়েছিল, তবে একপর্যায়ে এসে চোখ খুলে দিতে হয়েছে। চোখেরই অপারেশন যে!

বাঁধন খুলে দিতেই নগ্ন আতঙ্কভরা চোখে সার্জনের দিকে তাকিয়ে ছিল রোগী! দুচোখে অবিশ্বাস, মিনতি, আতঙ্ক মিলেমিশে একাকার...। বারবার সেই দৃষ্টির কথা মনে পড়ছে সার্জনের। আগে এ রকম হতো না। আলু, টমেটো যা, তার কাছে একজন রোগীও তা– কাটাকাটি করার বস্তু। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে দুর্বলতা জেঁকে বসেছে সার্জনের মনে।

ওয়াশরুমের দরজা খুলে বড় কাজটা সারল সার্জন। সড়সড় শব্দে ফ্ল্যাশ টেনে দিয়ে দাঁড়াল বেসিনের আয়নার সামনে। কল থেকে পরপর বেশ কয়েকবার আঁজলা ভরে পানি নিয়ে চোখমুখে ছিটাল। মন যেন কিছুটা শান্ত হলো। আয়নার দিকে তাকিয়ে চুলের ফাঁকে আঙুল চালিয়ে মনোযোগের সাথে চুল ঠিক করছে। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে, ভাবল সার্জন। হঠাৎ আয়নায় একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সার্জন। ধাঁই করে পেছনে ঘুরল এবং সত্যিই ভূত দেখল... ওয়াশরুমের বদ্ধ দরজা ভেদ করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা লোক—পাঁচ মিনিট আগে যাকে নিজের হাতে অপারেশন থিয়েটারে মেরে রেখে এসেছে, সেই রোগী!

এক হাতে দুটো কিডনি আর অন্য হাতে খোলা দুচোখ নিয়ে তার দিকে চেয়ে বীভৎসভাবে হাসছে লাশটা।

প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইছে সার্জন! কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

এক পা এক পা করে তার দিকে এগিয়ে এল লাশটা। কিডনি দুটো শূন্যে দোলাচ্ছে, চোখের খালি কোটর দিয়ে রক্ত ঝরছে অশ্রুর মতো। রক্তে ভেসে গেছে দামি টাইলসের মেঝে। আরেকধাপ এগিয়ে এল লাশটা। ওর পেটের কাটা জায়গা দিয়ে সব নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে এসেছে। কিলবিল করছে অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে সেখান থেকে সরতে চাইলো সার্জন। কিন্তু নড়তে পারল না একচুলও। একদম কাছে চলে এল লাশ, ওর নিশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে সার্জন এখন। পচা আঁশটে গন্ধে বমি চলে এল সার্জনের, এক পাও নড়তে পারল না। কিলবিলে শুঁড়গুলো প্যাঁচিয়ে ধরল ওর গলা...

চমকে, প্রায় লাফ দিয়ে শোয়া থেকে উঠে বসল সার্জন। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে বুক। মধ্যরাতের নিঃস্তব্ধতা খান খান করে দিচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। আবারও সেই একই দুঃসপ্ন দেখল সার্জন। এই নিয়ে গত এক মাসে ২০ বারের মতো। ঘুমুলেই স্বপ্নটা ফিরে আসে বারেবারে। একটু ধাতস্থ হয়ে পাশে তাকাল। মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে সার্জনের স্ত্রী। বেডসাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে, ল্যাম্পের পাশে রাখা পানির গ্লাস থেকে ঢকঢক শব্দে পানি খেলো ও। জানালার ভেতর দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না ঢুকে পড়েছে ঘরে। আকাশে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ। হলুদ আলোয় কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে ঘরটাকে। ঘড়ি দেখল সার্জন। ১টা ৩৫ মিনিট। আর ঘুমানোর সাহস হলো না। জানালার পাশের চেয়ারটাতে গিয়ে বসল। স্ত্রীকে যখন ঘুম থেকে জাগাল ঘড়িতে তখন ২টা বেজে ৪৭ মিনিট। সময় হয়েছে স্ত্রীকে সবকিছু জানানোর!

দুই.

মেডিকেলের রেফারেন্স বইগুলোতে অর্গান ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট (Organ Transplant)-কে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে এভাবে,

> *'এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানবদেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে একই মানবের শরীরের অন্য জায়গায়, অথবা অন্য কোনো মানুষের শরীরে জুড়ে দেয়া হয়।'*

তা কোন কোন অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যায় এভাবে?

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, চোখ, স্কিন, টিস্যু, হাড়, পাকস্থলী, পেনিস, টেস্টিস ইত্যাদি। অঙ্গের লিস্টগুলো দেখে ইতিমধ্যেই নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন, কিছু কিছু অঙ্গ শুধু মৃত ব্যক্তির শরীর থেকেই পাওয়া সম্ভব। কারণ, এগুলো ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। তবে জীবিত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও কিছু কিছু উপায়ে এগুলো পাওয়া যায়!

জোর করে! প্রতারণা করে!

যার শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেয়া হয়, মানে যিনি দান করেন তাকে বলা হয় দাতা। আর যার শরীরে অঙ্গ জুড়ে দেয়া হয় তাকে বলা হয় গ্রহীতা। দাতা স্বেচ্ছায় অঙ্গ দান করতে পারেন। আবার সময় সময় বল প্রয়োগ করে, প্রতারণা করে দাতার অজান্তে বা দাতাকে জানিয়ে অঙ্গ কেটে নেয়া হয়। ধরুন, আপনাকে কিডন্যাপ করে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর আপনাকে জীবিত রেখেই ছুরি-কাঁচি দিয়ে একে একে কেটে নেয়া হলো আপনার কিডনি, লিভার, কর্নিয়া...

অথবা মনে করুন, মেডিকেল চেকআপের নামে কিংবা ছোটখাটো কোনো অপারেশনের কথা বলে ডেকে নিয়ে আপনার শরীর থেকে একটা কিডনি কেটে রেখে দেয়া হলো। আপনি টেরও পেলেন না কী অমূল্য জিনিস ওরা চুরি করে রেখে দিলো! কতটা অমানবিক, কতটা পশু হলে মানুষের পক্ষে এমন নৃশংস কাজ করা সম্ভব!

অর্গান হারভেস্টিং আর অর্গান ট্র্যান্সপ্ল্যান্টেশান কি একই বস্তু?

অনেকটাই তা-ই। তবে অর্গান হারভেস্টিং নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়। জোরপূর্বক দাতাদের কাছ থেকে অঙ্গ কেটে নেয়া আরকি!

সারা বিশ্বজুড়ে অর্গান ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যাপক চাহিদা। কিন্তু চাহিদার তুলনায় জোগান খুবই সীমিত। অর্গানের চাহিদা আকাশ ছুঁয়েছে বহু আগেই, কিন্তু অর্গানের জোগান ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে; আকাশছোঁয়া তো বহু দূরের কথা!

কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে আসি। বুঝতে সুবিধা হবে। কলেবর ছোট রাখার জন্য শুধু অ্যামেরিকার উদাহরণই আনলাম।

অ্যামেরিকাতে ২০১৫ সালে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অপারেশন হয়েছে ৩০,৯৭৩টি। এ সময় অঙ্গদাতার সংখ্যা ছিল ১৫,০৬২ জন। আর অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য ওয়েটিং লিস্টে ছিলেন ১,২২,০৭১ জন!

২০১৮ সালে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৩৬,৫২৯ জনে। দাতা ছিলেন ১৭,৫৫৪ জন আর ওয়েটিং লিস্টে ছিল ১,১৩,৭৫৯ জন![১৫২]

ওয়েটিং লিস্টেই আছে লাখের ওপরে মানুষ! প্রতি ১০ মিনিটে ১ জন করে অ্যামেরিকান যোগ দিচ্ছে এই লিস্টে![১৫৩]

ক্যানাডাতে যদি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে চান, তাহলে আপনাকে অপেক্ষা করা লাগবে ৪ বছর। কখনো কখনো ৭ বছরও লাগতে পারে।[১৫৪] ন্যাশনাল কিডনি ফাউন্ডেশন জানাচ্ছে অ্যামেরিকাতে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য অপেক্ষা করা লাগবে সাড়ে তিন বছর।[১৫৫] ইংল্যান্ডের জন্য সময়টা ২ থেকে ৩ বছর। তবে এর বেশিও লাগতে পারে।[১৫৬]

প্রতিদিন অ্যামেরিকাতে বিশটা করে নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে, বিশটা করে কফিন কবরে নামানো হচ্ছে। কফিনগুলি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সুযোগ আসার অপেক্ষা করতে করতে মারা যাওয়া মানুষের। প্রয়োজনীয় অঙ্গের অভাবে সঠিক সময়ে অপারেশন করতে না পেরে প্রতিদিন ২০ জন করে মানুষ মারা যায় অ্যামেরিকায়![১৫৭]

আশা করি বুঝতে পেরেছেন চাহিদার বিপরীতে মানব অঙ্গের জোগান কতটা কম! কারণটা খুবই সহজ। নিজের শরীর থেকে অঙ্গ কেটে অন্য মানুষকে দিতে কে চায় বলুন? মানব অঙ্গের সবচেয়ে বড় জোগান আসে মৃতদেহ থেকে। কিন্তু মরণোত্তর দেহদান কয়জন করতে চায় বা কয়জনের আত্মীয়স্বজন রাজি হবে তাদের প্রিয়

---

[১৫২] Organ Donation and Transplantation Statistics: Graph Data. Organdonor.gov, U.S Government Information On organ Donation and Transplantion. https://tinyurl.com/mocbqez

[১৫৩] Organ Donation Statistics. Organdonor.gov, U.S Government Information On organ Donation and Transplantion. https://tinyurl.com/sf9yhgo

[১৫৪] Organ Donation," The Kidney Foundation of Canada, https://www.kidney.ca/organ-donation

[১৫৫] Waiting list," NHS, October 14, 2015, https://tinyurl.com/qqdnjel

[১৫৬] প্রাগুক্ত

[১৫৭] Organ Donation Statistics. Organdonor.gov, U.S Government Information On organ Donation and Transplantion. https://tinyurl.com/sf9yhgo

মানুষটার লাশ যথাযথ মর্যাদায় কবর না দিয়ে কাটাকুটি করার জন্য ডাক্তারদের হাতে তুলে দিতে!

চাহিদা জোগানের এই আকাশ-পাতাল ফারাক বৈধভাবে কমিয়ে একে অপরের কাছে আসার সুযোগ অত্যন্ত কম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দাম আকাশছোঁয়া, অপারেশন ব্যয়বহুল—এমন জটিল, সংকটময় পরিস্থিতিতে অবশ্যই একদল মানুষ সুযোগ নেবে। এ ক্ষেত্রে সুযোগটা নিচ্ছে মানব পাচারকারীর দল।

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলি-এর Medical Anthropology ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসর ন্যান্সি শেপার হিউস। ভদ্রমহিলা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন শাখার একজন উপদেষ্টাও। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন অর্গান হারভেস্টিং, চোরাচালান ইত্যাদির ওপরে। তিনি বলছেন, ‘জি, আসলেই মানব পাচারকারীরা অর্গান সংগ্রহের জন্য মানব পাচার করে। হয়তো আপনার বাড়ির পাশের হাসপাতালেই চোরাই অর্গান কেনাবেচা হয়।’[১৫৮]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধারণা করছে, ব্ল্যাক মার্কেটে বছরে প্রায় দশ হাজার কিডনি কেনাবেচা হয়। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় দুটো করে কিডনি বিক্রি হচ্ছে চোরাই মার্কেটে। Global Financial Integrity (GFI) বলছে, আনুমানিক প্রতি দশটা অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্ট অপারেশনের ১টা হয় মানব পাচারকারীদের কাছ থেকে কেনা লিভার, কিডনি কিংবা ফুসফুস নিয়ে।’[১৫৯],[১৬০]

আফ্রিকার কিছু দেশ, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, ফিলিপাইন, ইরান ইত্যাদি হলো মানব অঙ্গ চোরাচালানকারীদের স্বর্গরাজ্য। দারিদ্র্য, জনসংখ্যার আধিক্য, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানব পাচারকারীর দল জোর করে, ধোঁকা দিয়ে, মেরে ফেলে বা সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে পানির দরে কিনে নিয়ে আসে মানব অঙ্গ। দাতা সুস্থ কি না, তার অঙ্গ গ্রহীতার অঙ্গে জুড়ে দিলে গ্রহীতার কোনো ক্ষতি হবে কি না এসবের চিন্তা ওরা করে না। ওদের দরকার নগদ টাকা! আর কোনো কিছু চিন্তার সময় ওদের নেই।

সেক্স ইন্ডাস্ট্রি নামক ইউরোপ-অ্যামেরিকার নব্য দাসপ্রথার জন্য পাচার হওয়া হতভাগ্য

---

[১৫৮] What you need to know about human organ trafficking, Phillip Perry. Big Think, April 25th, 2016. https://tinyurl.com/wt78dd8

[১৫৯] Transnational Crime and the Developing World, Global Financial Integrity, March 2017. https://tinyurl.com/wrdztxn

[১৬০] Denis Campbell and Nicola Davison, Illegal kidney trade booms as new organ is sold ‘every hour,’ The Guardian, May 27, 2012, -https://tinyurl.com/rd7q4na

মানুষদের কাছ থেকেও সময় সময় অর্গান কেটে নেয় ওরা। ধরুন, ভারত বা ব্রাজিলের কোনো মেয়েকে ইউরোপ-অ্যামেরিকার কোনো পতিতালয় বা পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বিক্রি করার জন্য পাচার করা হলো। ওর শরীর থেকে যতটুকু ফায়দা নেবার সবটুকু নিয়ে নিল সেক্স ইন্ডাস্ট্রি। তারপর ওকে পাঠিয়ে দিলো কোনো কসাইখানায়। ডাক্তার নামের কোনো কসাই ওর সম্ভাব্য বিক্রয়যোগ্য প্রত্যেকটি অঙ্গ কেটে রেখে দিলো–কিডনি, হৃৎপিণ্ড, চোখ, লিভার ইত্যাদি। একটা মানুষ থেকে দুই-তিনবার লাভ করল মানব পাচারকারীর দল। লাভের ওপর লাভ। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সাম্যবাদের ফিচারওয়ালা আধুনিক এই পৃথিবীতে মানবদেহ চমৎকার এক পণ্য!

ইউরোপ-অ্যামেরিকাসহ পৃথিবীর সব নামিদামি হসপিটালে এই চোরাই মানব অঙ্গগুলো বিক্রি হয়। একেকটার দাম পড়ে একেক রকম। দাম শুরু হয় ত্রিশ হাজার ইউএস ডলার থেকে। কর্নিয়ার দাম সবচেয়ে কম। ফুসফুস কিনতে হলে আপনাকে গুনতে হবে কমপক্ষে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার। হৃৎপিণ্ডের জন্য এক লাখ ত্রিশ হাজার ডলার। লিভার আর কিডনির দাম কিছুটা কম। লিভারের দাম শুরু হয় আটানব্বই হাজার মার্কিন ডলার থেকে আর কিডনির বাষট্টি হাজার![১৬১]

চরম এক টাকার খেলা!

এই ইন্ডাস্ট্রি ঠিক কত বড়, তার সঠিক কোনো হিসেব কারও কাছে নেই। ভূতের মতো কাজ সারে অর্গান হারভেস্টিং গ্যাং। মারাত্মক সংগঠিত এরা। চুনোপুঁটিরা কখনো কখনো ধরা পড়লেও সব সময় ধরাছোঁয়ার আড়ালেই থেকে যায় রাঘববোয়ালরা। টাকা-পয়সার আদান-প্রদানও করে খুবই গোপনে। ব্যবহার করে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। Global Financial Integrity (GFI) এর মতে প্রতিবছর প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লেনদেন হয় এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তবে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবার সম্ভাবনা আছে। কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যদি বছরে এক বিলিয়ন টাকার বেশি লেনদেন হয়, তাহলে সেখানকার সব অর্থনৈতিক আদান-প্রদান নজরদারির আওতায় রাখার সক্ষমতা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নেই।[১৬২]

তবে পৃথিবীর মধ্যে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট ব্যবসাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে একটা দেশ। আর সেটা হলো চীন। বিশ্ব পাড়ায় নতুন এক রংবাজের উত্থান দেখছে পৃথিবী।

---

[১৬১] Organ Trafficking: The Unseen Form of Human Trafficking. Christian Bain & Joseph Mari. Acams Today, June 26th, 2018. https://tinyurl.com/y3rg27xz

[১৬২] Transnational Crime and the Developing World, Global Financial Integrity, March 2017- https://tinyurl.com/wrdztxn

Organ trade. Wikipedia. https://tinyurl.com/rl9g6yu

তথ্য-প্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়েছে, নিজেদের মতো করে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে। এখন অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্টকে চীন নিয়ে গেছে একেবারে শিল্পের পর্যায়ে।

অ্যামেরিকা, ক্যানাডা বা ইংল্যান্ডের মতো বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোতেও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সুযোগ পেতে যেখানে রোগীদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় সেখানে চীনে ওটা মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার! কিছু কিছু রোগীর ভাগ্য তো আরও ভালো। ওরা চীনে নামে, হাসপাতালে যায়, অপারেশন করে খুশিমনে আবার উড়াল দেয় বাড়ির উদ্দেশে! চীনের হাসপাতালগুলো আপনাকে দিনক্ষণসহ বলে দেবে, অমুক দিন আসুন, স্বাস্থ্যবান একটা হৃৎপিণ্ড পেয়ে যাবেন!

এটা কীভাবে সম্ভব?

সারা বিশ্বে যেখানে অর্গানের মারাত্মক ঘাটতি সেখানে চীনে এত ছড়াছড়ি কীভাবে? অন্যান্য দেশে যখন কেবল কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের সুযোগ পেতেই বছর বছর লেগে যাচ্ছে, অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে চীনে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই কীভাবে অর্গান ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব? ওদের কাছে বাড়তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনিঃশেষ কোনো ভান্ডার আছে নাকি? নাকি ওদের জীবিত মানুষের খোঁয়াড় আছে? মুরগির দোকানে গিয়ে চাওয়ামাত্র দোকানদার যেমন মুরগি জবাই করে মাংস দেয়, ঠিক তেমনি ওরা চাওয়ামাত্র কোনো মানবসন্তানকে জবাই করে অর্গান দেয়। হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি, ফুসফুস... যার যা লাগবে লন, দেইখ্যা লন, বাইছ্যা লন?

চীনে প্রতিবছর প্রায় ৬৯,৩০০টি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অপারেশন করা হচ্ছে। দাতার সংখ্যা কত জানেন?

মাত্র ৫,১৪৬!

কেমনে কী!

ম্যাজিক দেখাচ্ছে নাকি চীনারা? বাকি অঙ্গগুলো আসছে কোথা থেকে? কারা দিচ্ছে? যারা দিচ্ছে তারা কি স্বেচ্ছায়, জেনেশুনে দিচ্ছে? নাকি জোর করে ওদের অজান্তে শরীর থেকে কেটে নেয়া হচ্ছে?

অলক্ষ্যে থেকে কেউ কি কোনো নোংরা খেলা খেলে যাচ্ছে? কোনো কিছুর গন্ধ কি পাচ্ছেন পাঠক? কেঁচো খুঁড়তে গেলে সাপ বের হয়ে আসবে না তো?

হচ্ছেটা কী চীনে?

তিন.

আপনি যদি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শোনেন, তাহলে খেয়াল করবেন প্রত্যেক ক্যাম্পে একটা ছক অনুসরণ করা হচ্ছে। বন্দীদের আগাগোড়া চেকআপ করা হচ্ছে, নিয়মিত ইনজেকশান দেয়া হচ্ছে, অজানা ওষুধ গিলতে বাধ্য করা হচ্ছে, রক্তের স্যাম্পল নেয়া হচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে, করা হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট। শুধু কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের নয়, বরং পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রায় সকল উইঘুর আর কাযাখ মুসলিমের ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে। ডিএনএ এর তথ্য, আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে, করা হয়েছে আইরিস স্ক্যান। হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি, ফুসফুস চেক করা হয়েছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে ১৮ মাসের মাথাতেই তৈরি করা হয়েছে প্রায় প্রত্যেক উইঘুর নারী-পুরুষের মেডিকেল ডাটাবেস। সরকার কেন এভাবে উইঘুরদের মেডিকেল ডাটাবেস তৈরি করছে স্বভাবতই জানতে চেয়েছিল উইঘুররা। কেন আমাদের রক্ত নিচ্ছেন? কিডনি, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, চোখ সব পরীক্ষা করছেন? সরকার বলেছিল এটা কেবল স্বাভাবিক মেডিকেল চেকআপ।

তো মেডিকাল চেকআপের ফলাফল কী? ফলাফল উইঘুরদের জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছিল আপনারা সুস্থ। সমস্যা থাকলে আপনাদের জানাব! পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হয়েছে উইঘুর আর কাযাখদের!

মাত্র ১৮ মাসের ব্যবধানে তড়িঘড়ি করে ২৬ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করে দুই কোটির মতো মুসলিম উইঘুর, কাযাখদের মেডিকেল ডাটাবেস তৈরি করা হলো? শুধু স্বাভাবিক চেকআপের জন্যে?[১৬৩]

মাথায় গুবরে পোকা ভরা থাকলেও বুঝে নিতে সমস্যা হয় না যে সরকার সত্য বলেছে না।

তাহলে সত্যটা কী?

ড. ইরকিন সিদিক একজন অপটিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট। রহস্যের জট খোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিচ্ছেন এই প্রফেসর সাহেব। তার কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি রোমহর্ষক তথ্য :

---

[১৬৩] China: Minority Region Collects DNA from Millions. Human Rights Watch, December 13th, 2017. https://tinyurl.com/ycg5v9s2

Uyghurs Forced to Undergo Medical Exams, DNA Sampling. Radio Free Asia, May 19th, 2017. https://tinyurl.com/w456sq9

China: Police DNA Database Threatens Privacy. Human Rights Watch, May 15th, 2017. https://tinyurl.com/tehwbta

'চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১০ লাখেরও বেশি উইঘুরদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করেছে। এক গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য, আরেক গ্রুপ অর্গান হারভেস্টিংয়ের জন্য! অন্য গ্রুপগুলোর জন্য অন্যান্য পরিকল্পনা। যেমন ধরুন ঠান্ডা মাথায় তালিকা ধরে ধরে মেরে ফেলা! বিশাল বিশাল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের খরচ জোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে চীন সরকার। উইঘুরদের অর্গান বিক্রি করে তারা ঘাটতি পূরণ করছে। আমি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আমার নিজস্ব মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত তথ্য পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি কারও নাম বলতে পারছি না। পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে অনেকগুলো মানুষ মারাত্মক বিপদে পড়বে!'[১৬৪]

অনেক কিছুই খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ব্লাড গ্রুপিং যে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচির জন্য করা হয়নি এটা তো একদম নিশ্চিত। সরকার কাউকে রক্তদানের জন্য ডাকেনি। ব্লাড ব্যাংক বানানোই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো রক্ত দানে সক্ষম উইঘুরদের কাছ থেকে ব্যাগ ভর্তি করে রক্ত নিত। কিন্তু তারা নিয়েছে খুবই সামান্য রক্ত। দুই-তিন ফোঁটা!

ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি রক্ত নেয়া হতো আর ইনজেকশন দেয়া হতো, তাহলে তো জেলে বন্দী সবার কাছ থেকে রক্ত নেয়ার কথা, কিংবা ইনজেকশান দেয়ার কথা। শুধু উইঘুর, কাযাখদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে। আগে যেমন নেয়া হতো ফালুন গং[১৬৫] নামের আরেক সংখ্যালঘু ধর্মের লোকদের থেকে। তাহলে?

আরেক কারণে ব্লাড টেস্ট করা হয়ে থাকতে পারে—অর্গান হারভেস্টিং!

অর্গান হারভেস্টিংয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক। ডিএনএ, রক্তের গ্রুপ ম্যাচ করতে হবে। না হলে দাতার অর্গান গ্রহীতার শরীরে খাপ খাবে না। ঠিকমতো কাজ করবে না। আল্ট্রাসাউন্ড টেস্ট করার কারণও স্পষ্ট—দেহের ভেতরের অর্গানের

---

[১৬৪] China's Harvesting of Uyghur Organs Gets Darker. CJ Werleman. Byline Times, January 24th, 2020. https://tinyurl.com/vaeevxa

[১৬৫] ফালুন গং হল চৈনিক আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধীয় প্রথা, মেডিটেশন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কিছু ব্যায়ামের মিশেল। এটি একটি নতুন ধর্মীয় আন্দোলনও। ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে চীনের নাগরিক লি হংঝি ফালুন গং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চীন সরকার সে সময় আইন করে ধর্মপালন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয় দারুণ এক আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মেটাতে দলে দলে মানুষ ফালুন গঙের লাল-হলুদ পতাকার তলায় এসে জড়ো হয় । এদের সংখ্যা ১৯৯৯ সালে ১০ কোটি ছাড়িয়ে যায় । ফালুন গং-এর এই অভাবনীয় উত্থান চীনা কমিউনিস্ট সরকারকে অসম্ভব ভীত করে তুলে। কোন প্রমাণ ছাড়াই সরকার অভিযোগ করে বসে, ফালুন গং সরকার পতনের চক্রান্ত করছে। শুরু করে ধরপাকড়, অত্যাচার, জেল-যুলুম, হত্যা, গুম। What is Falun Gong?- https://tinyurl.com/y54sz67c

আকার-আকৃতি কেমন আছে, কী অবস্থায় আছে সেটা জানা। দেখুন কতটা আটঘাট বেঁধে ঠান্ডা মাথায় সবকিছুর ছক কষে মাঠে নেমেছে চীনের কমিউনিস্ট সরকার!

জানুয়ারীর ১৯ তারিখে (২০২০) প্রফেসর ইরকিন সিদিক টুইট করেন,

> *Halal Organs #HalalUyghurs*
>
> *'এইমাত্র খুব বিশ্বস্ত এক সূত্র থেকে জানতে পারলাম চীন কমিউনিস্ট সরকার সম্প্রতি উইঘুরদের অর্গান ব্যাপক আকারে সৌদি আরবে রফতানি করা শুরু করেছে। প্রত্যেক দিন সাংহাই থেকে সৌদি আরবে উইঘুরদের অর্গান পাঠানো হচ্ছে।'*

ঠিক একই রকম টুইট করেন আরেকজন ভদ্রলোক, একসময় পূর্ব তুর্কিস্তানের এক হসপিটালে সার্জন হিসেবে কাজ করা ডা. ইনভার তোথি:

> *'Halal organs' are real!*

সার্জন সাহেবের এ রকম টুইট করার পেছনে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে আইলি নামের এক মহিলা। এক চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেবার সময় চাইনিয এই মহিলা দাবি করে বসে, চীনের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নাগরিকদের দেহ থেকে অঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করার যে অভিযোগ উঠেছে তা একদম সত্য। চীনের তিয়ানজিন শহরের এক হাসপাতালে সে নিজে দেখেছে জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে জোর করে অর্গান কেটে নিয়ে বিক্রি করছে সরকার। তিয়ানজিন তাইডা হসপিটালের লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ডিপার্টমেন্ট ২০০৬ সালে এই অমানবিক কাজ করেছিল–আত্মবিশ্বাসী গলায় দাবি করে আইলি।

এটা দেখামাত্রই সার্জন ইনভার তোথির মনে পড়ে যায় তাঁর জীবনের সবচেয়ে কালো দিনটার কথা! ইনভার তোথি সেই দুঃসহ স্মৃতির ডালি খুলে দিচ্ছেন আমাদের সামনে। ভদ্রলোক বলছেন,

> '১৯৯৫ সালের ওই দিনটাতে আমার বস চিফ সার্জনের রুমে ডাক পড়ে আমার। কঠিন গলায় অর্ডার দেয় বস, 'তোথি তুমি এখনিই উরুমচির একজিকিউশন গ্রাউন্ডে যাবে। ওখানে একটা রুমে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া একজন বন্দী থাকবে। তুমি তার শরীর থেকে লিভার এবং দুটো কিডনিই কেটে নেবে।'
>
> এ রকম কাজ আমি এর আগে কখনো করিনি। কাজটা করতে মন সায় দিচ্ছিল না; কিন্তু বসের নির্দেশ, না-ও করতে পারলাম না। গেলাম জল্লাদখানায়।
>
> হতভাগ্য মুসলিম বন্দীকে ডেথ স্কোয়াডের ওরা গুলি করল। কিন্তু বন্দী মারা গেল না। কেবল জ্ঞান হারালো। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বন্দীর বুকের ডান দিকে গুলি করেছে গার্ডরা। যেন সে জ্ঞান হারায়, তৎক্ষণাৎ মারা না যা। বন্দী পটল তোলার

আগে কাজ সেরে নেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় যেন আমি পাই। ওদের নিষ্ঠুরতায় ভড়কে গেলাম আমি। আমি সার্জন, আমার নার্ভ অনেক শক্ত। তারপরেও নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকছিল না। গুলি খাওয়া মুসলিম বন্দীর শরীর থেকে লিভার আর কিডনি কেটে নিচ্ছি আর ওদিকে ওর হার্টবিটের শব্দ শুনছি! আহ! কী নৃশংসতা!'[১৬৬]

চীন সরকারের অর্গান হারভেস্টিং করার অভ্যাস বহু পুরোনো। উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের পাশাপাশি ফালুন গং-এর লোকদের কাছ থেকেও অঙ্গ কেটে নিত তারা। কেমন ছিল তাদের ওপর চীন সরকারের চালানো অত্যাচার?

এক বন্দী জানাচ্ছে, ওরা তার পায়ুপথে টয়লেট ব্রাশ ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সে টয়লেট করতে পারত না। তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হতো সুচ দিয়ে গায়ের চামড়া ফুটো করে অথবা বরফ শীতল পানি গায়ে ঢেলে দিয়ে। নারীদের অচেনা ওষুধ খেতে বাধ্য করা হতো, এতে তাদের মাসিক বন্ধ হয়ে যেত। অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে যেত। ধর্ষণ ছিল ডালভাতের মতোই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ইন লিপিং নামের এক সাবেক বন্দিনী জানাচ্ছে, 'তাকে একটা সেলে ৪০ জন মিলে ধর্ষণ করে।'

আমাদের গল্প শুরু হয়েছিল এক সার্জনকে নিয়ে। ওই যে! মাঝরাতে স্ত্রীকে ডেকে তুলে সবকিছু বলতে চেয়েছিল যে। দুঃস্বপ্নের ভেতর বীভৎস মৃত রোগী দেখার ঘটনাটা কাল্পনিক হলেও ডাক্তারের ঘটনা কাল্পনিক নয়। এ রকম একজন সার্জন সত্যিই ছিল চীনে। এই ডাক্তারের স্ত্রী চীন সরকারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট এ কাজ করত। স্বামীর এলোমেলো রুটিন দেখে বেশ কিছুদিন ধরেই তার মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছিল— এতদিনের এত চেনা মানুষটা হুট করে অন্য রকম হয়ে গেছে। অচেনা মানুষে পরিণত হয়েছে। রাত-বিরাতে হাসপাতাল থেকে ফোন আসে, ফোন পাবার সাথে সাথেই ছুটে যায়। আগের চাইতে অনেক অনেক বেশি টাকা বেতন পাচ্ছে, আবার মানসিকভাবেও কেমন যেন ভেঙে পড়েছে। সব সময় কেমন চঞ্চল, অস্থির আচরণ করছে। কিছু একটা লুকোচ্ছে যেন আর সবার কাছ থেকে। সার্জন তার স্ত্রীকে ডেকে তুলে নিয়ে বলা শুরু করল :

'আমাদের হাসপাতালের মাটির নিচে গোপন কিছু সেলার আছে। আন্ডার গ্রাউন্ড এই সেলগুলোতে ফালুন গং-এর লোকদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায়ই এদের

---

[১৬৬] Muslims Are Being "Slaughtered on Demand" For Their Organs in China. . CJ Werleman. January 21st, 2020. https://tinyurl.com/shzzwgd
চীনের অর্গান হারভেস্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে নিচের দুটি ভিডিও দেখা যেতে পারে,
Surgeon Forced to Kill for organ harvesting by China Regime | NTD, https://tinyurl.com/y2vh7pl9

গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড সেলার থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়। কিডনি, চোখ, লিভার, স্কিন, টিস্যু ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়। অপারেশন শেষে কেউ কেউ বেঁচে থাকে, আবার অনেকেই মারা যায়। পকেট থেকে টাকা-পয়সা, আংটি, চেইন, ঘড়ি ইত্যাদি রেখে দেয় হাসপাতালের স্টাফরা। তারপর জীবিত বা মৃত দুই গ্রুপের লোকদেরই চালান করে দেয়া হয় চুল্লিতে পোড়ানোর জন্য। পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে ফেলা হয়। কোনো চিহ্ন থাকে না। না, কাগজে-কলমেও কোনো হিসেব রাখা হয় না!'[১৬৭]

ঠিক একই কায়দায়, সমান নিষ্ঠুরতার সাথে উইঘুর,কাযাখ মুসলিমদের জবাই করে চলেছে হান চাইনিয কসাইরা। হিউম্যান রাইটস ইনভেস্টিগেটর, *The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China's Secret Solution to its Dissident Problem* বইয়ের লেখক ইথান গাটমান অনেক তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন জল্লাদ চীনের বিরুদ্ধে। উইঘুরদের দেহ থেকে অর্গান কেটে নেয়ার কাজে জড়িত ডাক্তার, পুলিশ অনেক লোকের সাথেই কথা বলেছে গাটমান। টুকরো টুকরো তথ্য জুড়ে দিতেই অর্গান হারভেস্টের পুরো চিত্রটা স্পষ্ট হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্যকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে এসে পুরো প্রক্রিয়াটা বলা যাক।

ধরুন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এক সদস্য হাসপাতালে ভর্তি হলো। স্টাফদের কাছে খবর চলে গেল অমুক ইউনিটে পার্টির তমুক সদস্য নানাবিধ শারীরিক সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছে। অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে হবে। বন্দী উইঘুরদের রক্ত পরীক্ষা করা হলো আবার। যার সাথে পার্টি সদস্যের রক্তের গ্রুপ ম্যাচ হলো এবার করা হলো তার টিস্যু ম্যাচিং। টিস্যু মিলে না গেলে সৌভাগ্যবান উইঘুর লোকটা আরও কয়েকদিন ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। আর ম্যাচ হলে বিশেষ ভ্যানে করে পুলিশ ও ডাক্তারসহ তাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে বীভৎস এক মৃত্যুর দিকে। জল্লাদখানায় পৌঁছানোর পর বুকের ডান পাশে গুলি করা হয়, যেন তৎক্ষণাৎ মারা না গিয়ে ধীরে ধীরে মরে বন্দী। ডাক্তারেরা এই সময় যা যা অর্গান দরকার তা কেটে নেয়! চেতনানাশক বা ব্যথানাশক কোনো কিছু ব্যবহারের কোনো বালাই নেই! তারপর অর্গান বসিয়ে দেয়া হয় সেই পার্টি সদস্যের শরীরে। মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে বিদায় নেয় সে।

উইঘুর-কাযাখ বন্দীর মৃতদেহ সিমেন্টে মুড়িয়ে খুবই গোপনীয়তার সাথে মাটিচাপা দেয়া

Undercover video reveals new evidence on forced organ harvesting in China | China in Focus – NTD, https://tinyurl.com/y6yhgz7f

[১৬৭] Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China – Final Judgement and Summary Report, 17 June 2019, p222

হয়।[১৬৮]

জীবন্ত উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে এভাবে অর্গান কেটে নিচ্ছে চাইনিযরা। আর কত নীচে নামবে ওরা!

আবারও ফিরে যাই এনভার তোথির কাছে। তোথির ভাষ্যমতে জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে অর্গান হারভেস্টিংয়ের বিশাল এক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছে চীন সরকার। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাচ্ছে সরকার এ থেকে। উরুমচি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের একটা বিশেষ প্যাসেজের ছবি তুলেছেন তোথি। প্যাসেজটার নাম Human Organ Transportation Green-Path (HOTGP)। এই প্যাসেজ দিয়ে চীন থেকে মানব অঙ্গ অন্য দেশগুলোতে রফতানি করা হয়! চিন্তা করুন, কত বিপুল পরিমাণ অঙ্গ বিদেশে রফতানি হলে তার জন্য আলাদা প্যাসেজের ব্যবস্থা করতে হয়! তোথির গ্রীন প্যাথ প্যাসেজের ছবি তোলার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই China Southern Airline এর মাধ্যমে পাঁচ শ'রও বেশি অর্গান বিদেশে রফতানি হয়েছে।

হৃদয় ভেঙে দেয়া আরও তথ্য দিচ্ছেন এনভার তোথি। সৌদি আরবের নাগরিকদের মধ্যে 'হালাল' অর্গানের (এ রকম 'হালাল অঙ্গ' বলে আসলে কিছু ইসলামে নেই) অনেক চাহিদা। তাই তারা বেছে নিয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর মুসলিমদের! কারণ এরা মদ-গাঁজা কিছু খায় না, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করে। উরুমচিতে এসে তাই সৌদির নাগরিকেরা অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্ট করাচ্ছে![১৬৯]

তোথির এই দাবিকে শক্তিশালী করছেন Saudi Centre for Organ Transplants এর ডিরেক্টর ডা. ফাইসাল শাহীন। ২০১৪ সালে আরাবিয়ান বিজনেসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভদ্রলোক জানাচ্ছেন, '৭,০০০ সৌদি রোগির কিডনি প্রতিস্থাপন করা দরকার, আরও অর্গানের কথা না হয় বাদই দিলাম। ব্যাপক ঘাটতি অর্গানের। আমি ৪১০ জন সৌদি নাগরিককে চিনি যারা ২০১২-২০১৪ সালের ব্যবধানে চীন, পাকিস্তান এবং মিশরের ব্ল্যাক মার্কেট থেকে অর্গান কিনেছে।'[১৭০]

---

[১৬৮] Ibid, p26

[১৬৯] Dr. Enver Tohti: Chinese regime harvesting organs from Uighur detainees in the concentration camps. Uighur Times. March 27th, 2019. https://tinyurl.com/vd74bjp

[১৭০] 410 Saudis said to buy organs on black market. Beatrice Thomas. Arabian Business, April 22th, 2014. https://tinyurl.com/rl73pah

এই হলো উম্মাহর অবস্থা! এই হলো মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ! কোন মুখে কাউসারের তীরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দেখা করার আশা করি আমরা?

অর্গান হারভেস্টিংয়ের সাথে জড়িত একজন পুলিশ সদস্য স্বগতোক্তির মতো করে ইথান গাটমানকে বলেছিল, 'আমরা বোধহয় সবাই নরকে যাব'।

ওরা সবাই নরকে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই!

কিন্তু উইঘুর-কাযাখ মুসলিম ভাই-বোনদের ওপর এত নিষ্ঠুর নির্যাতনের পরেও আমরা উদাসীন বসে আছি—আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে?

নিজেকে একবার উইঘুর-কাযাখদের জায়গায় কল্পনা করুন। কতটা কষ্ট নিয়ে মারা যাচ্ছে উইঘুররা, চিন্তা করুন একবার! কল্পনা করুন, সতর্কতার সাথে ওদের কারও বুকের ডান দিকে গুলি করেছে হান চাইনিয সৈন্য। মাটিতে পড়ে গিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় আকাশবাতাস কাঁপিয়ে কাতরাচ্ছে আপনার বাবা-মা। ধারালো ছুরি নিয়ে এসে ঝটপট বুক, পেট চিরে ফেলে এক এক করে ফুসফুস, কিডনি কেটে নিচ্ছে হান কসাই। চোখের কোণঘেঁষে নেমে আসা সরু একটা কান্নার ধারা মিশে যাচ্ছে রক্তের স্রোতে। এই তো, এক পোঁচে উপড়ে ফেলা হলো আপনার মমতাময়ী মায়ের সেই চোখটাও। অথবা চিন্তা করুন আপনার সন্তানের কথা, ছোট ভাই ও বোনের কথা। ও একটু ব্যথা পেলে আপনি অস্থির হয়ে ওঠেন। খেলতে বা হাঁটতে গিয়ে পড়ে গিয়ে ওর চোখে জল এলে মনে হয় আপনার দুনিয়াটা ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। এখন ভাবুন, আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান বা ভাইবোনকে হান সার্জন কুটিকুটি করে কেটে ফেলছে! কতটা কষ্ট পাবেন আপনি?

আমাদের নেতা, আমাদের নবী (ﷺ) বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ একটা দেহের মতো।

> *'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার দিক থেকে গোটা মুসলিম সমাজ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোনো একটি অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্র ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গের সঙ্গে সমব্যথায় ব্যথিত হয়।'*[১৭১]

আমরা কি এই উম্মাহর অংশ হতে পেরেছি? আমরা কি আমাদের উইঘুর-কাযাখ ভাইবোনদের জন্য ব্যথিত? আমাদের নিজেদের ভাই-বোন, বাবা-মাকে যদি এভাবে কেউ পশুর মতো জবাই করত, তাহলে আমরা যতটা ব্যথিত হতাম উইঘুর-কাযাখ ভাইবোনদের জন্য কি তার এক কানাকড়িও ব্যথা-বেদনা অনুভব করি আমরা?

---

[১৭১] মুসলমি, হাদসি নং : ৬৭৫১

হয়তো কিছুটা মন খারাপ আমাদেরও হয় ফেইসবুক স্ক্রল করার সময় উইঘুরদের সংবাদ জেনে। কোনো ভিডিও দেখে। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে থাকি। কষে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গালি দিই চাইনিযদের। তারপর আবার ফিরে যাই স্বাভাবিক জীবনে। খুব সতর্ক থাকি, যাতে 'কৃত্রিম কোনো গ্লানিবোধ' আমাদের পেয়ে না বসে। আমাদের সাজানো-গোছানো নিশ্চিন্ত নির্ভাবনাময় জীবনে খচখচানির অনুভূতি যেন চলে না আসে তার জন্য ঘিরে রাখি আমাদের বুকের সীমান্ত। মেতে উঠি হাসিঠাট্টায়, শুষে নিতে চাই জীবনের সকল রং-রূপ-রস-গন্ধ। এসি রুমে বসে দারস দিয়ে, ফেইসবুকে দু-চারটা ইসলামী পোস্ট দিয়ে উম্মাহর বিশাল খেদমত করে ফেলি। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে নরম বিছানায় বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুম দিই।

যদি আমাদের নিজেদের বাবা-মায়ের ওপর এমন বিভীষিকা নেমে আসত, তাহলে আমরা কি এভাবে চুপ করে থাকতাম? শুধু দু'আই করে যেতাম? আর কিছু করার নেই আমাদের? সত্যিই কিছু করার নেই? আমরা কি আসলেই এক দেহ এক উম্মাহর অংশ?

ফালুন গং-এর অর্গান হারভেস্টিং নিয়ে সাড়া জাগানো বই লেখা হয়েছিল।[১৭২] বিশ্ববাসীকে সচেতন করা হয়েছিল। উইঘুর-কাযাখদের জন্য কেউ কী এমন কিছু করবে?

একসময় দুষ্ট ও চঞ্চল বাচ্চাদের মানব পাচারের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতেন মায়েরা, 'বাবু ঘুমাও, না হলে ছেলেধরা এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর ইয়া বড় এক ছুরি দিয়ে কেটে নেবে তোমার কলিজা, এক পোঁচে কেটে নেবে হৃৎপিণ্ড, কচকচ করে চিবিয়ে খাবে! বাবু ঘুমাও।' রাজ্যের ভয় নেমে আসত বাবুর চোখে। ছোট্ট বুকের ধুকপুকানি নিয়ে ভয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরত সে। তারপর একসময় ঘুমিয়ে যেত!

আমরাও সেই শিশুর মতো ঘুমিয়ে গেছি। এ এক মরণঘুম!
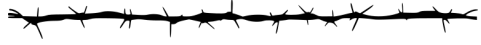
ঘুমিয়ে গেছি আমরা, ঘুমিয়ে গেছে মুসলিম উম্মাহ। শিশুর মতোই ঘুমিয়ে গেছে আমাদের নেতারা–উম্মাহর তথাকথিত কান্ডারিরা।

এখানে পরিবেশটা একদম সুন্দর!

কোনো হইচই নেই!

---

[১৭২] Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, David Matas & David Kilgour.

স্পর্ধা

২০১৭ এর জানুয়ারীর ১৫ তারিখে অদ্ভুত একটা নোটিশ পেলেন পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুররা।

নোটিশে বলা হলো ২০১২ সালের আগস্ট মাসের আগে কুরআনের যেসব কপি ছাপা হয়েছে সেগুলো সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। ২০১২ সালের পর যেসব কপি ছাপা হয়েছে সেগুলো মুসলিমরা রাখতে পারবে, কিন্তু এর আগে ছাপানো কুরআনের কপিগুলো অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। সরকার থেকে প্রিন্ট করা কুরআনের কপি হলেও ফেরত দিতে হবে। কারণ হিসেবে বলা হলো–২০১২ সালের আগে ছাপানো কুরআনগুলোতে 'কিছু সমস্যা' আছে, উগ্রবাদের বেশ কিছু নমুনা আছে।

উইঘুরদের বাধ্য করা হলো তাদের কাছে থাকা কুরআনের কপিগুলো পার্টি অফিসে জমা দিতে। এমনকি বাপ-দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্মৃতিময় কুরআনের মুসহাফও জমা দিতে হলো! 'কী জানি আবার কোন বিপদে পড়তে হয়' ভেবে ঘরে ইসলামী যত বই ছিল সবই জমা দিয়ে দিলো অনেকে।[১৭৩] চীনের আইন অনুসারে ঘরে শুধু সরকার অনুমোদিত ইসলামী বই রাখা যায়। সরকারের অনুমোদিত কুরআনের কপি ছাড়া অন্য কোনো কপি যদি ঘরে পাওয়া যায়, অথবা ধরুন পাকিস্তান বা সৌদি থেকে প্রকাশিত কোনো ইসলামী বই, তাহলে কোনো কথা হবে না, সোজা আপনাকে জেলে চালান করে দেবে পুলিশ।[১৭৪] কিন্তু কথা হলো ২০১২ সালের পূর্বের

[১৭৩] 'পরিচিত' সেই দেশের কথা আবার মনে পড়ছে। ৯০ শতাংশ মুসলিমদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও যেখানে মানুষ বিশেষ করে তরুণ ও যুবকরা ঘরে ইসলামী বই রাখতে ভয় পায়।

[১৭৪] Xinjiang Authorities Confiscate 'Extremist' Qurans From Uyghur Muslims.

কুরআনের কপিগুলোর ব্যাপারে চীনের সরকার নিজেই তো সবুজ বাতি জ্বালিয়েছিল। এখন সেগুলো হঠাৎ করে আবার লাল হয়ে গেল কেন? আর কুরআন জমা নেবার কারণটাই বা কী?

উত্তর খুবই সোজা।

নতুন করে কুরআন লিখতে চায় চীন। বিকৃত করতে চায় কুরআনের শিক্ষাকে। কমিউনিস্ট নাস্তিকদের দিয়ে কুরআনের বিকৃত অনুবাদ করে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ভুলিয়ে দিতে চায় আসল ইসলামকে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের পরিবর্তে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমরা যেন শর্তহীনভাবে আনুগত্য করে কমিউনিস্ট পার্টির। আগের কুরআনের কপিগুলো উইঘুরদের হাতে থাকলে তাদের এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে যাবে, তাই জরুরি নোটিশ দিয়ে সব কুরআন বাজেয়াপ্ত করা হলো।

আগে থেকেই কুরআন বিকৃতি করে এলেও সেভাবে ঘোষণা দিয়ে পৃথিবীবাসীকে জানায়নি চীন। গত নভেম্বরে (২০১৯) Committee for Ethnic and Religious Affairs এর এক মিটিঙে উদ্ধত কণ্ঠে চীন জানিয়ে দিলো তারা নতুন করে কুরআন লিখবে। কমিউনিযমের মোড়কে মুড়িয়ে কুরআনকে নতুন করে উপস্থাপন করবে। কুরআনে এমন কিছুই থাকবে না যেটা কমিউনিযমের বিপক্ষে যায়। যে ‘অনুচ্ছেদ’গুলোতে সমস্যা আছে বলে মনে হবে সেগুলো আবার অনুবাদ করা হবে অথবা একেবারেই বাদ দিয়ে দেয়া হবে।[১৭৫]

এর মাধ্যমে অবশ্য ইতিহাসের পাতায় নতুন কোনো অধ্যায় খোলা হয়নি; বরং যুগে যুগে কালে কালে কুরআন পরিবর্তনের স্পর্ধা দেখিয়েছিল যত মানুষ, তাদের লিস্টে নতুন করে নাম উঠল চীনের।

কিন্তু কুরআনকে নতুন করে লেখা খুব একটা সহজ কাজ না।[১৭৬] ‘ধরো তক্তা আর

Radio Free Asia, May 25th, 2017. https://tinyurl.com/sam4de3
Chinese Uighurs defy Ramadan ban. Umar Farooq. Al Jazeera, July 5th, 2014. https://tinyurl.com/wbh4cf3

[১৭৫] China will rewrite the Bible and the Quran to ‘reflect socialist values’ amid crackdown on Muslim Uighur minority. Ryan Fahey. Main Online, December 26th, 2019. https://tinyurl.com/un2hfs3

[১৭৬] লেখাটি ইসলামী এক্টিভিস্ট, চিন্তাবিদ ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজুর এর 5 Ways to Rewrite the Quran (According to China and Other Regimes)- https://tinyurl.com/r8ojlo3 লেকচার অবলম্বনে লেখা।

মারো পেরেক’ এভাবে কুরআন কাজটা করা যায় না। পরিবর্তন করা যায় না এর শিক্ষা। কুরআন নাযিলের একদম প্রথম মুহূর্তগুলো থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অজস্র, অগণিত মুসলিম কুরআন মুখস্থ করেছে, করছে। পরম মমতায় কুরআনকে ধরে রেখেছে তাদের বুকের ভেতর। তবে কুরআনে বদলাতে না পারলেও কিছু কিছু কূটকৌশলের মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্র চাইলে কুরআনের শিক্ষাকে বদলে দিতে পারে। ইতিহাস ঘাঁটলে এ রকম বেশ কিছু কৌশলের দেখা আমরা পাই, যেগুলোর মাধ্যমে যালিমরা কুরআনের শিক্ষা বদলে দিয়েছিল। চীন সরকার অনুগত সৈনিকের মতো এসব কূটকৌশল অনুসরণ করছে :

ক) আরবি ভাষা নিষিদ্ধ করা

আরবি ভাষার ওপর হুলিয়া জারি করা এই কূটকৌশলের প্রথম পদক্ষেপ। এমন ব্যবস্থা করা যেন মুসলিমরা আরবি ভাষা থেকে দূরে সরে যায়। আরবি ভাষা বুঝতে না পারে, শেখার গরজটাও অনুভব না করে, অপ্রয়োজনীয় মনে করে। চীন ঠিক এই কাজটাই করেছে। আপনারা এরই মধ্যে জেনেছেন চীন আরবি বর্ণমালা, আরবি ভাষাকে নিষিদ্ধ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসকরাও মুসলিমদের কাছ থেকে আরবি ভাষা কেড়ে নিয়েছিল। উসমানি খিলাফতের পতনের পর পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষমতায় বসায় কামাল আতাতুর্ক পাশাকে। খিলাফতের ভূমি তুর্কিকে সেক্যুলার বানানোর নীল নকশায় একটা উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার ছিল আরবি নিষিদ্ধ করা। নিষ্ঠার সাথে সাম্রাজ্যবাদী নব্য ক্রুসেইডারদের কথা অনুসরণ করে আরবি নিষিদ্ধ করেছিল কামাল আতাতুর্ক। এমনকি আরবিতে আযান দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে ‘আতাতুর্ক’।[১৭৭]

খুব সহজেই বোঝা যায় কুরআন পরিবর্তন করতে চাইলে কেন প্রথম আঘাতটা আরবির ওপর আসে। কুরআন নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়। মুসলিমরা যদি আরবি ভাষা জানে, আরবিতে লিখতে-পড়তে জানে, তাহলে শাসকরা কুরআনের অর্থ কীভাবে পরিবর্তন করবে? দরবারি আলিমদের দিয়ে কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করতে গেলে ধরা খাবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই প্রথমেই ওরা আরবি ভাষা থেকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

[১৭৭] Muslims cannot forget the years adhan was read out in Turkish | Dogruhaber, July 19th, 2016. https://tinyurl.com/su8u7up

খ) কুরআন শেখানোর প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া

মসজিদ, মাদ্রাসা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান—যেখানে কুরআন শেখানোর আসর বসবে—সেই জায়গাগুলো বন্ধ করে দেয়া বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া হলো কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করার দ্বিতীয় কৌশল। চীন সরকার এ কৌশলও সফলতার সাথে প্রয়োগ করেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখলের সময় হাজার হাজার মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের মুসলিমদের ভুলিয়ে দিয়েছিল কুরআনের আসল শিক্ষা। চীনের মতো এখনো অনেক দেশেই মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে অথবা সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়া হচ্ছে। নিখোঁজ হচ্ছে কুরআনের পাখিরা। সনদ, স্বীকৃতি নামের কিছু একটা গছিয়ে দিয়ে আঁচলে বেঁধে নেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসার চাবি।

গ) হক্কপন্থী আলিমদের কারাগারে নিক্ষেপ করা

কুরআনের শিক্ষা বিকৃত করার এটা সবচেয়ে কার্যকর উপায়। কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকরাও বোঝে যে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে কুরআনের শিক্ষা পৌঁছায় হক্কপন্থী আলিমদের মাধ্যমে। তাই হক্কপন্থী আলিমদের যদি কুরআন শিক্ষাদান করা থেকে বিরত রাখা যায়, তাহলেই কেল্লাফতে। কুরআনের শিক্ষা বিকৃত করতে আর তেমন বেগ পেতে হবে না। ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করার পর হাজার হাজার আলিমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল।[১৭৮]

হক্কপন্থী আলিমদের কাছ থেকে সাধারণ মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করা হয় বিভিন্ন উপায়ে। সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এমন আলিমদের জঙ্গি, উগ্রবাদী খেতাব দেয়া। মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংসের সাথে সাথে মসজিদের ইমামদের জঙ্গি ট্যাগ দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছে চীন সরকার। পাঠক খেয়াল করলে দেখবেন অনেক দেশেই (এমনকি অনেক মুসলিম নামধারী দেশেও) খুব আন্তরিকতার সাথে হক্কপন্থী আলিমদের কারাগারে ছুড়ে ফেলার ফিরআউনি 'সুন্নাহ' পালন করা হচ্ছে। এদের উদ্দেশ্যেও একই। হক্কপন্থী আলিমদের কারাগারে আটকে রেখে কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করা, নিজেদের যুলুমের সিংহাসনের ভিত্তি মজবুত করা।

ঘ) দরবারি আলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করা

হক্কপন্থী আলিমদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী বানিয়ে কারাগারে ছুড়ে ফেলার পরে তাদের শূন্যস্থানে এনে বসাতে হবে এমন আলিমদের যারা শাসকের কথায় উঠবে, শাসকের কথায় বসবে। শাসক ঘাস খেতে বললে ঘাস খাবে, মদ খেতে বললে বিসমিল্লাহ্ বলে

---

[১৭৮] ১৮৫৭ - সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম, লেখক : ড. মাহফুজ পারভেজ- https://tinyurl.com/v6ppklu

মদ খেয়ে নেবে। কুরআনের শিক্ষা বিকৃত করার চার নম্বর উপায় হলো এটা। চীন এ কাজটাও করেছে আপনারা দেখেছেন। দরবারি আলিমরা কুরআনের কিছু অংশ বলবে আর কিছু অংশ (যে অংশ প্রকাশ করলে শাসকের সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে) গোপন করে রাখবে। সত্যের সাথে মিথ্যে মিশিয়ে কুরআনের পুরো শিক্ষাকেই এমনভাবে বিকৃত করে ফেলবে যে, সাধারণ মুসলিমের পক্ষে আর বোঝা সম্ভব হবে না কোনটা হক্ক আর কোনটা বাতিল। ইসলামকে এরা ঠিক ততটুকু গণ্ডির মাঝেই আবদ্ধ করে ফেলে যতটুকু ইসলাম পালন করলে শাসকের আদর্শ বা এজেন্ডা হুমকির মুখে পড়বে না।

সরকার এ ধরনের দরবারি আলিমদের নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। মিডিয়া খুললেই আপনি দেখবেন এসব আলিমদের গুণগান গাওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের উঁচু উঁচু পদে দেখবেন এদের আপ্যায়ন করে বসানো হচ্ছে। জনগণের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন এরাই ইসলামী জ্ঞানের শুরু ও শেষ। ওদের মতো করে ইসলাম এই জমানায় খুব বেশি মানুষ বোঝে না। ওরা যা বলছে তাই ইসলামের 'সঠিক ও বৈধ ব্যাখ্যা'। কাজেই ওদের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত।

টাকা-পয়সা, খ্যাতি, পদের লোভ দেখিয়ে শাসকরা যেসব আলিমদের কিনতে পারে না তাদের পরিণতি কী হয় আপনারা জানেন। কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, কেউ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় উম্মাহর এসব সিংহদের।

ঙ) প্রকাশনীগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া

কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করার আরেকটি কার্যকর উপায় হচ্ছে কুরআনের কপি যে প্রকাশনীগুলো থেকে বের করা হয় সেগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া। তাদেরকে দিয়ে নিজেদের মনমতো অনুবাদ করা। কুরআন বিকৃত করার এই পদ্ধতিটিও বাদ দেয়নি চীন। আমরা আগেই আলোচনা করেছি কীভাবে চীন নাস্তিক কমিউনিস্টদের দিয়ে কুরআনের অনুবাদ করিয়েছে। চীনের মতো বিশ্বজুড়ে ইসলামের শত্রুরা নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কুরআনের মনগড়া অনুবাদ করেছে।

এমনকি কুরআনের এমনও 'আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির' শিক্ষা মেশানো অনুবাদ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে শুধু যে ইসলামই আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা তা না। সকল ধর্মই সত্য। এই ধরনের কুরআনের অনুবাদগুলো পড়ানো হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে।

শুধু যে চীনেই কুরআন পরিবর্তন করা হচ্ছে সেটা কিন্তু নয়। সাম্রাজ্যবাদী নব্য ক্রুসেইডার

আর তাদের দালালেরা নীরবে কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করার মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো হক্কপন্থী আলিমদের জঙ্গি-সন্ত্রাসী-খারিজি ট্যাগ দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে, কখনো দরবারি আলিমদের প্রমোট করে, কখনো মসজিদ-মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। চীন হয়তো মুখে স্বীকার করেছে তাই আমরা জেনেছি, কিন্তু ক্রুসেইডার আর তাদের দালালেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করে যাচ্ছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল হিজরের ৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন :

"আমি কুরআন নাযিল করেছি, আমিই এর সংরক্ষণকারী।"

ফিরআউনদের বাহিনী যতই চেষ্টা করুক না কেন, কুরআনের একটা হরফও তারা পরিবর্তন করতে পারবে না। অতীতে অনেক চেষ্টা ওরা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। বরং যারাই কুরআন পরিবর্তনের দুঃসাহস দেখিয়েছে তাদের বরণ করতে হয়েছে ভয়ংকর পরিণতি।

মুসায়লামা কাযযাব কুরআনের সূরার আদলে সূরা বানাত, হাদীকাতুল মাউত বা মৃত্যু-উপত্যকা খ্যাত বাগানে মুক্তিপ্রাপ্ত হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বল্লমের আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়েছিল মিথ্যেবাদী মুসায়লামা।

কুরআনের বিরোধিতা করে যাওয়ায় ছাড় পাননি রাসূল ﷺ-এর চাচা আবু লাহাবও। ঘৃণিত এক অসুখে মারা গিয়েছিল আবু লাহাব, লাশ কবরে নামাতে চাইছিল না কেউ। শেষমেশ পাথরচাপা দেয়া হয় ওকে।

অ্যামেরিকার সৈন্যরা সামরিক শক্তি, প্রযুক্তি আর অর্থবিত্তের প্রাচুর্যে চরম ঔদ্ধত্যের সাথে কুরআনের কপি ছিঁড়েছিল, মুসহাফের ওপর প্রস্রাব করেছিল, ফ্ল্যাশ করেছিল টয়লেটে।[১৭৯] আজ আফগানিস্তানে আল্লাহর সৈনিকরা তাদের নাকের জল চোখের জল এক করে ছাড়ছে। লেজ গুটিয়ে পালানোর পথ খুঁজে না পেয়ে শান্তি আলোচনার পতাকা তুলে ধরছে অ্যামেরিকা। কুরআনের মুসহাফকে যেমন টুকরো টুকরো করেছিল অ্যামেরিকা, ইন শা আল্লাহ অচিরেই তাদের সাম্রাজ্যও আল্লাহর সৈনিকদের হাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুত বাহিনীর ভূমিতে শেষের শুরুটা শুরু হয়ে গেছে। চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোচ্ছে সবকিছু।

কোনো সন্দেহ নেই চীনও ছাড় পাবে না। আল্লাহ ঠিকই প্রতিশোধ নেয়াবেন। সেই দিন আর খুব বেশি দূরে নয়। বিইযনিল্লাহ।

---

[১৭৯] Pentagon confirms Quran desecration. Al Jazeera, June 4th, 2005. https://tinyurl.com/y7yxzufp

আল্লাহর কিতাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সংরক্ষণ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কুরআন বিকৃতির এই মহোৎসবে আমাদের ভূমিকা কী? কী ভূমিকা আমাদের শাসকদের? কী ভূমিকা ওআইসির? কী ভূমিকা আমাদের শায়খদের? কী করেছি আমরা যখন কুরআন বিকৃত করা হয়েছে? অনলাইনজুড়ে মিথ্যের বেসাতি গড়েছে নাস্তিক, সুশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, চেতনার ফেরিওয়ালারা? কী করছি আমরা যখন কুরআনের পাখিদের দুর্বল স্ক্রিপ্টের নাটক সাজিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে? কী করছি আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কেবল কুরআন রাখার অপরাধে 'জামাত-শিবির' কিংবা 'জঙ্গি' বলে ছেলেদের জেলের ভাত খেতে পাঠানো হচ্ছে? কী করছি আমরা যখন পতিতা কাম গায়িকা কাম নর্তকী আর বাউলেরা, দরবারি আলিমেরা কুরআনের বিকৃত তাফসীর করে যাচ্ছে দিনের পর দিন? কী করেছি আমরা যখন কুরআনের তাফসীর মাহফিলে রাষ্ট্রীয় মাস্তানরা আলিমদের সাথে রংবাজি করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> *'তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষের চাইতে প্রিয় হই।'*

বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত এই হাদিসের কথা আমরা অনেকেই জানি, অনেকেই হয়তো জানি না; কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিই, আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি—প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের পরম ধ্যান-জ্ঞান কী ছিল? আল্লাহর জমিনে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামকে পুরো মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেয়া, তাই না? রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কাফির-মুশরিকদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, দুই বছর অবরুদ্ধ থেকেছেন পুরো বংশ নিয়ে, তায়েফে রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন, উহুদে রক্তাক্ত হয়েছেন, জ্ঞান হারিয়েছেন, নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশে গিয়েছেন, অঢেল বিত্ত-বৈভবের অফার পায়ে ঠেলে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন, মাসের পর মাস শুধু খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়েছেন...। এসব কিসের জন্য? কেন এত অশ্রু, রক্ত আর ঘাম ঝরানো?

আমরা যেন ইসলাম পাই, ইসলামের রঙে রাঙিয়ে নিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে যেন বাঁচাতে পারি নিজেদের। আমরা দাবি করি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজেদের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসার—যেই মানুষটার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। আজ আমাদের সবচাইতে প্রিয় মানুষটার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ইসলাম আক্রান্ত

হচ্ছে; আর আমরা নিশ্চুপ!

এটাই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসার নমুনা? আমরা কি আমাদের দাবিতে সৎ?

আজকে আমাদের বোনদের কাপড় কেটে নিচ্ছে চীনা কুকুররা। রোযা, নামায, হাজ্জ সব নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ঘোষণা দিয়ে কুরআন বিকৃত করছে। গোরস্থান ধুলোয় পরিণত করেছে। পাঁচ হাজার মসজিদ আজ নাস্তিক কমিউনিস্ট শুয়োররা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। মসজিদগুলোকে পার্টি হাউস বানাচ্ছে। যেই মিনার থেকে তাওহিদের আহ্বান ভেসে আসত সেখানে কমিউনিস্টের নোংরা পতাকা উড়ছে।

এতকিছুর পরেও, এত ধ্বংস, এত মৃত্যু, এত রক্ত, এত অশ্রু দেখেও আমরা চুপ করে আছি। কিছুই বলছি না!

সমস্যাটা কী আসলে আমাদের?

এতকিছুর পরেও কেন আমাদের শীতল রক্ত গরম হয় না? কেন আমরা সেই নেতাদের মুখ চেয়ে থাকি যাদের কাছে ইসলামের সামান্যতম মূল্য নেই? কেন আমরা সেই সব দরবারি আলিমদের মাথায় তুলে রাখি যারা 'পেশাদার গিরগিটির' মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলে ফেলে?

আমরা আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকব? আর কতকাল কাপুরুষতাকে হিকমাহ বানিয়ে নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করব? এতকিছুর পরেও আমরা স্বপ্ন দেখি সরকারি চাকরি, বউ, বাড়ি-গাড়ি নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট, নির্ভাবনাময় একটা জীবনের! এতকিছুর পরেও আমরা ভাবি আল্লাহ আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য পাকড়াও করবেন না! মসজিদে গিয়ে কয়েকটা টিপ মেরে, সপ্তাহান্তে হুজুরের 'সকলেই দানের হাত বাড়িয়ে দিই' ওয়াজ শুনে পকেট থেকে ৫ টাকার একটা কয়েন বের করে, খাদিম সাহেবের বাড়িয়ে দেয়া দানবক্সে ফেলে দিয়েই জান্নাতে যাবার খোয়াব দেখি এতকিছুর পরেও?

ধোঁকাটা আমরা কাকে দিচ্ছি?

আসলেই কী আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি?

আসলেই আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসি? না ভালোবাসি ক্যারিয়ারকে? আমরা কাকে বেশি ভালোবাসি? আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে? নাকি টাকা-পয়সা, যশ-খ্যাতিকে?

আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালোবাসি? না ভালোবাসি বউ, সন্তান-সন্ততিকে? নিশ্চিত, নির্ভাবনাময়, প্যারাবিহীন একটা জীবনকে?

আমরা কী আসলেই মুসলমান হতে পেরেছি?

বিষাদের চেয়েও বিশাল

উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের বিরুদ্ধে চীন মানবতাবিরোধী যত অপরাধ করেছে এক এক করে আমরা এতক্ষণ তা শুনলাম। কিন্তু তথ্যের স্রোত অনেক সময় বাস্তবতা বোঝার জন্য যথেষ্ট হয় না। ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমরা জানি, শুনি; কিন্তু স্পর্শ করতে পারি না। অনুভব করতে পারি না প্রত্যেকটি ঘরে কত কষ্ট ঝরে পড়ে প্রতিনিয়ত। বুঝতে পারি না ঠিক কখন ধ্বংস হয়ে গেছে উইঘুররা, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তান। পৃথিবীর শেষ ভালোবাসার আশ্রয়স্থলটুকুও ছিনতাই হয়ে গেছে উইঘুরদের। চীনের এই আগ্রাসনের মেশিনারি কীভাবে উইঘুরদের ব্যক্তিজীবনকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে, কীভাবে আমার আপনার মতো মানুষদের অস্তিত্বকে মুছে ফেলছে তা বোঝার জন্য আমরা এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি কিছু 'উইঘুর' জীবনের গল্প।

...ওরা এল। একের পর এক। মিছিলের মতো।

তরুণী স্ত্রী প্রথমবারের মতো মুখ খুলল তার স্বামীর ব্যাপারে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেকদিন ধরেই। অল্পবয়স্ক ছেলেটা জানাল তার ফুপি নিখোঁজ। যুবতি, মধ্যবয়স্কা, প্রৌঢ়া, থুরথুরে বৃদ্ধা মায়েরা এসেছে তাদের শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক ছেলেদের নিখোঁজ হবার গল্প বলতে। করিডোরে পাতা বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে আছে, পালা আসার অপেক্ষায়। চুপচাপ, মাথার মধ্যে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ। হারানো স্বজনের ছবি বের করে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে কয়েকজন। বারবার চোখ মুছছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে অনেকেই। ভীষণ ক্লান্ত ওরা। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ার অবস্থা। সূর্য ওঠার আগেই

রওনা দিয়েছে। হেঁটে, পাহাড়-বন-চারণভূমি পেরিয়ে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হয়েছে শহরে।

মান্ধাতা আমলের একটা রেজিস্ট্রেশন খাতা নিয়ে এসেছে এক লোক। তার মৃত বাবাকে সনাক্ত করার জন্য। একটা সময় সেটার রং লাল আর সোনালির মাঝামাঝি কিছু একটা ছিল, এখন বিবর্ণ। আরেকজন নিয়ে এসেছে দুই ছেলেকে।

১৪ জন নিখোঁজ নাতি-নাতনির খবর জানাতে এসেছে এক বৃদ্ধা। জন্ম নিবন্ধন, বিয়ের সনদ, জমির দলিল, চিঠিপত্র, ফ্যামিলি এ্যালবাম, আইনের বই, জাতিসংঘের নিয়মনীতিমালা–যেটা যার কাছে প্রমাণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সাথে করে নিয়ে এসেছে।

আবার অনেকে কিছুই নিয়ে আসেনি। শুধু একটা গল্প শোনাতে এসেছে। গল্প শুনিয়েই চলে যাবে।

বহুদূর থেকে ওরা জানাতে এসেছে এক নির্দয় সত্য!

কাযাখস্তানের এ মাথা থেকে সে মাথা ঘুরে বেড়ানো শুরু করেছি ২০১৮ সালে এসে।[১৮০] সাক্ষাৎকার নিয়েছি সেইসব হতভাগ্য মানুষদের যাদের প্রিয়জন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী বা নিখোঁজ। ক্যাম্পে বন্দী ছিলেন কিন্তু মুক্তি পেয়ে কাযাখস্তানে চলে এসেছেন এমন কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা শোনার 'সৌভাগ্যও' হয়েছে আমার! একদম তরতাজা, টাটকা তাদের অভিজ্ঞতা। হয়তো আমার সঙ্গে দেখা হবার একদিন, এক সপ্তাহ বা এক মাস আগে তারা কাযাখস্তানে এসেছেন। কেউ রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে, কেউ নাগরিকত্বের আবেদন করে, কেউ পালিয়ে। অনেক, অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি আমি।

এখন আমি আপনাদের যেই গল্পগুলো শোনাতে যাচ্ছি তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল আলমাটিতে। আলমাটি কাযাখস্তানের সবচেয়ে বড় শহর। আমাকে এ ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছে একটি স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার সংস্থা আতাজুরত।

প্রকাশে চীনের সমালোচনা করার 'মহা অপরাধে' ২০১৯ সালে কাযাখস্তান সরকার আতাজুরতের পায়ে শেকল পরিয়ে দেয়! সংকুচিত হয়ে যায় আতাজুরতের কার্যক্রম! আতাজুরতের প্রধান শেরিকযাহান বিলাসকে গৃহবন্দী করে রাখা হয় মার্চ থেকে! আমি

---

[১৮০] লেখাটি বার্লিনের লেখক বেন মাউকের Weather Reports: Voices From Xinjiang, Untold Stories From China's Gulag State, Ben Mauk. The Believer, Issue One Hundred Twenty-Seven, October/November 2019 - https://tinyurl.com/yxszsrkc অবলম্বনে লেখা।

যাদের গল্প শোনাতে যাচ্ছি তাদের কেউ আসল নাম ব্যবহার করতে রাজি নন। নামধাম প্রকাশ হয়ে গেলে চীনে থেকে যাওয়া পরিবারের সদস্যরা অত্যাচারের শিকার হবেন, সেই সঙ্গে কাযাখস্তানেও বিপদের মুখে পড়তে হবে উনাদের। কাজেই জবানবন্দি দেয়া সবার ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে, ঝুঁকি এড়াতে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও। আসুন শোনা যাক তাদের গল্পগুলো।

এক.

ওকে প্রথম দেখেছিলাম উরুমচিতে। এক মিউযিক স্কুলে।[১৮১]

ওই স্কুলের টিচার ছিল সে। আমিও।

প্রথম দেখাতেই বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠেছিল। ভালোবাসার উষ্ণতা বয়ে গিয়েছিল শিরায় শিরায়।

ও এসেছিল কাযাখস্তান থেকে। খুব ভালো গান গাইত। ওর মতো মেয়েকে নিজের করে পাওয়া সব পুরুষেরই আরাধ্য। বিশেষ করে আমার মতো সঙ্গীতের শিক্ষকের জন্য। বিয়ে করতে খুব বেশি সময় নিলাম না আমরা। জীবন নিয়ে অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলাম দুজন মিলে। চেয়েছিলাম চীনের পাট চুকিয়ে একেবারে কাযাখস্তান চলে যেতে। হঠাৎ এক ঝড়ে এলোমেলো হয়ে গেল সব। ধীরে ধীরে আসছি সেসব কথায়।

আমাদের এখানকার নিয়ম হচ্ছে বিয়ের আগে কনেকে বিদায় দেবার জন্য একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা। এটাকে বলা হয় কীয উযাতু (qyz uzatu) 'কনে বিদায়'। আমাদের বিয়ের মূল অনুষ্ঠান হয়েছিল কাযাখস্তানে। বাবা বৃদ্ধ মানুষ। বয়স ৭০ এর মতো। অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। চীন থেকে কাযাখস্তানে গিয়ে বিয়ের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি উনি। কিন্তু কনে বিদায়ের অনুষ্ঠানে ঠিকই হাজির হলেন। আমার হবু স্ত্রীর জন্য উপহার হিসেবে বাবা কি নিয়ে এসেছিলেন জানেন?

চীনের (সংবিধান) আর ফৌজদারি আইনের বই! পুত্রবধূর হাতে বইদুটো তুলে দিতে দিতে গম্ভীর মুখে বলেছিলেন,

'দেখো মা, তুমি আমার ছেলেকে বিয়ে করলে, যে চীনের নাগরিক। তোমার এখন চীনের আইনকানুন মুখস্থ করতে হবে। তোমাদের দুজনেরই আসলে চীন এবং কাযাখস্তানের আইন মুখস্থ রাখতে হবে।'

---

[১৮১] প্রাগুক্ত। ২০১৯ এর এপ্রিলে আকিকাত কালিওল্লাহ(৩৪), (Akikat Kaliolla) লেখক বেন মাউককে এই সাক্ষাৎকার দেন।

চীনের আইন আর আইন বিভাগের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বাবা। খুব আস্থা রাখতেন আদালতের ওপর। যে আইন, যে বিচারব্যবস্থার ওপর তিনি এতটা আস্থাশীল ছিলেন, শেষমেশ সেই আইনই অন্তহীন আঁধার নামিয়ে আনল তার জীবনে।

অবসর নেবার আগে বাবা কাজ করতেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে। থাকতেন তাচেং (Tacheng) এলাকায়। সেই এলাকায় শিক্ষিত লোকের দেখা পাওয়াই ছিল ভার। চীনা লিখতে বা পড়তে জানা মানুষের সংখ্যা তো হাতেগোনা। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল চীনা ভাষায় লেখা ফর্ম পূরণে মানুষদের সাহায্য করা। বেশির ভাগই ছিল আদালতের কাছে অভিযোগ দায়েরের ফর্ম। তিনি উকিল ছিলেন না, কিন্তু আইনের ওপর বেশ পড়াশোনা ছিল। আইনের মারপ্যাঁচ ভালোই বুঝতেন। সাধারণ জনগণকে মামলা-মোকাদ্দমার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে, সাহায্য-সহযোগিতা করে আনন্দ পেতেন।

আমাদের কড়া শাসন করতেন। আবার ভালোও বাসতেন খুব। তার কাছে সবকিছুর ওপরে ছিল পড়াশোনা। আমি পৃথিবীতে আসার পরে এক রাতের জন্যেও তিনি বাসার বাইরে থাকেননি—যাতে আমার যত্ন-আত্তির কোনো ত্রুটি না হয়। আমি আর আমার ভাই পড়তাম, বাবা আমাদের পাশে বসে থাকতেন। আমাদের তিন ভাইকেই তিনি চাইনিয শেখার স্কুলে পাঠিয়েছিলেন—কাযাখ ভাষাও শিখিয়েছিলেন।

'বাবারা! পড়াশোনা করতে হবে মন দিয়ে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে তোমাদের' দিনের মধ্যে কতবার যে এই মন্ত্র আওড়াতেন তিনি! আমরা তিন ভাই বিরক্ত হয়ে যেতাম।

মিউযিকের প্রতি আমার আগ্রহ টের পেলেন আর পরের দিনই বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসলেন বড়সড় একটা পিয়ানো। উনার কাছে টাকা ছিল না, ধার করে পিয়ানো কিনে দিয়েছিলেন আমাকে।

টাকার অভাব বাবা কখনোই বুঝতে দেননি আমাদের। মুখ দিয়ে কোনো কিছু শুধু উচ্চারণ করা বাকি— ধার-দেনা করে হোক বা অন্য কোনো ভাবে, সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিস আমাদের সামনে হাজির করেছেন তিনি। যখন আরেকটু বড় হলাম তখন একদিন মিউযিক স্টুডিওর জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসলেন বাবা। সেগুলো হয়তো খুব বেশি দামি ছিল না, অসাধারণ কিছু ছিল না, তারপরেও বেশ মোটা অঙ্কের একটা টাকা খরচ হয়েছিল। বাবার হাত খালি ছিল সেই সময়, কোথায় যে এতগুলো টাকা পেয়েছিলেন কে জানে!

১৯ বছর বয়সে ঘর ছাড়লাম। বোহেমিয়ান মিউযিশিয়ানরা চিরকাল যেমন করে এসেছে আরকি! ঘুরে বেড়ালাম পৃথিবীর পথে পথে—উরুমচি, বেইজিং, সাংহাই...। ২০১৪

সালে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। বিয়ে হলো। দুজনে মিলে চলে এলাম কাযাখস্তানে। চাকরির খোঁজে। বাবা কখনোই আমার কোনো কাজে বাধা দেননি। বাবা বলতেন, 'দেখো, এটা তোমার জীবন... নিজেকে তুমিই সবচেয়ে ভালোভাবে জানো।'

২০১৬ সালে আমাদের প্রথম সন্তান এল। আগেই বলেছি কাযাখস্তানে আমাদের বিয়ের মূল অনুষ্ঠানে বাবা আসতে পারেননি, কিন্তু আমার সন্তানের জন্মের পর তিনি ছুটে চলে এলেন। স্বাস্থ্যের একেবারে ভাঙাচোরা অবস্থা তখন। একটা দাঁতও অবশিষ্ট নেই, সব পড়ে গেছে। হাঁটতে বলতে গেলে পারেনই না—আরথ্রাইটিস আর পায়ের ইনজুরি একেবারে কাবু করে ফেলেছে। এতদিন ঠিকঠাক সার্ভিস দেয়ার পর কাজ করতে আপত্তি জানিয়েছে লিভারও। এত সমস্যার মাঝেও নাতনির মুখ দেখতে ঠিকই চলে এসেছিলেন বাবা।

বাবার প্রতি বোধহয় কিছুটা অবহেলায় করেছিলাম আমি। কখনো বাবার মনের অবস্থা জানতে চাইনি। উনি কি কাযাখস্তানে একেবারে চলে আসতে চাইতেন? নাকি চীনেই থাকতে চাইতেন? ইশ! এগুলো নিয়ে যদি আগে কথা বলতাম, তাহলে হয়তো-বা আমাদের জীবন অন্য রকম হতে পারত, কে জানে!

আমার যতদূর মনে হয়েছিল কাযাখস্তানে স্থায়ী আবাস গড়তে উনারা কিছুটা ভয় পেতেন—মারা গেলে লাশের খাটিয়াতে কাঁধ দেবার মানুষ পাব কই? সব আত্মীয়স্বজন তো চীনে।'

হায়রে! একবার যদি কাযাখস্তানে চলে আসার কথা বলতাম বাবাকে! লাশ কাঁধে নেয়ার জন্য আমি তো ছিলাম! আফসোসে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। অশান্ত হয়ে যায় ভেতরটা।

কিছুক্ষণ পর অবশ্য একটু সুস্থির হই। আমাদের ওইখানে পরিস্থিতি এমন, কাযাখস্তানের ব্যাপারে কেউ প্রকাশ্যে কথাই বলে না; দেশ ছেড়ে চিরদিনের মতো সেখানে যাওয়া তো বহু দূরের কথা! (চীনকে বিদায় বলে) অন্য কোথাও চলে যেতে চাওয়ার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা চীনে প্রায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো অপরাধ।

আমার দুই ভাইকে অবশ্য অনেকবার গুঁতিয়েছিলাম, 'ভাই তোরা চলে আয় আমার এখানে, কাযাখস্তানে। এখানে অনেক ভালো থাকবি।' আসেনি ওরা। বড় আপুকেও বলেছিলাম, 'আপু চলে আয়'। কিন্তু দুলাভাই পার্টির কর্মকর্তা। উনি কী আর চীন ছেড়ে আসেন!

২০১৮ সালের মার্চ মাস। কাযাখস্তানের নাগরিকত্ব পেয়ে গেলাম। ওদিকে দ্রুত অবনতি হতে থাকল পূর্ব তুর্কিস্তানের পরিস্থিতি। মায়ের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে

ফেললাম এই সময়!

মায়ের সাথে কথা হতো উইচ্যাটে। প্রতিদিন মাকে আমার মেয়ের ছবি পাঠাতাম। ছোট্ট খুকির মতো উল্লসিত হয়ে স্ক্রীনের ওপাশ থেকে নাতনিকে আদর করতেন মা। গল্প শোনাতেন, হাসি, আনন্দে ঝিকমিক করে উঠতেন একেবারে! 'বুড়ো বয়সের খেলার পুতুলকে' কাছে পেতেন না তো, তাই উইচ্যাটে যতটা সম্ভব সময় কাটিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করতেন। নাতনিকে না দেখলে মায়ের ঘুম আসে না, এমন অবস্থা!

কিন্তু আস্তে আস্তে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ কমতে থাকল। প্রথমে দুই-তিন দিনের বিরতি। তারপর সাত দিন, দুই সপ্তাহ, এক মাসে গড়াল। এক সকালে উঠে বিস্ফারিত চোখে দেখলাম মা আমাকে উইচ্যাট থেকে রিমুভ করে দিয়েছেন।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভাইয়াকে ভিডিও কল দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। দেখলাম ভাইয়া বেশ বদলে গেছে। উষ্কখুষ্ক চেহারা, চোখের নিচে কালি, অনেক বেশি বয়স্ক মনে হচ্ছিল। অসম্ভব দুঃখী এক মানুষের মূর্তি। ম্লান হেসে ভাইয়া বলল, 'আকিকাত, কেমন আছিস ভাই আমার? এখানকার অবস্থা বদলে গেছেরে। আগের মতো নেই আর...।'

এপাশ থেকে টের পেলাম কান্না আটকানোর জন্য নিজের সাথে যুদ্ধ করছে ভাইয়া। যা বোঝার বুঝে নিলাম। দু-ভাই ফোনের দুপাশে চুপচাপ বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। দুঃখী নীরবতা বাঙ্ময় হয়ে কত অজানা ভয়, আশঙ্কার কথা বলে গেল।

'বুঝছিস...' আগের কথার খেই ধরল ভাইয়া, 'বাবাকে নিয়েই আমার সব ভয়। প্রশাসন তো তাকে দেখতে পারে না। প্রতিবেশীদের হয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কত ন্যায্য আইনি লড়াই লড়েছেন বাবা–পথের কাঁটাকে ওরা না সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে...।'

নিঃশব্দ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় একাকার হয়ে গেল সমস্ত হৃদয়। ফোন ছাড়ার আগে ভাইয়াকে বললাম, 'আমাকে তোমাদের অবস্থা নিয়মিত জানানোর চেষ্টা কোরো ভাইয়া।'

ছোট্ট করে 'জানাব' বলে ফোন রেখে দিলো ভাইয়া।

বাবাকে শেষমেশ ওরা ধরে নিয়ে গেল! কি অভিযোগে জানেন? দুধের শিশুও হাসবে! আমার সত্তরোর্ধ্ব, প্রায় শয্যাশায়ী, আইনের প্রতি চরম শ্রদ্ধাশীল বাবাকে খুনের মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করল ওরা!

ঝুমাকেলদি আকাই ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। রিএডুকেশন ক্যাম্পের সিকিউরিটি গার্ড উনাকে স্রেফ পিটিয়েই মেরে ফেলেছিল। কবর দেবার জন্য ক্যাম্প থেকে পরিবারের কাছে ঝুমাকেলদির লাশ হস্তান্তর করে ওরা। লাশের বীভৎস অবস্থা। মারের

চোটে কালশিটে পড়ে গেছে সারা গায়ে, এখানে-সেখানে এবড়োখেবড়ো ক্ষত–যে কেউ একনজর দেখেই বলে দেবে মৃত্যুর আগে নরক থেকে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে ঝুমাকেলদিকে!

তার স্ত্রী আমার বাবার কাছে এলেন। বুকফাটা আর্তনাদে পরিবেশ ভারী হয়ে গেল। পৃথিবীর সব অশ্রু বোধহয় ঝরেছিল সেদিন সেই অসহায় নারীর দুচোখ বেয়ে। স্বামীর এমন করুণ, নির্মম মৃত্যুর জন্য অভিযোগ দায়ের করতে চাইলেন উনি ক্যাম্পের গার্ডদের বিরুদ্ধে। কেঁদে কেঁদে বাবাকে অনুরোধ করলেন, 'দয়া করে আমাকে অভিযোগ দায়ের করতে সাহায্য করুন।'

এত নির্মমতা, এত নিষ্ঠুরতা, এমন পাশবিকতা দেখে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে কী সাহায্য না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব?

বাবা অভিযোগপত্র লিখলেন। বেইজিঙের উদ্দেশে।

সেই চিঠি কখনোই বেইজিঙে পৌঁছল না। আসলে এলাকা ছেড়েই বেরোতে পারেনি–প্রশাসন বাজেয়াপ্ত করে ফেলল।

তারপর একদিন ওরা আসলো। দলবেঁধে। শয়তানের দূতেরা!

'বুড়া মিয়ার শখ কত! আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। চিঠি লিখেছে ওপরের মহলে! চলো এখন তোমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরিয়ে আনি।'

ধরে নিয়ে যায় ওরা আমার বাবাকে। অবিচারের প্রতিকার চাওয়ায়! একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে–অন্যের সাহায্য ছাড়া যিনি ঠিকমতো চলাফেরাও করতে পারেন না। বাবার পর একে একে আমাদের পরিবারের সবাইকেই ধরে নিয়ে গেল ওরা! শুধু নির্দোষ মানুষকে পিটিয়ে মারার প্রতিবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লেখার কারণে!

বুকের মাঝে চিড়চিড় করে পুড়ে হৃদয়। ছারখার হয়ে যায় সুখ-শান্তি, আমাদের ভালোবাসার পরিবার। বাতাসে কেবল রক্ত, মৃত্যু, হিংস্রতা আর পাশবিকতার গন্ধ।

বাবাকে যেদিন গ্রেফতার করা হলো, তার আগের রাতেই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছিল আমার। দেখলাম, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি আমি। সিকিউরিটি গার্ড আমাকে ধরার জন্য পিছু নিয়েছে। ধরতে পারলেই বসিয়ে দেবে বিষাক্ত থাবা। আমি ছুটছি তো ছুটছিই...।'

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগল। ঢকঢক করে পানি খেলাম দুই গ্লাস। কেন জানি মনে হলো খুব খারাপ কিছু ঘটে গেছে বাসায়।

বাবা গ্রেফতার হয়েছেন জানার সাথে সাথে আমি উরুমচিতে আমার বোনকে ফোন করলাম। আগেই বলেছি দুলাভাই পার্টির বড় পোস্টে আছেন। কিন্তু তিনিও জানতে পারেননি, তার শ্বশুর-শাশুড়িকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপু আমাদের এক

আন্টিকে ফোন করল, তারপরই নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারল হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া সেই ভয়ংকর বাস্তবতা—বাবা আর আমার দুই ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে ওদের।

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করলাম। পরিচিত এমন কাউকে বাকি রাখিনি যার কাছে তথ্যের জন্য যোগাযোগ করিনি। আমি উনাদের নাম বলতে চাই না। এখনো উনারা চীনেই আছেন। নাম বললে ভীষণ বিপদে পড়বেন মানুষগুলো।

আবহাওয়া কেমন, বৃষ্টি না রোদ, ঠান্ডা না গরম ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে সাংকেতিক ভাষা বানানো হয়েছিল। চীনা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে যোগাযোগ করার জন্য। কিছুদিন ভালোভাবেই প্রশাসনকে ঘোল খাওয়ানো হয়েছিল, কিন্তু তারপর ওরা চালাকি ধরে ফেলে। এখন আমি অন্য এক রকমের সাংকেতিক ভাষা বানিয়ে নিয়েছি। সেই আলোচনায় আর না যাই।

যাই হোক, নানাজনের কাছ থেকে তথ্য নিলাম। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাবার সঙ্গে একই সেলে বন্দী ছিলেন, অনেকে কাছাকাছি বন্দী ছিলেন, আবার অনেকে বাবার সঙ্গে বন্দী ছিলেন এমন কারও কাছ থেকে শুনেছেন তার অবস্থা। টুকরো টুকরো তথ্যগুলো জোড়া লাগাতেই পুরো ছবি দাঁড়িয়ে গেল।

চাইনিয নরপিশাচরা কোনো ধরনের কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই বাবা এবং আমার দুই ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। আমার বৃদ্ধা মা ঠুকঠুক করে হাজির হন জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ জানানোর জন্য। মাকে দেখে অফিসারের হাসি কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। 'আরে আপনি! আসুন আসুন! আসতে আজ্ঞা হউক নবাবপত্নীর! কী উপকার যে আপনি করলেন আমাদের! কষ্ট করে নিজেই চলে এসেছেন। রাস্তা ভেঙে এতটা পথ আর আমাদের যেতে হলো না...। ওহে, ছোকরা অফিসার, এদিকে আসো তো বাছা। যাও এই ঘাটের মড়া বুড়িটাকেও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাও!'

দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস যেতে থাকল। বেশ কয়েক মাস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে অবর্ণনীয় দুঃক্ষ-কষ্ট ভোগ করে মুক্তি পেলেন মা আর ভাইয়ারা! বাবার কোনো খোঁজ নেই। স্রেফ গায়েব হয়ে গেছেন বাবা। যেন ওই নামে কোনো মানুষ কোনো দিন পৃথিবীতে হেঁটে বেড়ায়নি! ছেলেমেয়েদের গভীর মনোযোগে চীনা আইন মুখস্থ করায়নি! সব সময় আদর্শ নাগরিক হবার উপদেশ দেয়নি!

শেষমেশ নিরুপায় হয়ে আমাদের দেশের বাড়ির কাউন্সিলে আমন্ত্রণপত্র পাঠাল আমার স্ত্রী। আমন্ত্রণপত্র বুঝেছেন তো? ওই যে চীন থেকে পরিবারের কোনো সদস্যকে কাযাখস্তানে নিয়ে আসার জন্য যে চিঠি লিখতে হয়, ওটার নাম আমন্ত্রণপত্র। চার

চারবার চিঠি পাঠাল সে। বাবার কোনো হদিস নেই। কী ঘটেছে তার ভাগ্যে, কোথায় আছেন, কেমন আছেন, বেঁচে আছেন না মরে গেছেন–কিছুই জানি না আমরা।

২০১৯ এর জানুয়ারীতে আগের বছরের অক্টোবরের তারিখের একটা চিঠি পেলাম আমরা। চীন থেকে এসেছে। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল! যাক, অবশেষে বাবার সংবাদ এসেছে!

চিঠি খুলে পড়ে ফেললাম এক নিমিষে!

মনে হলো আমি ভুল দেখছি। আবার পড়লাম। পরপর বেশ কয়েকবার পড়লাম। স্ত্রীকেও বললাম পড়ে দেখতে।

চিঠি পড়ে শূন্য চোখে ও তাকাল আমার দিকে। কিছু বললাম না আমি। উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার ধারে–বাইরে নীল আকাশ, পপি ফুলের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, পপলারের পাতায় পাতায় বাতাসের হুটোপুটি!

বাবার খবর পাওয়া গেছে!

বিশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে তাকে!

কী অপরাধ করেছেন বাবা! কোন আইনে বিশ বছর জেল দেয়া হলো–কিছুই জানানো হলো না। অন্ধকার... একেবারে ঘুটঘুটে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে আমরা। শুধু এটুকু জানি, উনাকে স্থানীয় জেল থেকে অন্য কোথাও পাঠানো হয়েছে। হয়তো লম্বা সাজা পাওয়া কয়েদিদের জন্য বরাদ্দ বিশেষ কোনো জেলখানায়।

বাবা ঘরে থাকতেই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুব কষ্টে ছিলেন। নিজ হাতে খেতে পারেন না। জেলেও হিসেব করে করে এত অল্প খাবার দেয়া হয় যাতে কয়েদিরা ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকে, মরে না যায়। লোক মারফত জেনেছিলাম স্থানীয় জেলে যখন ছিলেন তখন দৈনিক এক টুকরো বাসি রুটি আর এক পেয়ালা গরম পানি খেতে দেয়া হতো বাবাকে। নিজের হাতে তুলে রুটিটুকুও খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না বাবার। অন্য বন্দীরা সাহায্য না করলে বাবা হয়তো না খেতে পেয়েই মারা যেতেন! ইতিমধ্যেই মারা গেছেন কি না সেটাও তো জানার উপায় নেই!

একজনের কাছে শুনেছিলাম বাবাকে জেলখানায় ব্যাপক মারধর করেছে চীনা পিশাচগুলো। সাক্ষাৎ শয়তান এক একটা। যার কাছে শুনেছিলাম উনার পরিচয় প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। খুব বিশ্বস্ত মানুষ। উনিও বন্দী ছিলেন। মুক্তি পাবার পর পালিয়ে কাযাখস্তানে চলে এসেছেন। তিনি সামনাসামনি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি নন।

বাড়িতে এখন মা আর ভাইয়ারা থাকে। না! চীন সরকার রাতারাতি অতটা ভালো হয়ে

যায়নি যে কয়েক মাস ক্যাম্পে সাজা দিয়েই মা, ভাইয়াদের মাফ করে দেবে। বাড়ির মধ্যে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে পুলিশ...।

রাতে ঘুমুতে পারি না আমি। জানালার পাশে বসে কাটিয়ে দিই এক একটা দীর্ঘ রাত! ঝিরঝির করে কষ্ট ঝরে বুকের ভেতর!

বাবা, তুমি কি বেঁচে আছো? কেমন আছো বাবা? কেন ওরা তোমাকে বিশ বছর জেল দিলো? কী দোষ তোমার বাবা?

পুরুষ মানুষের নাকি কাঁদতে হয় না, আমি কাঁদি।

অঝোরে।

প্রতিরাতে।

বলুন আমাকে, আমার বাবার কী অপরাধ? অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হলো এটা কোনো অপরাধ হলো না, আর আমার বাবা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে চীনের আইন মেনেই অভিযোগপত্র লেখার কারণে বিশ বছরের কারাদণ্ড পেলেন! এ কেমন বিচার?

আমার বাবা– আমার বৃদ্ধ, প্রায় শয্যাশায়ী, অন্যের সাহায্য ছাড়া খেতেও পারেন না এমন অসহায়, চীনের আইনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল বাবা আজও নিখোঁজ।

কেউ তার কোনো খোঁজ জানে না।

স্রেফ হারিয়ে গেছেন, যেন কোনোকালেই পৃথিবীতে ছিলেন না!

দুই.

সবকিছু মনে নেই সেদিনের।

স্মৃতি ভিডিওর মতো চলমান হয় না, হয় ফটোগ্রাফির মতো টুকরো টুকরো। এই এক অংশ আছে তো অন্য অংশের স্মৃতি মনে নেই।[১৮২]

ওর সাথে প্রথম দেখা হবার দিনের সবকিছু খুঁটিনাটি মনে নেই। ওই দিন ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস–এটুকু মনে আছে। মার্চের ৮ তারিখ। আলমাটির এক ক্যাফেতে দেখা হলো নুরমামেত মামেনতিমিন এর সঙ্গে। ও ছিল চীন থেকে আসা উইঘুর যুবক। এক বছর আগে কাযাখস্তানে এসেছে। আমিও উইঘুর। কিন্তু আমি

[১৮২] প্রাগুক্ত। ২০১৯ এর মে মাসে শাখিদিয়াম মেমানোভা (৩১) (Shakhidyam Memanova) বেন মাউককে এই সাক্ষাৎকার দেন।

ছিলাম কাযাখস্তানের নাগরিক। আর ও কাযাখস্তানে একজন বিদেশি। প্রথম দেখাতেই বিদেশি যুবকের প্রেমে পড়ে গেলাম আমি। নম্বর আদান-প্রদান করলাম। দুই-তিন দিন পরেই ডেইটে গেলাম। বিয়েও করে ফেললাম কিছুদিনের মধ্যেই। রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করা পোষাল না আমাদের। ভালোবাসা তখন তুঙ্গে। মসজিদে গেলাম। ইমাম সাহেব বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। ব্যস, মামলা খালাস।

আলমাটির ইউনিভার্সিটি অফ পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রী আমি তখন। পড়তাম থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। বছর ঘুরতেই ছেলের মা হলাম আমি। সেই সময় আমরা থাকতাম চুন্দঝাহতে (Chundzha)। চীন সীমান্তের কাছাকাছি। থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও চাকরি জোটাতে পারলাম না। আসলে আমাদের ওইদিকে থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। অগত্যা স্বামীর সাথে ব্যবসায় নেমে পড়লাম।

চীন থেকে ফলমূল-শাকসবজি কিনে নিয়ে আসতাম আমরা। তারপর সেগুলো পাইকারি বা খুচরো, যখন যেটা সুবিধে হতো সেভাবে বিক্রি করতাম। খুব একটা টাকা আসত না। সংসার চালাতে কষ্টই হতো আমাদের। ২০১৩ তে এসে আবার মা হলাম! সিদ্ধান্ত নিলাম চীন চলে যাব। দেখা যাক ওখানে ভাগ্য ফেরে কি না।

চীনে এসে খুঁটি গাড়লাম উরুমচিতে। চার বছর কাটিয়ে দিলাম ওখানেই। তারপর গেলাম ঘুলঝাতে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে।

ততদিনে পূর্ব তুর্কিস্তানের অবস্থা আঁটসাঁট হতে শুরু করেছে। গ্রেফতার, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এসব নিয়ে কানাঘুষা চলছে। কিছু কিছু কথা আসছে আমাদের কানেও।

২০১৬ সালে আমাদের একবার কাশগড় যেতে হয়। শ্বশুরের একটা বাড়ি ছিল কাশগড়ে। কিছু মেরামতি করা লাগত। একমাসের মতো থেকে বাড়িটা ঠিক করে ভাড়া দেবার ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু কাশগড়ের অবস্থা দেখে বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। রাস্তার প্রত্যেকটা মোড়ে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে, ফোন চেক করা হচ্ছে। এমনকি পুলিশ আমাদের বাসার একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে বাড়ির বাসিন্দা ক'জন গুণে যেত।

কাশগড়ের পাট চুকিয়ে আবার ঘুলঝাতে ফেরত গেলাম। এদিকের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে ততদিনে। আমারা ছেলেরা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে শিক্ষকরা বাসায় এসে আমাদের কড়া গলায় শাসিয়ে যেত, 'প্রকাশ্যে নামায পড়বেন না'।

স্কুলে বাচ্চাদের জেরা করা হতো, 'এই, তোমাদের বাসার বড়রা কি নামায পড়ে?'

নামায পড়া একেবারে নিষিদ্ধ। নামায পড়লেই ঠিকানা হবে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। হিজাবের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। থুত্থুরে, ফোকলা দাঁতের বুড়িদেরকেও হিজাব ছাড়া বাইরে যেতে হতো। প্রত্যেক সোমবার আমাদের জেলার প্রায় সবাইকে জেলা অফিসে যেতে হতো। সেখানে চীনের পতাকা উত্তোলন হবে, আপনি জাতীয় সংগীত গাইবেন, পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। ফাঁকি দেবার কোনো উপায়ই নেই। সবার উপস্থিতি হিসেব করা হতো।

ভয়াল এক উপত্যকায় পরিণত হয়েছে ঘুলঝা। দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই ভয়ে হাত-পা জমে যেত। এই বুঝি পুলিশ এল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবার জন্য! বাতাসে কুটিল চক্রান্ত। অবিশ্বাসের কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে চরাচর। রাস্তাঘাটে কেউ কারও সাথে কথা বলত না। বিপদের ঝুঁকি নিতে চাইত না কেউই।

'কোনো কিছুই আমাদের কাছ থেকে লুকোতে পারবে না তোমরা। স্যাটেলাইট সিস্টেমের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিটা নড়াচড়া আমরা দেখতে পাই।' পুলিশ লেকচার ঝাড়ত। 'রান্নাঘরে কী করছ, ডাইনিঙে কী করছ–সবকিছুই আমরা জানি। সবকিছু, সবকিছু আমাদের নজরদারির আওতায়। কাজেই সাবধান!'

আমাদের এক বন্ধু ছিল। সে এক পুলিশ অফিসারের কাছে শুনেছিল, সরকার নাকি বিশেষ ধরনের একটা যন্ত্র বানিয়েছে, যার সাহায্যে দেয়ালের ভেতর দিয়েও নাকি দেখা যায়!

সত্য, মিথ্যে, গুজব, ভীত মস্তিষ্কের জল্পনাকল্পনা–সব মিলেমিশে তখন একাকার অবস্থা। কোনটা সত্য আর কোনটা যে মিথ্যে বোঝা দায়!

কুরআনের কপি, জায়নামাজ, আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-আশাক সব পুড়িয়ে ফেললাম। কাজটা সারলাম রাতে! দিনের বেলা স্যাটেলাইট দিয়ে পুলিশ না আবার দেখে ফেলে, এই ভয়ে!

চীনে আমি ছিলাম বিদেশি। স্বভাবতই আশেপাশে কোথায় কী হচ্ছে সে ব্যাপারে জানতে চাইতাম আমি। কিন্তু স্মার্টফোনও হাতছাড়া হয়ে গেল। পুলিশের ভয়ে ফোন নষ্ট করে ফেললাম। আমরা ইন্টারনেটে কোন কোন সাইটে যাচ্ছি, পুলিশ সেগুলো মনিটর করত। যেসব অ্যাপসের মালিকানা চীনের কোনো নাগরিকের না, এমন সব 'বিদেশি' অ্যাপস আনইন্সটল করে ফেললাম। এমনকি আমার ছোট্ট ছেলেমেয়ে দুটো যে গেইমস খেলত সেগুলোও আনইন্সটল করতে বাধ্য হলাম। তারপর একদিন সবগুলো স্মার্টফোন ভেঙে ফেললাম!

বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে? আমাদের ওই দিকের অবস্থা জানলে আর এ রকম মনে হতো

না আপনার। ধরুন, পুলিশ আমার ফোনে কোনো গেইমসের অ্যাপ পেল। তারপর কি হবে জানেন?

হাতকড়া পরিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে–'তোমার বাচ্চাকে কেন নেট ঘেঁটেঘেঁটে বিদেশি অ্যাপস নামানোর সুযোগ দিলে?'

আমার বাচ্চারা 'টকিং টম' নামের একটা অ্যাপ খুবই পছন্দ করে। এটা একেবারে সাধারণ একটা গেইমিং অ্যাপ। নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি এতে নেই। কিন্তু তবু আমাকে এটা আনইন্সটল করতে হয়েছে। চীনা প্রশাসনকে বিশ্বাস নেই। কখন কিসের অজুহাতে যে এরা মুসলিমদের কনসেন্ট্রেশনে পাঠাবে তা কেউই আন্দাজ করতে পারে না। এই শিশুতোষ, নির্দোষ অ্যাপ থাকার কারণেই এরা আমাকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে পারে।

২০১৮ সালের পহেলা মে। আমার স্বামীর মোবাইলে একটা ফোন আসে। ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় জানতে চাওয়া হয় আমার স্বামী বাড়িতে আছে কি না। 'দয়া করে বাড়িতেই থাকুন। আমরা আসছি। কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আপনার কাছ থেকে।' এটুক বলেই ফোন কেটে দেয় পুলিশ অফিসার।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাসায় চলে আসে সাদা পোশাকের একদল পুলিশ। আমার স্বামীর শৈশব নিয়ে ওদের অনেক কৌতূহল। বিশেষ করে ১৪ বছর বয়সের সময়টা নিয়ে ওদের অনেক জিজ্ঞাসা। কারণ ওই সময় ও এক প্রতিবেশীর কাছে কুরআন শিখেছিল।

'আচ্ছা আপনার ছেলেবেলা সম্পর্কে বলুন। আপনি তো কুরআন শিখেছিলেন ছোটবেলায়, তাই না? ১৪ বছর বয়স ছিল তখন আপনার?' ব্যঙ্গাত্মক একটা হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে রেখে শীতল গলায় প্রশ্ন করল এক পুলিশ অফিসার।

'জি, শিখেছিলাম। তবে আমার বয়স তখন আরও কম ছিল।' ঢোক গিলে জবাব দিলো আমার স্বামী।

'সে ক্ষেত্রে–দু-সেকেন্ড বিরতি দিলো অফিসার–আপনার বাবা-মাকে গ্রেফতার করতে হয়। ওরাই তো আপনাকে সে সময় কুরআন পড়িয়েছে।'

অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পুলিশ অফিসারের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে আমার স্বামী এবার বলল, 'আমার মনে হয়ে একটু ভুল হয়েছে–সে সময় আমার বয়স আসলে ১৬ ছিল।'

মাদ্রাসা বা কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমার স্বামী কুরআন পড়েনি। সে সময় এলাকার এক বৃদ্ধ বাচ্চাদের কুরআন পড়াতেন। শিশু-কিশোররা দলবেঁধে তার কাছে যেত, গোল হয়ে বসে কুরআন শিখত। আমার স্বামীও সেই উস্তাদের বাসায় কয়েকদিন

যাতায়াত করেছিলেন। ব্যস, এই। এই তার কুরআন শেখা!

স্বামীর উত্তরে পুলিশদের সন্তুষ্ট মনে হলো। চলে গেল ওরা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। কেন জানি না, তবে আমাদের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মাল কাহিনি এখানেই শেষ।

আমার স্বামীকে গ্রেফতার করা হলো মে মাসের পাঁচ তারিখ!

প্রথম দিনের রুটিন অনুসরণ করল ওরা। আমার স্বামীর মোবাইলে ফোন এল। ভারী গলায় ওপাশ থেকে হুকুম এল, 'দ্রুত নিকটস্থ পুলিশ বুথে যোগাযোগ করুন'।

সদর দরজা খুলে দুপা ফেললেই পুলিশ বুথ। ঘুলঝার প্রত্যেকটা মোড়ে একটা করে পুলিশ বুথ। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার স্বামী বের হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার আমার স্বামীর অপেক্ষায় ছিল। ওকে দেখামাত্রই কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনিই কি নুরমামেত মামেনতিমিন?' স্বামী মাথা নাড়িয়ে আইডি কার্ড দিলো। কার্ডে একনজর চোখ বুলিয়েই বিদ্যুৎগতিতে ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো পুলিশ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই! আমার স্বামীর ছোট ভাই চোখের সামনে এই ফিল্মি অ্যাকশন দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। ওর কিছুই করার ছিল না।

হাতকড়া পরানোর সাথে সাথেই আমার স্বামী বুঝে ফেলল, ওকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। 'আমার বাবা খুবই অসুস্থ। বলতে গেলে শয্যাশায়ী। হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে পারে না। দয়া করে আমাকে একটু বাবার সঙ্গে দেখা করতে দিন। বিদায়টুকু জানাতে দিন...!'

অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর পুলিশের মন গলল। ভ্যানে করে বাসায় নিয়ে এল ওকে ওরা।

একান্নবর্তী পরিবার আমাদের। ওর চারপাশ ঘিরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছি আমরা। আমার দেবররা, তাদের স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা, আমার শ্বশুর। ওর হাতে বিশাল এক হাতকড়া। সবার কাছ থেকে একে একে বিদায় নিল সে। আমার ছেলে বাবার হাতে শেকল দেখে অবাক হয়ে গেল। ছোট্ট জীবনে এর চেয়ে বিস্ময়কর জিনিস সে আর দেখেনি। আধো আধো বুলিতে বারবার প্রশ্ন করছিল, 'বাবা, বাবা, তোমার হাতে শেকল কেন? তুমি কী দোষ করেছ?'

এর ওর হাত ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করছিল, 'আমার বাবার হাতে হাতকড়া কেন? বাবা কি ক্রিমিন্যাল?'

ছোট্ট মানুষটার এই মৌলিক প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঘরময়। জবাব দিচ্ছিল না কেউ। কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে সহজ সরল। কিন্তু সবাই তা করতে পারে না। অবুঝ শিশু যে প্রশ্ন করল

তার উত্তর আমাদের সবার জানা–হ্যাঁ, ওর বাবা অপরাধী। ওর বাবার অপরাধ হলো, সে মুসলিম। ওর বাবার অপরাধ, সে উইঘুর।

কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলল না। বলতে পারল না। চুপ করে রইলাম আমরা। কিছু গরম কাপড় দিলাম ওকে। ক্যাম্পে যে ভয়াবহ ঠান্ডা এটা সবাই জানে। একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়া শেষ হলো ওর। হাতকড়ার একপ্রান্ত ধরে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলল ওকে চাইনিয পুলিশ। মরাবাড়ির কান্নার মতো কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমরা। ও কিছু বলল না। চোখে শত সহস্র প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। মুখে ম্লান একটা হাসি। হঠাৎ ওর চোখদুটো ঢাকা পড়ে গেল কালো কাপড়ে। মাথায় কালো কাপড় গলিয়ে ওর চোখ-মুখ ঢেকে ফেলেছে পুলিশ। টেনে ওকে গাড়িতে তোলা হলো।

আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি পাশাপাশি–আমি, ভাইয়া, ভাবি, বাবা, মা, আমাদের ছোট্ট ছেলেটা... পরিবারের সবাই। আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুই করতে পারলাম না। আশপাশের বাড়ির জানালাগুলো দখল করে আছে একদল ভীত, কৌতূহলী মুখে। সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে, আমার স্বামী নুরমামেত মামেনতিমিনকে চাইনিয পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

গাড়ির পেছনের হুড খুলে দিলো ওরা। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট–সবাই দেখুক, ইসলামের সামান্যতম নামগন্ধ পেলেই বরণ করতে হবে এই পরিণতি!

আর্তনাদ জানিয়ে স্টার্ট নিল গাড়ির ইঞ্জিন। হেডলাইটের আলোয় আঁধার কেটে কেটে আমার স্বামীকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ।

ওর অপরাধ?

২০ বছর আগে–যখন ওর বয়স ১৪–তখন এক বৃদ্ধের কাছে বন্ধুদের সাথে বসে কুরআন শিখেছিল সে কিছুদিন!

গরুখোঁজা করে আমার স্বামীর সব ক'জন বন্ধুকে খুঁজে বের করল পুলিশ। যারা যারা সেই বৃদ্ধের কাছে কুরআন শিখেছিল, তাদের একজনকেও বাদ দিলো না পুলিশ। সবাইকে ধরে ধরে পাঠিয়ে দিলো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

পুলিশ আমাদের জানিয়েছিল আমার স্বামীকে ঝুলিজ নামের একটা জায়গায় পাঠানো হবে। জায়গাটা ঘুলঝা থেকে মাইল পনেরো দূরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনো দিনই ওর দেখা পাইনি আমরা। এক বছর ধরে তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই! ক্যাম্প তো খুব বেশি দূরে নয়; কিন্তু আমাদের কারও সাহস হয়নি ক্যাম্পে যাওয়ার।

স্থানীয় এক পুলিশ দয়াপরবশ হয়ে মাঝে মাঝে ওর কিছু খবর এনে দিত। 'এই, তোমার

স্বামী ভালো আছে, ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।' সাহস জোগানোর চেষ্টা করত সে।

স্বামীকে ধরে নিয়ে যাবার এক মাস পর কাযাখস্তানে ফিরতে হলো আমাকে। বাচ্চাদেরকেও নিয়ে গেলাম। ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য। চীনে স্বামীর কাছাকাছি থাকতে চাচ্ছিলাম আমি। সেই সাথে ইচ্ছে ছিল ছেলে চীনের যে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিল সেখানেই যেন পড়াশোনা করে। কাযাখস্তানে গিয়ে আশাভঙ্গ হলো। এ ধরনের ভিসা নাকি এখন আর দেয়া হচ্ছে না। বাচ্চাদের চীন সরকার তখনই ভিসা দেবে যখন বাবা-মা দুজনের মধ্যে যে চীনের নাগরিক আবেদনপত্রে তার স্বাক্ষর থাকবে। আমার ছেলেদের জন্য এই স্বাক্ষর পাব কোথায়? স্বাক্ষর যে দেবে, সে-ই তো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে!

তবে এই সময় চীন থেকে ভালো একটা খবর পেয়েছিলাম। আমার স্বামী তার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার অনুমতি পেয়েছে। সে জানিয়েছে, 'আমি এখন আর ক্যাম্পে নেই মা। একটা জেলে নিয়ে এসেছে আমাদের ওরা। রাতারাতি আট হাজার বন্দীকে ক্যাম্প থেকে এই জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলটা কুনেসে। ঘুলঝা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে।' ওদের সবাইকেই একটা করে নম্বর দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। ওর নম্বর ৬ হাজারের ঘরের–আমার এখন ঠিক মনে নেই আসলে। এই নম্বর থেকেই আমার স্বামী বের করেছে সেখানে কতজন বন্দীকে এক রাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

না, ওদের কোনোরকম বিচার হয়নি, কোনো সাজাও দেয়া হয়নি। স্রেফ বন্দী করে রেখেছে!

সপ্তাহ দুয়েক হলো আমার নিখোঁজ স্বামীর ব্যাপারে মুখ খুলেছি। এর আগে ওকে নিয়ে কারও সামনে কোনো উচ্চবাচ্য করিনি। কারণ আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ভয় পাচ্ছিলেন, এতে চাইনিয সরকার ক্ষেপে গিয়ে আরও অত্যাচার না শুরু করে আমার স্বামীর ওপর। এখন অবশ্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন–অনেক চুপ করে থাকা হলো, এবারে কিছু একটা করা যাক! অভিযোগ দায়েরের পরিকল্পনা করছি আমরা। সরাসরি ওর কেইসের ব্যাপারে আমরা কেউ কথা বলতে পারি না। কৌশলের আশ্রয় নেই, সংকেত ব্যবহার করি। যেমন ধরুন এমন বলি,

'বাবা, আজকে আমার ছেলের জন্য এই এই কাগজপত্রগুলো গোছালাম'।

'আমার ছেলে' বললে উনারা বুঝে যান আমি স্বামীর কথা বলছি।

আমার ছেলে কেমন যেন ঝগড়াটে হয়ে গেছে, তিরিক্ষি মেজাজের। ছোট মেয়েটার এখনো বোঝার বয়স হয়নি তার বাবার আসলে কী হয়েছে! মিহি গলায় বারবার জিজ্ঞাসা করে, 'মা, বাবা কোথায়? বাবা কবে বাড়ি আসবে? বাবা কেন বাড়ি আসে

না?'

বুকের মধ্যে খামচে ধরে কিছু একটা, কলিজাটা কে জানি ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে দেয়।

ভাই-বোন দুজনেই বুঝে গেছে, ওদের বাবা আর আসবে না। দৌড়ে এসে কোলে তুলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেবে না, ঘাড়ে ঝুলিয়ে ঘুরতে নিয়ে যাবে না।

বাবা আর কখনোই আসবে না।

বাবা হারিয়ে গিয়েছে।

আমার ছেলেমেয়েদের শৈশব নষ্ট হয়ে গেছে।

দুমাস আগে, মানে মার্চে, চীনে যাবার একটা গ্রুপ ট্যুরিস্ট ভিসা জোগাড় করতে পেরেছিলাম। তিন দিনের ট্যুরিস্ট ভিসা, এ ছাড়া আর কোনোমতেই পূর্ব তুর্কিস্তানে যাবার উপায় নেই।

ভিসা তো জোগাড় হলো, কিন্তু টাকা! ছেলেমেয়েদের পেটপুরে খাবার খাওয়াতেই তো পারি না আমি। থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ এখানে নেই। আলমাটিতে যেতে হবে আমাকে কাজের জন্য। কিন্তু আলমাটিতে গেলে ছেলেমেয়েদের কী হবে? ওদের কার কাছে রেখে যাব? কী একটা অবস্থা!

শ্বশুরবাড়িতে ফোন করলাম আমি। জানালাম, আমি আসছি।

পরের দিন খুব ভোরে ফোন এল। এত সকালে কে ফোন করল? নম্বর দেখেই বুকের মাঝে ছ্যাঁৎ করে উঠল। শ্বশুরবাড়ির ফোন। খবর নিশ্চয়ই খারাপ।

মা কথা বললেন। জানালেন, 'এদিকের আবহাওয়া বদলে গিয়েছে। না এলেই ভালো করবে বোধহয়। বৃষ্টিতে একদম ভিজে যাবে তুমি, মা।

এসো না।'

পাঠক, মনে রাখবেন, এই গল্পগুলো অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের গল্প। এই মানুষগুলো তাদের প্রিয়জনদের অবস্থান বা অবস্থা শনাক্ত করতে পেরেছেন। তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে–জেল না মৃত্যু–সেটাও জানতে পেরেছেন। কিন্তু এমন লক্ষ লক্ষ উইঘুর আছে যাদের ভাগ্যে এটুকুও জোটে না। জানতেও পারে না তাদের স্বজনদের ভাগ্যে কী ঘটেছে? প্রিয়মুখগুলো কোথায় আছে? কেমন আছে? বেঁচে আছে না মরে গেছে? জানতে পারে না কিছুই! নিস্প্রভ চোখে ভেঙ্গে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া এক জাতি অপেক্ষা করে থাকে মহাকাশের মতো ব্যাপক ও বিস্তৃত শূন্যতা বুকে।

খুন রাঙা পথ
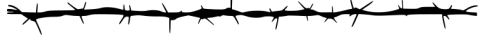
উরুমচির ব্যস্ত এক বাজার।

২০১৪ সালের ২২ মে। সকাল। ঘড়িতে সময় ৭টা ৪১ মিনিট। অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়ল দুটো ছাইরঙা ফোক্সওয়াগ্যান এসইউভি। দুটো গাড়ির নম্বরপ্লেটই কাদাতে ঢাকা। পড়ার উপায় নেই। দুই গাড়িতে বসে আছে মোট পাঁচজন উইঘুর।

বাজারের লোকদের চাপা দেয়া শুরু করল ফোক্সওয়াগ্যান এসইউভি বেপরোয়াভাবে। গাড়ির সামনে থেকে দোকানি বা ক্রেতা চিৎকার দিয়ে ছিটকে ছিটকে সরে গেল। যারা পারল না তারা চাপা পড়ল গাড়ির নিচে। ভেতর থেকে ছোড়া হলো বেশ কিছু বিস্ফোরক। ৭টা ৫০ মিনিটে ফোক্সওয়াগ্যান দুটি মুখোমুখি ধাক্কা খেলো। বাঁকা হয়ে গেল একটা। তারপর বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড শব্দে। ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল বেশ দূর থেকে। আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশ গ্রাস করে নিল ফোক্সওয়াগ্যানকে।

পাঁচজন ক্ষুব্ধ উইঘুরের এই ঝটিকা অপারেশনে মারা গেল ৪৩ জন (কেউ কেউ বলছে ৩১ জন[১৮৩]), আহত হলো ৯০ জন। পাঁচজন আক্রমণকারীর মধ্যে মারা গেল চারজনই।[১৮৪]

---

[১৮৩] Xinjiang: Tight security after deadly violence. BBC News, July 30th, 2014. https://tinyurl.com/tx4krht

[১৮৪] In China's Far West, a City Struggles to Move On. Andrew Jacobs. The New York Times, May 23rd, 2014. https://tinyurl.com/rlnchk6

এর দিনকয়েক আগে এপ্রিলের ৩০ তারিখে উরুমচি দক্ষিণ রেলওয়ে স্টেশনে ছুরিসহ প্রবেশ করে দুইজন উইঘুর। সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে অ্যাকশন শুরু করে ওরা। এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করতে থাকে স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীদেরকে। মারা যায় তিনজন–যাদের মধ্যে দুইজনই আক্রমণকারী। আক্রমণের এক পর্যায়ে ওরা নিজেদের শরীরে বাঁধা বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটায়। আহত হয় ৭৯ জন।[১৮৫]

মার্চের ১ তারিখেও কুমিং রেলওয়ে স্টেশনে ঠিক একই প্যাটার্নে ছুরি হাতে চীনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একদল উইঘুর। সেই আক্রমণে মারা গিয়েছিল ২৯ জন।[১৮৬]

দশকের পর দশক ধরে জমা উইঘুরদের ক্রোধের এই বিস্ফোরণ দেখে রেগে ফায়ার হয়ে গেল চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। উইঘুরদের চরম এক শিক্ষা দেবার জন্য দাঁড় করালো ভয়ংকর এক নীল নকশা। পার্টির অফিশিয়ালদের সাথে একের পর এক গোপন মিটিঙে ভাষণ দিলো। সবাইকে বলল, 'এখনই সময়। আমরা সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে অলআউট অ্যাকশনে নামব। তামা আর স্টিলের আকাশসমান উঁচু প্রাচীর তৈরি করব, আকাশ সমান উঁচু জাল বিছাবো–একটা একটা করে সব কয়টা সন্ত্রাসীকে ধরব আমরা।'[১৮৭]

এক মাস পরে বেইজিঙে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আরেক মিটিঙে শি জিনপিং ধর্মীয় উগ্রবাদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে বলল, 'আসলে ধর্মবিশ্বাস একধরনের মাদকের মতো, যখনই আপনি ধর্মে বিশ্বাস করবেন তখন আপনি স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলবেন–করে ফেলবেন যেকোনো কিছু।'

উরুমচি পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট পরিদর্শনে গেল শি জিনপিং। সব দেখেশুনে মন্তব্য করল, 'আমাদের কমরেডরা একদম সেকেলে পদ্ধতিতে কাজ করে। আপনাদের কাছে থাকা কোনো অস্ত্রই উইঘুরদের ছুরি বা কুড়ালের জবাব দিতে সক্ষম নয়। তাদের প্রতি আমাদের তাদের মতোই কঠোর আচরণ করতে হবে। কোনো

---

[১৮৫] Security tightened after three killed in bomb, knife attack at Urumqi train station. Li Jing & Adrain Wan. South China Morning Post, May 1st, 2014. https://tinyurl.com/tyue6yd

[১৮৬] Chinese Uighurs defy Ramadan ban. Umar Farooq. Al Jazeera, July 5th, 2014. https://tinyurl.com/wbh4cf3

Xinjiang: Tight security after deadly violence. BBC News, July 30th, 2014. https://tinyurl.com/tx4krht

[১৮৭] Her Uighur Parents Were Model Chinese Citizens. It Didn't Matter. Sarah A Topol. The New York Times Magazine, January 29th, 2020. https://tinyurl.com/rqs53lx

ধরনের দয়া দেখানো চলবে না।'[১৮৮]

এরপর উইঘুর মুসলিমদের সাথে চীন কী কী করল তা তো আপনারা দেখলেনই পুরো বইজুড়ে।

ঘটনাপ্রবাহকে যখন এভাবে উপস্থাপন করা হয় তখন মনে হয় উইঘুরদের 'সন্ত্রাসের' সামনে চীন আত্মরক্ষা করছে। চীন সরকার ঠিক এ কাজটাই করে। এমন ভাব ধরে যেন এর আগে ওরা একেবারে নিষ্পাপ ছিল। আগে উইঘুরদের মুখে সোনার চামচে করে দুধ খাইয়ে দেয়া হতো, একেবারে রাজার হালে রেখেছিল। কিন্তু উইঘুর সন্ত্রাসীরাই আগবাড়িয়ে এসে আক্রমণ করল ২০১৪ সালে। তাই না চাইলেও কঠোর হতে হচ্ছে ওদের ওপর। বাবা ছেলেকে যেভাবে মঙ্গলের জন্য শাসন করে, ভবিষ্যতের জন্য সেভাবে শাসন করছে। সবকিছুর জন্য দায়ী এই উইঘুর সন্ত্রাসীরাই। ওরাই সব নষ্টের মূল।

কিন্তু বাস্তবতার সাথে চীনের এসব গাল্পপ্পের কোন সম্পর্কই নেই। পাঠক, ইতিহাস ২০১৪ সালে শুরু হয়নি; ইতিহাস শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে। শোষণ, নির্যাতন আর গণহত্যার এক ইতিহাস। রক্তাক্ত, করুণ, বীভৎস এক ইতিহাস।

প্রায় ২০০০ বছর ধরে পূর্ব তুর্কিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করেছে চীনারা।

৯৫ হিজরীতে কুতাইবা বিন মুসলিম বাহেলী রহিমাহুল্লাহ-এর কাশগড় বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব তুর্কিস্তানে ইসলাম প্রবেশ করে। পরে ৩৩২ হিজরীতে সুলতান সুতুক বুগরা খানের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এভাবে প্রায় দশ শতাব্দী তা স্বাধীন ইসলামী ভূখণ্ড হিসেবে সমুন্নত থাকে।

সর্বপ্রথম ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে চীন তা অবৈধভাবে দখল করে। তাদের এই দখলদারি স্থায়ী হয় চার বছর। দ্বিতীয়বার দখল করে ১৮৮১ সালে। এই দখলদারি আগেরবারের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয়। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে চীনের আনুগত্যকে প্রত্যাখান করে 'পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নামে কাশগড়ে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় উইঘুররা। কিন্তু সীমানার ওপারের তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া কখনো এই রাষ্ট্রকে মেনে নেয়নি। সীমান্তে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রকে নিজেদের জন্যে হুমকি মনে করল সোভিয়েত

---

[১৮৮] 'Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims, Austim Ramzy & Chris Buckley. The New York Times, November 16th, 2019. https://tinyurl.com/vavm8d3

ইউনিয়ন। তাই আবার পূর্ব তুর্কিস্তানকে দখল করতে তারা চীনকে প্রত্যক্ষভাবে মদদ করল। এই দুই শক্তির সামনে টিকতে পারেনি উইঘুরদের ছোট্ট রাষ্ট্রটি।

সর্বশেষ ১৯৪৯ সালে শেষবারের মতো চীন পূর্ব তুর্কিস্তানকে দখল করে। সর্বোচ্চ গোপনীয়তায় তারা চালায় জঘন্য হত্যাকাণ্ড । সেখানকার মাযলুম মুসলিমদের সমস্ত ইসলামী আনুষ্ঠানিকতা নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদ ধ্বংস করা হয়। উইঘুরদের ভাষার বদলে চাইনিয ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়। হাজারো আলিম-উলামাকে গুম করে হত্যা করা হয়।[১৮৯]

২০০৮ সালের জরিপে দেখা যাচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ হলো উইঘুর মুসলিম আর ৪০% হলো হান চাইনিয। অথচ ১৯৪৫ সালের সমীক্ষা বলছে, সে সময় উইঘুর ছিল ৮২.৭%, আর হানদের অবস্থান কখনো ৭% এর বেশি ছিল না। মাঝে চীন সরকার বিপুল পরিমাণ উইঘুরদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে আর বেকার হানদের সেই শূন্যস্থানে স্থানান্তর করেছে।[১৯০]

পূর্ব তুর্কিস্তানের জনমিতি আমূল বদলে দেয়ার পরিকল্পনা চীনের কেবল। চায়না প্রপার থেকে হান চাইনিয আমদানী করে এটা করা সম্ভব না। তাই উইঘুর কাযাখ মুসলিমদের সংখ্যা কমানোর জন্য অত্যন্ত হিসেব কষে মাঠে নেমেছে চীন। ঠাণ্ডা মাথায় অনুসরণ করছে শিশু হত্যার ফিরআউনি নীতির।

উইঘুর কাযাখ মুসলিমদের জন্য সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে চীন। গ্রামের উইঘুর পরিবারে সর্বোচ্চ ৩ জন সন্তান থাকতে পারবে। শহুরে উইঘুরদের জন্য অনুমোদিত সন্তান সংখ্যা ২। এবং অবশ্যই এক সন্তান থেকে অন্য সন্তানের বয়সের ব্যবধান কমপক্ষে ৩ বছর হতে হবে। কমসেকম ২০০৫ সাল থেকে, চীন অত্যন্ত কঠোরভাবে এই নিয়মগুলো বাস্তবায়ন করছে পূর্ব তুর্কিস্তানে। প্রত্যেকটা হাসপাতালে পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট আছে। উইঘুর, কাযাখ মুসলিমদের কার কয়টা বাচ্চা আছে, কে কখন জন্মগ্রহণ করেছে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে খুঁটিনাটি সকল তথ্য আছে তাদের কাছে। হান চাইনিযদের ঠিক করে দেয়া নিয়মের বাইরে যাবার কোনো সুযোগ নেই।

নিয়মের বাইরে গেলে আটমাস বা নয়মাসের গর্ভবতী মহিলাকেও গর্ভপাত করানো হয়। অনেক সময় জন্মানোর পর নিষ্পাপ শিশুকে খুন করা হয় হাসপাতালের প্রসূতি

---

[১৮৯] পূর্ব তুর্কিস্তান : একটি মুসলিম ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্র।-https://tinyurl.com/rqvn৭hr
China's secret internment camps. Vox. May 7th, 2019. https://tinyurl.com/y5bpg7mr
[১৯০] Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uyghur Migrants in Urumqi Anthony Howell and C. Cindy Fan- https://tinyurl.com/wdwg8k5

বিভাগে। খুন হওয়া শিশুর মরদেহটাও পায় না উইঘুর বাবা মা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই নবজাতকদের মৃতদেহের ‘ব্যবস্থা’ করে। প্রশাসনের নির্দেশ। হাসপাতালের বাইরেও বাচ্চার জন্ম হলে রেহাই নেই। পরিবার পরিকল্পনা ইউনিটের লোকজন ঠিকই তা জেনে ফেলবে। তারপর মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে খুন করে ফেলবে।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক এলাকায় পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা অফিস আছে। সন্তান জন্ম দিতে হলে সব উইঘুর, কাযাখকে আগে এসব অফিসে এসে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। পরিবার পরিকল্পনা অফিসের লোকজন বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেয়। কোন বাড়িতে কে গর্ভবতী, কার ক'মাস চলে, আগের কয়টা বাচ্চা - সব তথ্য ওদের মাধ্যমে চলে যায় উপরের কর্তাদের কাছে। যদি কোন পরিবারে ‘অননুমোদিত’ গর্ভধারণ হয় তাহলে ওরা রিপোর্ট করে। কিছুদিন পর সেই পরিবারের মাকে গর্ভপাত করতে বাধ্য করা হয়। কোন পরিবারে সন্তান কেবল একজন। কিন্তু প্রথম সন্তানের জন্মের পর তিন বছরের বিরতির আগেই মা সন্তানসম্ভবা হয়ে গেছেন, এমন ক্ষেত্রেও ওরা জোর করে গর্ভপাত করায়![১৯১]

জ্বি, আপনি ঠিকই পড়ছেন। এমনটাই চীন সরকারের নিয়ম। ফিরআউনের প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে হান চাইনিযদের ঘাড়ে। লাখে লাখে নব্য ফিরআউন ঘুরে বেড়াচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তানজুড়ে।

এভাবে কোন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রজনন আর জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ সরাসরি গণহত্যার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। আজ প্রায় বিশ বছর যাবত পূর্ব তুর্কিস্তানে এই পলিসি বাস্তবায়ন করে আসছে চীন। কিন্তু কেউ টু শব্দটিও আজ পর্যন্ত করেনি।

পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। আয়তন প্রায় সতেরো লক্ষ কিলোমিটার। সে হিসেবে তা বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় দশগুণ বড়। প্রাকৃতিক সম্পদে টইটম্বুর এই অঞ্চল। চীনের মোট কয়লার ৪০ ভাগ মজুদ আছে পূর্ব তুর্কিস্তানের মাটির নিচে। মোট গ্যাস রিজার্ভের ২০ শতাংশ পূর্ব তুর্কিস্তানে সেই সাথে ২০ শতাংশ উইন্ড এনারজি।[১৯২] পুরো চীনের ৪০% অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে এই এলাকা; অথচ

---

[191] Xinjiang Hospitals Aborted, Killed Babies Outside Family Planning Limits: Uyghur Obstetrician. Radio Free Asia. August 17th, 2020. https://tinyurl.com/y2lo97e3

[১৯২] China's secret internment camps. Vox. May 7th, 2019. https://tinyurl.com/y5bpg7mr

উইঘুর মুসলিমদের ৮০% জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে!

পূর্ব তুর্কিস্তান দখল করে নিজেদের দেশের অংশ করে নিলেও হান চাইনিযরা কখনোই নিজেদের অংশ মনে করেনি পূর্ব তুর্কিস্তানকে। কখনোই একই দেশের নাগরিক হিসেবে সমতার চোখে গ্রহণে করে নেয়নি উইঘুরদের। সব সময় প্রভুসুলভ আচরণ করে গিয়েছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের সাথে। বেনিয়ার জাত ব্রিটিশরা যেমন ভারতবর্ষসহ তাদের অন্যান্য উপনিবেশে স্থানীয়দের শোষণ করেছে, ঠিক সেভাবেই হান চীনারা শোষণ করেছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের।

মুসলিমদের দিয়ে জোর করে তুলা আর গম চাষ করিয়েছে হান চীনারা।[১৯৩] প্রত্যেক কৃষকের জন্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হতো। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলেই নেমে আসত যুলুম। ধন-সম্পদ, গৃহস্থালির জিনিসপত্র, পশু— সবকিছু কেড়ে নিয়ে যেত ওরা।[১৯৪]

গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও যেদং The Great Leap Forward নামে পাঁচ বছরব্যাপী এক পরিকল্পনা করল চীনকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং একটা আদর্শ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে চীনা কমিউনিস্ট সরকার কৃষি জমিগুলোর ব্যক্তিমালিকানা কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়। অসংখ্য কৃষককে বাধ্য করা হয় নিজেদের জায়গা-জমি ছেড়ে স্টিল এবং লোহার ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে। কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্তে ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসে চীনে। একে বলা হয় মানুষের হাতে তৈরি সবচেয়ে বড় বিপর্যয়।[১৯৫]

১৯৫৯ সালে সমগ্র চীনজুড়ে শুরু হয় ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে যা পরিচিত 'গ্রেট চাইনিয ফ্যামিন' নামে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত চলে এই দুর্ভিক্ষ। সরকারি হিসেবে বলা হয় দেড় কোটি লোক মারা গিয়েছে এই দুর্ভিক্ষের কারণে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন এই সংখ্যা অনেক বেশি। মৃতের আসল সংখ্যা ৪৫ মিলিয়নের মতো। ৪৫ মিলিয়ন মানে ৪ কোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষ। এর মধ্যে ২০ থেকে ৩০ লাখ লোককে কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবে পিটিয়ে মারা হয়। ঠিকমতো কাজ না করার অভিযোগে গাছে ঝুলিয়ে পিটিয়ে মারা হয় এই হতভাগ্য মানুষদের। অনেককে হাত-পা বেঁধে পুকুরে ছুড়ে ফেলে পানিতে ডুবিয়ে

---

[১৯৩] ইংরেজ বেনিয়ারা আমাদের দিয়ে এভাবেই জোর করে নীল চাষ করাতো। তুমুল অত্যাচার করত। আজকে এসব ফিরিঙ্গি বেনিয়ারাই বিশ্বজুড়ে মানবতার পাঠ দিয়ে বেড়ায়। কী সুন্দর 'তামাশা'!

[১৯৪] Ghulja Massacre on February 5, 1997 in East Turkistan (Documentary). Erk Uygur. https://tinyurl.com/skrw4kr

[১৯৫] The Worst Man-Made Catastrophe, Ever. Roderick Macfarquhar. China File, February 9th, 2011. https://tinyurl.com/sbtbtzw

মারা হয়। সবচেয়ে ছোট (খুবই তুচ্ছ) অপরাধের শাস্তি ছিল অপরাধীর শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়া বা মলমূত্র খেতে বাধ্য করা।

ওয়াং যিউ (Wang Ziyou) নামের এক লোকের কাহিনি শুনে দেখুন। চাইনিয কমিউনিস্টরা এই লোকের কান কেটে দেয়, লোহার তার দিয়ে পা বেঁধে ফেলে, তারপর দশ কেজি ওজনের পাথর ওপর থেকে তার পিঠের ওপর ফেলে। উত্তপ্ত লোহা চেপে ধরা হয় তার পিঠে—মার্কা মেরে দেয়া হয়। এই লোকের অপরাধ কী ছিল জানেন? মাটি খুঁড়ে একটা আলু বের করা!

এক বাবাকে বাধ্য করা হয় তার ছেলেকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতে। ওই ছেলেটার দোষ ছিল সে এক মুঠো শস্য চুরি করেছিল।[১৯৬]

হেনান প্রদেশের শস্যদানার গোডাউনের দরজায় দরজায় পড়ে থাকতে দেখা যায় কৃষকের হাড়-জিরজিরে লাশ। মরার আগে তারা দুর্বল গলায় চিৎকার করতে থাকে, হে কমিউনিস্ট পার্টি, হে চেয়ারম্যান মাও, আমাদের বাঁচান।[১৯৭] হেনান আর হেবেই

---

[১৯৬] Mao's Great Leap to Famine. Frank Dikotter. The New York Times, December 16th, 2010. https://tinyurl.com/y9k4g8dr

[১৯৭] নাস্তিক কমিউনিস্টরা বিল্পব বিপ্লব বলে হাইপ তোলে, অদ্ভুত এক রোমান্টিসিসমে তৈরি করে স্বপ্নালু চোখের তরুণদের ভেতর। চে গুয়েভারার ছবিওয়ালা ক্যাপ আর টি শার্ট পরে শাহবাগে ঘোরাফেরা করে কমিউনিজমের আফিমগেলা তরুণ ও যুবকের দল। আমাদের দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, মিডিয়াকর্মীরা কমিউনিজমের ব্র্যান্ড এম্বাসাডর। নানানভাবে এরা কমিউনিযম প্রমোট করে। কিন্তু এই কমিউনিযম কী দিয়েছে বিশ্বকে? বিপ্লবের নামে গত ১০০ বছরে প্রায় ১২০ মিলিয়ন মানুষ মেরেছে এই কমিউনিস্টরা। চিন্তা করতে পারেন? ১২ কোটির কাছাকাছি! কেবল চীনেই মেরেছে ৮ কোটি ২০ লাখ। রাশিয়াতে মেরেছে ২ কোটি ১০ লাখ। উত্তর কোরিয়ায় মেরেছে ৪৬ লাখ, ভিয়েতনামে ৩৮ লাখ, কম্বোডিয়ায় ২৪ লাখ, আফগানিস্তানে ১৫ লাখ। আরও অন্যান্য অনেক দেশে মেরেছে অনেক মানুষ। অবস্থার ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য একটা সম্পূরক তথ্য দিই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ থেকে ৮ কোটির মতো। হিটলারের চাইতে অনেক অনেকগুণ বেশি মানুষ মেরেছে চীনের ‘কমিউনিস্ট গুরু’ ‘মাও যেদং’ একাই।

Who Killed More: Hitler, Stalin, or Mao? Ian Johnson. China File, February 5th, 2018. https://tinyurl.com/wce7xp4

Source List and Detailed Death Tolls for the Primary Megadeaths of the Twentieth Century.Necometrics. http://necrometrics.com/20c5m.htm

Currently There Are More Than 120 Million Deaths Caused By That Ideology. Counting Stars, December 18th, 2017. https://tinyurl.com/uz4bhwe

100 Years of Communism—and 100 Million Dead. David Satter. The Wall Street Journal, November 6th, 2017. https://tinyurl.com/y7837ysh

নাস্তিক কমিউনিস্টরা মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, গুলি করে মেরেছে গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ বাবা-মাকে; কারণ তারা শ্রম দিতে পারে না। এত অপরাধ করার পরেও এরা সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী হলো

এর গোডাউন খুলে দিলেই কেউ না খেয়ে মরত না। কিন্তু মৃত্যুর মিছিল দেখেও মন গলেনি কমিউনিস্ট পার্টির।[১৯৮]

এই ভয়াবহ মানবেতর পরিস্থিতির মধ্যেও চলে উইঘুর মুসলিমদের ধর্ম, সংস্কৃতির ওপর আঘান হানা। কালচারাল রিভোলিউশন বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (১৯৬৬-১৯৭৬) পুরো সময় জুড়ে চলতে থাকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ। ধ্বংস করা হয় একের পর এক মসজিদ[১৯৯], পুড়িয়ে ফেলা হয় অসংখ্য কুরআনের কপি, নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় হাজ্জে যাওয়া। ধর্মের কোনো চিহ্নই সহ্য করতে পারত না কমিউনিস্ট রেড গার্ডরা। ২০ থেকে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয় এ সময়।[২০০] এভাবে দশকের পর দশক ধরে পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে হান চাইনিযরা।

ধরুন আপনি একজন উইঘুর। জীবন নিয়ে অনেক স্বপ্ন আপনার। অনেক পরিকল্পনা। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, করতে চান গাড়ি-বাড়ি। তাহলে প্রথমেই আপনাকে মেনে নিতে হবে হানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের প্রতি আনুগত্য। আপনাকে মেনে নিতে হবে চীনের মালিক হলো হান চাইনিযরা, তারা আপনাকে দয়া করে চীনে থাকতে দিয়েছে। তারপর অবশ্যই আপনাকে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে হবে যেটা চাইনিয ভাষায় এবং চাইনিয সিলেবাসে পাঠদান করে। উইঘুরদের স্কুলে পড়াশোনা করলে জীবন নিয়ে তথাকথিত রঙিন স্বপ্ন না দেখাই ভালো।

মুসলিমরা। মুসলিমরাই রক্তের জন্য পাগল! ওরা মানবতার জন্য হুমকি না। হুমকি হলো নিজেদের মা বোন শিশু আর ভূমি রক্ষার জন্য চেষ্টা করা মুসলিমরা। পাঠক বেসিক একটা প্রশ্ন করি, অনুগ্রহ করে বলতে পারবেন তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসীদের হাতে কয় কোটি মানুষ মারা গিয়েছে পৃথিবীতে? তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসীরা কোন কোন দেশে গর্ভবতী নারীকে গুলি করে মেরেছে? কারণ সে উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রম দিতে অক্ষম?

[১৯৮] “A hunger for the truth: A new book, banned on the mainland, is becoming the definitive account of the Great Famine.” Archived 10 February 2012 at the Wayback Machine, chinaelections.org, 7 July 2008 of content from Yang Jisheng, **墓碑 ——中國六十年代大饑荒紀實** (Mu Bei – Zhong Guo Liu Shi Nian Dai Da Ji Huang Ji Shi), Hong Kong: Cosmos Books (Tian Di Tu Shu), 2008, ISBN 9789882119093 (in Chinese)

[১৯৯] অবশ্য মাও যেদং-এর মৃত্যুর পর অনেক মসজিদ আবার খুলে দেয়া হয়।

[২০০] Who Killed More: Hitler, Stalin, or Mao? Ian Johnson. China File, February 5th, 2018. https://tinyurl.com/wce7xp4

The history of China’s Muslims and what’s behind their persecution. Kelly Anne Hammond. The Conversation, My 24th, 2019

পাঠক, আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক রহিমা মাহমুতকে। পেট্রোকেমিকেল ইঞ্জিনিয়ার এই উইঘুর ভদ্রমহিলা ছেলেকে সাথে নিয়ে পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে লন্ডনে। লন্ডনে বসে উইঘুরদের ওপর চালানো হান চাইনিযদের অত্যাচার-নির্যাতনের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছেন। লন্ডনে নিজের অফিসে বসে সাংবাদিক শাও-হুং পাই-কে দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকার দেয় মাহমুত[২০১] নিজের মাটি আর মানুষ সম্পর্কে। খুলে খুলে বর্ণনা করে উইঘুরদের সাথে হান চাইনিযদের সহাবস্থানের বিষয়াদি। চলুন মাহমুতের মুখে শোনা যাক যুগ যুগ ধরে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমরা কেমন ব্যবহার পেয়ে আসছে হান চাইনিযদের কাছ থেকে।

'...আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পরিস্থিতি এখনকার মতো ছিল না।[২০২] প্রত্যেকটা স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে চীনা ভাষায় চীনা সিলেবাসে পড়াতে হবে, সরকারের তরফ থেকে এমন কোনো নির্দেশনা তখন ছিল না। আমরা উইঘুরদের স্কুলে যেতে পারতাম। উইঘুর সিলেবাসে পড়তে পারতাম। উইঘুর স্কুলে যদিও চাইনিয ভাষা পড়ানো হতো, কিন্তু পাঠদানের মাধ্যম ছিল উইঘুর ভাষা। আমি আর আমার এক ভাই চাইনিযদের স্কুলে পড়তে গেলাম। চাইনিয স্কুলে পড়াশোনা করার কারণে একদম ছোট থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম, হান চাইনিয আর আমরা এক নই। আমরা আলাদা। সেই ছোট বয়সেই বুঝেছিলাম কীভাবে পদে পদে ওদের হাতে আমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, শুধু উইঘুর হবার কারণে আমাদের সাথে অন্যরকম ব্যবহার করা হচ্ছে।

মনে মনে একটা শপথ করেছিলাম আমি–ভালো রেসাল্ট করতে হবে। খুব পড়াশোনা করতাম। নিজেকে মাঝে মাঝেই শোনাতাম, 'আমাকে অবশ্যই হান চাইনিযদের কাছে প্রমাণ করতে দিতে হবে ওরা আমাদের যা ভাবে আমরা তা নই।' হান ছাত্রছাত্রী এমনকি শিক্ষকদের মধ্যে পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে উইঘুরদের মাথায় নির্ভেজাল গোবর পোরা, উইঘুররা অলস। আর দুনিয়ার সব বুদ্ধি ওদের মাথায়, ওরা অনেক পরিশ্রমী। উইঘুরদের তুলনায় ওরা অনেক উন্নত, অনেক এগিয়ে।

সারাজীবন শুধু আমি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে গেলাম, ওরা যেমন ভাবে উইঘুররা তেমন নয়। আমরা শুধু ভালোই না, ওদের তুলনায় অনেক ভালো। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে মাহমুতের দু-চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, হাতদুটো হলো মুষ্টিবদ্ধ।

---

[২০১] মাহমুতের কাহিনি নেয়া হয়েছে "People will rise up": Uyghur exile foresees end of China's ruthless rule. Hsiao-Hung Pai. Open Democracy, October 25th, 2019. https://tinyurl.com/uvzg98e থেকে।

[২০২] পরিস্থিতি কেমন তা আপনারা আগেই জেনে এসেছেন 'আর কোনো রূপকথা নেই' লেখায়।

আরেকবার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করল বোধহয় সে।

স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটিগুলোতে হান চাইনিয ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের হাতে ব্যাপকমাত্রার র‍্যাগিং এবং বুলিয়িং-এর শিকার হয় উইঘুররা। উইঘুররা শূকর খায় না, 'হালাল' খাবার খায়–এ কারণে হান চাইনিয সহপাঠীদের ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। চার বছরের উইঘুর পিচ্চি যুমরেতের একদিনের স্কুলের অভিজ্ঞতা শোনা যাক। পিচ্চি এই মেয়েটাকে ওর বাবা-মা হান চাইনিযদের স্কুলে পাঠিয়েছিল প্রতিষ্ঠিত করার আশায়। একদিন পিচ্চিটা দুগাল ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরল। 'কেন কাঁদছ আম্মু, কী হয়েছে তোমার?' প্রশ্নের জবাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে জানাল, 'ক্লাসের ওরা তাকে কোনো খেলায় নেয় না, সবাই মিলে ওকে ঘিরে ধরে একটা বৃত্ত তৈরি করে, বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে যুমরেতকে। তারপর সবাই ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ওকে টিটকারি মারে, ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ করে। একজন চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, আমার বাবা বলেছে উইঘুর বাচ্চাদের সাথে না খেলতে। কারণ ওদের সবার স্কারলেট ফিভার[২০৩] আছে। ওরা যখন বড় হয় তখন ওরা লিউকেমিয়ায়[২০৪] আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। তোমরা যদি ওদের সাথে খেলো, তাহলে তোমাদেরও অসুখ হবে।'

সমাজের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই হান চাইনিযদের হাতে নির্যাতিত হয় উইঘুররা। নিজভূমেই ওরা প্রবাসী হয়ে গেছে। হান চাইনিযরা উইঘুরদের সাথে মেশে না, উইঘুরদের ঘর ভাড়া দিতে চায় না, উইঘুর ছেলেদের সাথে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেয় না। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি-পড়ুয়া উচ্চশিক্ষিত হান চাইনিয সবার কাছেই উইঘুর মুসলিমরা হলো নির্বোধ। বেশ কয়েকজন সাংবাদিক যারা চীনে গেছেন, থেকেছেন, হান চাইনিযদের সাথে মিশেছেন তারা অবাক হয়ে গিয়েছেন হান চাইনিযদের উইঘুর মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ দেখে।'[২০৫]

ডেস্কের পেপার ওয়েটটা আনমনে নাড়াচড়া করতে করতে আবার কথা শুরু করল মাহমুত,

---

[২০৩] একধরনের জ্বর যার কারণে পুরো শরীরে ফুসকুড়ি ওঠে।

[২০৪] রক্তস্বল্পতা।

[২০৫] Her Uighur Parents Were Model Chinese Citizens. It Didn't Matter. Sarah A Topol. The New York Times Magazine, January 29th, 2020. https://tinyurl.com/rqs53lx

Where Does Chinese Islamophobia Come From? Eliot Evans. Sup China, June 16th, 2017. https://tinyurl.com/u8op3oc

'১৯৮৭ সালে ডালিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলোজিতে পেট্রোকেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেলাম আমি। এটা যংদিয়ান (zhongdian xuexiao) অঞ্চলের একমাত্র প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় যেটা সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ দেয়। তাই বলে ভাববেন না কোনো কোটায় আমি চান্স পেয়েছিলাম। বরং নিজের যোগ্যতায় ১৭ বছর বয়সে সুযোগ পেয়েছি পেট্রোকেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। এর আগে নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যাইনি আমি। বাইরের দুনিয়া দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেলাম।

ডালিয়ানে পৌঁছে নিজেকে আবিষ্কার করলাম 'শিনজিয়াং ক্লাসে'। এটি সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ক্লাস। কোনো 'পচা' গ্রেড পাওয়া হান চাইনিযের কখনোও এই ক্লাস করা লাগে না।

একেবারে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো খুব কঠিন ছিল। ওরা ভাবত আমরা উইঘুররা শুধু গান গাইতে, নাচতে আর কনসার্টে মঞ্চ কাঁপাতে পারি। উইঘুর মেয়েদের শরীরকে ওরা 'আইটেম' বানিয়ে ফেলেছিল। ওদের কথা না শুনলেই মুখের ওপর বলে দেওয়া হতো এই মেয়ের মধ্যে 'উগ্রবাদী' চিন্তাভাবনা বিদ্যমান।

পড়াশোনা শেষ করে ১৯৯২ সালে ফিরে গেলাম পূর্ব তুর্কিস্তানে। দেশের সেরা একটা ভার্সিটি থেকে চমৎকার রেসাল্ট করে বেরিয়েছি। চমৎকার ম্যান্ডারিন চাইনিয বলতে পারি। মনে খুব আশা ছিল ভালো একটা চাকরি পাব। আশা নিরাশায় পরিণত হতে সময় লাগল না। ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়া দূরে থাক, উরুমচির কোনো পেট্রোকেমিকেল প্ল্যান্টেও চাকরি পেলাম না। অথচ এই বিষয়ে আমার এক্সপারটিস আছে। নিরুপায় হয়ে উরুমচি ছেড়ে যেতে হলো মায়ট্যাগ (Maytag) নামের ছোট্ট একটা শহরে। ওখানে কষ্ট করে চাকরি পেলাম। মূল চীন থেকে হান চাইনিয স্টুডেন্টদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে নিয়ে এসে চাকরি দেয় সরকার; অথচ হাজার হাজার যোগ্যতাসম্পন্ন উইঘুর যুবক-যুবতি বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে!' পেপার ওয়েটটা শক্ত করে হাতের মুঠিতে চেপে ধরল মাহমুত। ভেতরের ক্ষোভ, হতাশা বেরিয়ে এল চোখেমুখে।

বেশির ভাগ উইঘুরদেরই জীবিকা নির্বাহ করতে হয় কৃষিকাজ বা পশুপালন করে। ম্যানুফ্যাকচারিং, টেকনিক্যাল সেক্টরগুলোতে হান চাইনিযদের জয়জয়কার। স্কুলশিক্ষক, হাসপাতাল বা এনার্জি কোম্পানির মতো অনেক জায়গাতে চাকরির বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়—কেবল 'হান' চাইনিযরাই আবেদন করতে পারবে।

ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার কথা শুরু করল মাহমুত, 'পূর্ব তুর্কিস্তানের বেকার মানুষদের শতকরা ৮০ ভাগ হলো উইঘুর। বছরের পর বছর ধরে চলা অসমতা, চাকরিতে বৈষ্যম্য এর সবকিছুই উইঘুরদের বুকে আগুন জ্বালিয়েছে। নিপীড়িত, প্রবঞ্চিত, শোষিত, নিষ্পেষিত উইঘুররা স্বাধীনতার কথা বলেছে; অধিকার চেয়েছে। রাস্তায় নামতে চেয়েছে, দ্বন্দ্ব বেধেছে হান চাইনিযদের সাথে। ২০০৯ সালের উরুমচির ঘটনার পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে এই ভয়ংকর বৈষম্যই। হান চাইনিযরা আমাদের ভূমিতে এল। আমরা একসাথে মিলেমিশে পাশাপাশি বসবাস করতে পারতাম। আমাদের পূর্ব তুর্কিস্তান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। কিন্তু সেটা হয়নি। হান চাইনিযরা শুধুই আমাদের শুষে খেয়েছে। আমাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে আরও গরিব বানিয়েছে আমাদের।

১৯৯৬ সালের দিকে এসে ম্যানেজমেন্টের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে মায়ট্যাগের পেট্রোকেমিকেল প্ল্যান্টের চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম ।

সে বছরেরই অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের এপ্রিলেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ১০০ দিনব্যাপী এক রাজনৈতিক অভিযান শুরু করে 'বিপ্লব বিরোধী জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের বিরুদ্ধে। আসলে যেসব উইঘুর সমতার কথা বলে, নাগরিক অধিকারের কথা বলে তাদেরই হান চাইনিযরা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলত, তাদের শায়েস্তা করাই ছিল এই ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য। অগণিত উইঘুরদের হত্যা করা হয়, গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার উইঘুরদের।

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী। কাজ থেকে ব্রেক নিয়ে গেলাম ঘুলঝাতে। আমার নিজের শহরে। সঙ্গে নিলাম আমার দেড় বছরের ছেলেকে। বাড়িতে ঢোকার পর প্রথম যে কথাটা শুনলাম সেটা হলো আমার ননদের স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ঘুলঝার আশেপাশের গ্রাম, শহরে এক মাস ধরে তরুণ আলিমদের পেছনে লেগেছে পুলিশ। কুরআন পড়ার সংবাদ পেলেই পুলিশ হানা দিচ্ছে বাড়িতে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে। প্রভাবশালী যুবকরা পরিণত হলো পুলিশের টার্গেটে–ওরা নাকি নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। ঐতিহ্যবাহী মেশরিপ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার ননদের স্বামী আলিম ছিল না, তাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল পুলিশ–ও নাকি মেশরিপ আয়োজন করে সহিংসতা উসকে দিতে চাচ্ছে। কোনো ধরনের বিচারিক প্রক্রিয়া ছাড়াই ১২ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলো ওকে।

আচ্ছা মেশরিপ কী সেটাই তো বলা হলো না। উইঘুরদের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মেশরিপ। কবিতা, গান-বাজনা, নাচ, কৌতুক, রান্নাবান্না ইত্যাদির মাধ্যমে তরুণ উইঘুরদের ভালো একজন উইঘুর এবং সুনাগরিক হওয়া শেখানোর অনুষ্ঠান।

গ্রামাঞ্চলে এটি খুবই জনপ্রিয়। শীতকালে যখন পুরুষেরা মাঠে কাজ করতে পারে না তখন মেশরিপ আয়োজনের ধুম পড়ে যায়। নব্বইয়ের দশকে অন্যমাত্রার জনপ্রিয়তা পায় মেশরিপ। ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রায় দশ হাজার উইঘুর তরুণ মেশরিপে অংশগ্রহণ করে ফেলেছিল। উইঘুরদের এই বিনোদন অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সহ্য হলো না। ওরা বলল মেশরিপ নাকি নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নাকি দল পাকাচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এই অজুহাতে প্রশাসন তড়িঘড়ি করে সব ধরনের মেশরিপ নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু মেশরিপ মিশে আছে উইঘুরদের রক্তে, এত সহজেই কী ছাড়া যায়! গোপনে মেশরিপের আয়োজন করত ওরা। ফলও পেত হাতেনাতে। ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রেফতার হতো পুলিশের হাতে। কেউ কেউ ছাড়া পেত, অনেকেই পেত না। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারীতে ঘুলঝার টাউন স্কয়ারে জড়ো হয় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে হারিয়ে যাওয়া ছেলেদের বাবারা। জানতে চায় তাদের সন্তানদের ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে। ওদেরকেও ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

৯৭ এরই ফেব্রুয়ারীতে ছড়িয়ে পড়ে ত্রিশ জন উইঘুর পুরুষকে হত্যা করার খবর। ঘুলঝার রাস্তায় নেমে আসে ক্ষুব্ধ উইঘুররা। বিক্ষুব্ধ জনতা দাবি করে মেশরিপের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিতে হবে, কারাগার থেকে মুক্তি দিতে হবে উইঘুর তরুণদের। দুই দিন ধরে চলে বিক্ষোভ। ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চীনা সৈনিকেরা ঘিরে ফেলে বিক্ষোভকারীদের। পাইকারি হারে খুন করতে থাকে। এক শ'র ওপরে বিক্ষোভকারীকে স্রেফ ঠান্ডা মাথায় গুলি করে খুন করা হয়। প্রায় ১৬০০ উইঘুর গ্রেফতার হয় চীনাদের হাতে। পরের সপ্তাহে কারফিউ জারি করা হয় ঘুলঝা এবং উরুমচিতে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। কোনো অভিযোগ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয় আরও ৫ হাজারের ওপর উইঘুর তরুণদের। চীনারা এত বেশি উইঘুর তরুণদের গ্রেফতার করেছিল যে, জেলে জায়গা দিতে পারছিল না। অস্থায়ী জেলখানা তৈরি করা হয় তাদের জন্য। ওই সময়টা ছিল চীনা নববর্ষের সময়। সাধারণত এই সময় ভয়ংকর শীত পড়ে। এ রকম চরম শীতের মধ্যে ৬ দিন রাখা হয় বন্দীদের। তীব্র শীতে জমে মারা যায় ৫০ জনেরও বেশি বন্দী।

অত্যাচার, দমন, নিপীড়ন চলতেই থাকে। ওই বছরেরই এপ্রিলে বাড়িঘর ছারখার করে ২০০ উইঘুরকে গ্রেফতার করে পুলিশ ঘুলঝাতে। প্রশাসন একটা র‍্যালি বের করে। শহরের স্টেডিয়ামে হাজার হাজার কৌতূহলী, ব্যথিত, ভীত জনতা উপস্থিত হয়। কোনো ধরনের বিচার ছাড়াই হাজার হাজার উইঘুর, কাযাখ ও হানের সামনে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারা হয় উইঘুর বন্দীদের।

ঠান্ডা মাথার এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে মে মাসের ২ তারিখে ৪০০ উইঘুর তরুণ টাউন হলের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। খবর পাওয়ামাত্র হাজির হয়ে যায় আর্মি আর পুলিশ। শুরু হয় ওপেন ফায়ার। তৎক্ষণাৎ মারা যায় ৩১ জন। বাকিদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ওরা। পরের সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয় আরও ১০০০ জন উইঘুরকে—তাদের নিজেদের বাড়ি থেকে।

জুনের ২ তারিখে আবার রাস্তায় নামে উইঘুররা। প্রায় ৪,০০০ জন। পুলিশ এবং আর্মির সম্মিলিত বাহিনীর হাতে তাদের ভাইদের হত্যা এবং গ্রেফতারের প্রতিবাদে। একজনকেও ছাড় দেয় না প্রশাসন। গ্রেফতার করা হয় সবাইকেই। মে মাসে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের সবাইকে পাঠানো হয় ঘুলঝাসহ অন্য আরও পাঁচটি অঞ্চলের বধ্যভূমিতে। গুলি করে হত্যা করা হয় ওদের সবাইকেই। কোনো ধরনের আইন-আদালতের ধার ধারেনি হান চাইনিয প্রশাসন। সবমিলিয়ে কেবল ৯৭ এর মে থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে ১৩৩টা মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়।

আসলে হান চাইনিয সরকার উইঘুরদের উসকে দিত রাস্তায় নামার জন্য, যেন তাদের ওপর চালানো অত্যাচারের অজুহাত বের করা যায়। ঘুলঝাতে ওরা এত ভয়ংকর মাত্রার অত্যাচার চালাত যে, আমাদের রাস্তায় না নেমে কোনো উপায় ছিল না। সরকার এটাই চাইত। আমরা রাস্তায় নামলে আগের চাইতেও আরও নির্দয়ভাবে হামলে পড়ত আমাদের ওপর।

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক জুড়ে উইঘুরদের ওপর অত্যাচার, সংস্কৃতি-ভাষার ওপর আক্রমণ চলতেই থাকল।

৯/১১ এর পর সরকার উইঘুরদের বলা শুরু করল জঙ্গি, সন্ত্রাসী। ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’র নামে গ্রেফতার আর বিনা বিচারে হত্যার ধুম পড়ে গেল। ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্ষিপ্ত এক সংবাদ সম্মেলনে জানাল, ‘আমাদের কাছে তথ্য আছে কিছু উইঘুর বিচ্ছিন্নতাবাদী আফগানিস্তান থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে চীনে এসেছে। ইষ্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট[২০৬] এর নেতৃত্ব দেয় আসলে ওসামা বিন লাদেন।’

চীনা সরকার জনগণকে ব্যাপকহারে এই মিথ্যে গেলাতে থাকে। উইঘুর মুসলিমদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেফতার চলতেই থাকে।

---

[২০৬] একটি সশস্ত্র উইঘুর সংগঠন যারা পূর্ব তুর্কিস্তানকে চীনা আগ্রাসনের কবল থেকে মুক্ত করতে চায়।

এভাবে একটার পর একটা রক্তস্নাত, অশ্রুমেশানো বছর শেষ হয়ে এল ২০০৯ সাল। উইঘুরদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া এক বছর।

ইন্টারনেটে অজ্ঞাত এক আইডি থেকে দেয়া পোস্টে দাবি করা হল শাওগুয়ান শহরে দুইজন হান নারীকে গণধর্ষণ করেছে ৬ জন উইঘুর। পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে এল পুরো ব্যাপারটাই ভুয়া; কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার হয়ে গিয়েছে। ওই শহরের এক ফ্যাক্টরিতে দুইজন উইঘুর শ্রমিককে শত শত বিক্ষুব্ধ হান চাইনিয পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে ফেলে। হান চাইনিযদের হাতে আহত হয় আরও ১২০ জনের মতো উইঘুর।

গণপিটুনির এক ফুটেজ ভাইরাল হয় ইন্টারনেটে। ফুটেজটা দেখাচ্ছে মাটিতে পড়ে রয়েছে উইঘুর শ্রমিক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এরই মাঝে হান চাইনিযরা নির্মমভাবে পেটাচ্ছে ওদের।[২০৭]

উরুমচির উইঘুর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষেপে গেল। প্রশাসনকে বারবার অনুরোধ করল কিছু করার; কিন্তু হান চাইনিয প্রশাসন ওদের অনুরোধ এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিলো। সহানুভূতি জানিয়ে অন্তত একটা শোকবার্তা দিতে পারত সরকার, সেটাও দিলো না। রাস্তায় নামা ছাড়া কোনো উপায় রইল না উইঘুরদের।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে এভাবে বছরের পর বছর সরকারের হাতে শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত হবার ফলে যে ক্রোধ জমেছিল উইঘুরদের বুকে, বিস্ফোরণ ঘটল তার। রাস্তায় নামল উইঘুররা। দলে দলে। সরকার এটাই চাচ্ছিল। রাস্তায় নামার জন্য চড়া মূল্য দিতে হলো ওদের। সব শক্তি এক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ। দফায় দফায় সংঘর্ষ হলো হান চাইনিয এবং পুলিশদের সাথে উইঘুরদের। মারা গেল ১৯৭ জন। পনেরো শয়েরও বেশি উইঘুরকে গ্রেফতার করা হলো। অধিকাংশ বন্দীকেই কোনো বিচার করা ছাড়াই মেরে ফেলা হয়।'

চোখের পানি আটকানোর শত চেষ্টা হার মানল হৃদয়ের দহনের কাছে। মাহমুতের দুচোখ বেয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল পানি। ঘরের মধ্যে নেমে এল ভীষণ নীরবতা।

ফিনানশিয়াল টাইমস পত্রিকা দাবি করে, ২০০৯ এর জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৪,০০০ উইঘুরকে গ্রেফতার করা হয়। আসল ঘটনা ধামাচাপা দেবার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় সরকার। ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক সব বন্ধ করে দেয়।। ২০১০ সালের মে মাসে এসে ইন্টারনেট আবার চালু হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো

---

[২০৭] Her Uighur Parents Were Model Chinese Citizens. It Didn't Matter. Sarah A Topol. The New York Times Magazine, January 29th, 2020. https://tinyurl.com/rqs53lx

অনেক মানবাধিকার সংস্থা চীন সরকারকে বারবার অনুরোধ করে গণহত্যার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে। রাজি হয় না চীন সরকার।[২০৮]

চোখের পানি মুছে কথা শুরু করল মাহমুত,

'এই নরক থেকে পালাতে চাইতাম। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যের ল্যাংকাশার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ পেলাম। আবেদন করার ছয় মাস পর পেলাম পাসপোর্ট। ২০০০ সালে ছেলেকে সাথে নিয়ে বের হতে পারলাম চীন থেকে। কাগজে-কলমে চীনারা পূর্ব তুর্কিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে; কিন্তু উইঘুরদের আসলে কোনো ক্ষমতাই নেই। একবার আমার এক বন্ধু একটা কথা বলেছিল। জীবনে কখনো বোধহয় ভুলতে পারব না সে কথা। বুকের একেবারে ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলেছিল, 'ইংল্যান্ড বা অ্যামেরিকার মতো এত দূরের দেশে আমি যেতে পারব না হয়তো, কিন্তু আমি যদি বর্ডারে গিয়ে মিনজানিকের[২০৯] মাধ্যমে আমার ছেলেকে ছুড়ে উযবেকিস্থানে পাঠাতে পারতাম তাহলে তা-ই করতাম!'

পাঠক দেখুন, এভাবে বছরের পর বছর জুড়ে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হান চাইনিযদের হাতে বৈষম্যের শিকার হয়েছে উইঘুররা। উইঘুরদের রক্ত পানি করে অর্জিত সম্পদ লুটপাট করে নিয়েছে হান চাইনিযরা। উইঘুররা দেখেছে, পঙ্গপালের মতো হান চাইনিযরা ওদের ভূমিতে এসেছে। একে একে দখল করে নিয়েছে সব চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য। উইঘুররা দেখেছে, ওদের ধর্ম ইসলামের ওপর বারবার আঘাত হেনেছে হান চাইনিযরা। কুরআন পুড়িয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করেছে, ধর্ম নিষিদ্ধ করেছে, আলিমদের গুম করেছে, হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষদের ধরে নিয়ে শ্রমদাসত্বে বাধ্য করেছে, গুম করেছে তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করেছে। মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে বারবার। উইঘুররা যখনই হান চাইনিযদের যুলুমের মৃদু প্রতিবাদ করেছে, তখনই বন্দুকের নল তাক করা হয়েছে ওদের দিকে, ভারী বুটজুতায় পিষে ফেলা হয়েছে গুনে গুনে সবাইকেই। যারাই ন্যায্য অধিকারের

[২০৮] Press Release: Campaign for Uyghurs commemorates the 10th anniversary of the Urumqi massacre. Campaign For Uighurs, July 4th, 2019. https://tinyurl.com/r5hlkr9

A Truth Facing the Tanks. Mamtimin Ala. The Uyghur American Association, September 7th, 2012. https://tinyurl.com/syodrna

[২০৯] মধ্যযুগের যুদ্ধগুলোতে ব্যবহৃত গুলতির মতো এক প্রকারের অস্ত্র। এর মাধ্যমে বড় পাথর ইত্যাদি ছুড়ে মারা হতো শত্রু বাহিনীর ওপর।

কথা বলেছে তাদেরকেই উপাধি দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, জঙ্গি, সন্ত্রাসী। কোনো বিচার ছাড়াই গুলি করে মারা হয়েছে ওদের। কেউ এগিয়ে আসেনি এই আগ্রাসন থামাতে। পুরো পৃথিবীর কেউ না।

এতকিছুর পরে আর কোনো উপায় না পেয়ে কিছু উইঘুর যুবক যখন যা আছে তাই নিয়ে পাল্টা আঘাত করতে বাধ্য হয়, তখন সেটাকে কি অপরাধ বলা যায়? সন্ত্রাস বলা যায়? জঙ্গিবাদ বলা যায়?

আগ্রাসীর আক্রমণের মোকাবেলায় আক্রান্তের প্রতিক্রিয়া কি সন্ত্রাস? দখলদার ইস্রাইলের বিমান আর ট্যাংকের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি বালকের হাতের গুলতি আর পাথর কি সন্ত্রাস? কাউকে যখন জবাই করা হয় তখন তার হাত-পা ছুড়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা, বেপরোয়া ছটফট করা কি সন্ত্রাস?

আচ্ছা ধরে নিলাম এটা সন্ত্রাস, কিন্তু এই কয়েকজন মানুষ মারার অপরাধের প্রতিশোধ নেবার জন্য চীনারা যা করেছে, আর এর আগে কয়েক দশক ধরে যা করে এসেছে তা কি কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব?

উইঘুররা শান্তি চেয়েছে, হানদের পাশাপাশি বসবাস করতে চেয়েছে; কিন্তু হানরা ওদেরকে সব সময় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভেবেছে। যতভাবে যতটা সময় ধরে পারে রক্তচোষা জোঁকের মতো চুষে চুষে খেয়েছে। শান্তির সব কয়টা পথ বন্ধ করে দিয়েছে উইঘুরদের অশ্রু, রক্ত আর লাশে।

উইঘুরদের ওপর এমন কঠোর ব্যবহারের কারণ হিসেবে বারবার উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদকে সামনে টেনে এনে চীন সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এড়িয়ে গিয়েছে। সেই পুরোনো কালপ্রিট–অর্থনীতি।

সামরিক এবং অর্থনৈতিক খাতে অ্যামেরিকাকে টেক্কা দেয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য সামনে নিয়ে চীন সরকার শুরু করেছে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ–Belt and Road Initiative (BRI)।

এই বেল্ট রোড বা নিউ সিল্ক রোডের মাধ্যমে ইউরোপ-এশিয়ার অনেক দেশের সাথে সরাসরি, নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হবে চীনের। ৬০টা দেশের ভেতর দিয়ে এই বেল্ট রোড তৈরির কাজে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে চীন। সড়ক, গ্যাসের পাইপ, অপটিকাল ফাইবার সবকিছু থাকছে এই বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভের মধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে তুমুল গতি পাবে এই রোডের কারণে। সেই সাথে বিশ্বদরবারে বাড়বে চীনের প্রভাব।[২১০]

[২১০] China's Massive Belt and Road Initiative. Andrew Chatzky & James

চীন থেকে বের হওয়া এই বেল্ট রোডের অধিকাংশ করিডোর গেছে পূর্ব তুর্কিস্তান দিয়ে। চীনারা চাইছে এই এলাকা নিরাপদ রাখতে। তাই 'বেয়াড়া' উইঘুরদের সন্ত্রাসী, জঙ্গি বানিয়ে, ওদের শায়েস্তা করার অজুহাতে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলেছে পুরো পূর্ব তুর্কিস্তান। একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইছে উইঘুরদের।[২১১]

বহুক্ষণ নীরব থেকে, শান্ত ঠান্ডা গলায় মাহমুত স্বগতোক্তির মতো করে বলছিল,

'উইঘুররা সব সময় একেবারেই মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নেমেছে। ১৯৯৭ সালে ঘুলঝাতে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে গ্রেফতার হওয়া অনেকের পরনেই ছিল কাফনের কাপড়। মরার প্রস্তুতি নিয়েই মিছিলে এসেছিল তারা।

আমাকে বলুন, কখন একজন মানুষ কাফনের কাপড় পরে রাস্তায় নামে?

যখন জীবনের সবকিছু হারিয়ে তার হারানোর কিছুই থাকে না, তখনই তো, তাই না?

উইঘুররা ঠিক একই অবস্থায় রাস্তায় নেমেছে বারবার; কিন্তু প্রত্যেকবারই চীন সরকার কথা বলেছে বন্দুকের ভাষায়, জঙ্গলের আইনে।'

চোখে একটা দীপ্তি খেলে গেল মাহমুত করিমের। একটু হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল,

'এত সুন্দর একটা জায়গা আল্লাহ ধ্বংস হতে দেবেন না। একদিন অবশ্যই সবাই উঠে দাঁড়াবে। সুদিন আসবেই।'

ইন শা আল্লাহ আমরাও মাহমুতের মতো দৃঢ়ভাবে, খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সুদিন আসবেই।

McBride. Council On Foreign Relations, January 28th, 2020. https://tinyurl.com/yy59trvb

[২১১] China's secret internment camps. Vox. May 7th, 2019. https://tinyurl.com/y5bpg7mr

সবাই দায়ী
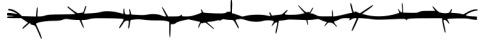
আজকালকার অন্য অনেক কিছুর মতোই ঘটনাটার শুরুটা অনলাইনে। বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় চলছে নগরায়ন প্রকল্প। পুরোনো বিল্ডিংগুলোর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়াচ্ছে নতুনগুলো। নানগাং মসজিদের স্থান পরিবর্তনের করার দরকার দেখা দিলো। নতুন জায়গা ঠিক করে দিলো নগর কর্তৃপক্ষই। বিশাল এক অত্যাধুনিক কন্ডোমিনিয়ামের পাশে। কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হলো না কন্ডোমিনিয়ামের মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের। চীনের সোশ্যাল মিডিয়াতে শুরু হলো ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার ঝড়। প্রতিবাদকারীদের অধিকাংশই হান চাইনিয।

একজন বুদ্ধি দিয়ে বসলো,

‘নগর কর্তৃপক্ষের কাছে মসজিদ তৈরি বন্ধের দাবি জানানো উচিত। কাজ না হলে–শুয়োরের মাথা, শুয়োরের রক্ত!’

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল চারটা শব্দ–‘শুয়োরের মাথা, শুয়োরের রক্ত!’ ডিসেম্বর নাগাদ আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল মুসল্লিদের মাঝে। ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে শুরু করলেন অনেকে।

ওরা বলছে মসজিদের সামনে শুয়োরের মাথা ঝুলিয়ে দেবে।

- তাহলে আমরা সরিয়ে দেবো।

ওরা বলছে মাটিতে শূকরের মাথা পুঁতে রাখবে।

- আমরা সেটা মাটি খুঁড়ে তুলে নেব!

২০১৭ এর পহেলা জানুয়ারী ওরা ঠিক তা-ই করল। নানগাং মসজিদের বাইরে ঝুলিয়ে দেয়া হলো শুয়োরের কাটা মাথা, ছিটানো হলো রক্ত। মসজিদের সামনের মাটিতে পুঁতেও রাখা হলো কিছু। ইমাম সাহেবকে টেক্সট মেসেজ দিয়ে হুমকি দিলো একজন, 'তোমার পরিবারের কেউ যদি মারা যায়, তাহলে আমি তোমাকে একটা কফিন দিতে পারব। চিন্তার কিছু নেই। যদি একাধিক কফিন লাগে, তাহলে তা-ও দিতে পারব।'

ইমাম সাহেব নিজ হাতে মাটি খুঁড়ে মাথাগুলো বের করেছিলেন কি না জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা ব্যক্ত করার পর সাংবাদিকদের মাধ্যমে শুয়োরের রক্তওয়ালা মানুষগুলো কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমি চাই তারা জানুক, মুসলিমরা ভালো মানুষ, ভালো নাগরিক। আমরা শান্তিপ্রিয়, সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক। আমরা ভালো চাইনিয।' কথাগুলো বলার সময় ইমাম সাহেবের পেছনের দেয়ালে ঝুলছিল চাইনিয ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের সাথে তার হাস্যোজ্জ্বল ছবি।

নানগাং মসজিদের এই ইমাম সাহেবের মতো অনেকেই ইসলামকে কাস্টোমাইজ করে, কাটছাঁট করে নিয়ে গান্ধীবাদী 'ইসলাম' প্রচার করে। কাফির, নাস্তিক, মুশরিকদের মন পাওয়ার জন্য, 'মাই নেম ইজ খান অ্যান্ড আই এম নট এ টেরোরিস্ট' টাইপ স্লোগানে অফলাইন অনলাইনের দুনিয়া ছেয়ে ফেলে। ছাড় দিতে দিতে আল্লাহর কাছে মনোনীত একমাত্র এবং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে নামায-রোযার মতো কয়েকটি বিষয়ে। ইসলামকে পরিণত করে আচারসর্বস্ব ধর্মে। ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা—এতে না কোনো কিছু যোগ করার আছে আর না কোনো কিছু বাদ দেয়ার আছে। কাফির-মুশরিকদের কাছে ইসলামকে মানবিক, শান্তির ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য একে কাস্টোমাইজ করার কোনো অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পর্যন্ত নয়। আল্লাহ যেভাবে ইসলাম পাঠিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই প্রচার করতে হবে ইসলাম। কিছু বিষয় লুকিয়ে রেখে বা হিকমাহর নামে একটু 'অন্যভাবে' ব্যাখ্যা করে কাফির-মুশরিকদের দ্বীনের দাওয়াত দেয়া আসলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দ্বীন বিকৃত করাই। আর এভাবে কস্মিনকালেও কাফির মুশরিকদের সন্তুষ্ট বা খুশি করা যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন :

"ইহুদী-খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ করবে।" (তরজমা, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২০)

সন্তুষ্ট করা যায়নি হান চাইনিযদেরও। ঠিকই তারা মসজিদ ভেঙেছে একটার পর একটা। ঠিকই তারা বিষাক্ত দাঁতের কামড় বসিয়েছে মুসলিমদের শাহরগে।

ফিরিঙ্গি শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপারে আমাদের খুব কমন একটা ভুল ধারণা হলো, ওদের সরকার আর মিডিয়া খারাপ। কিন্তু সাধারণ তথাকথিত বেসামরিক মানুষজন একেবারে দেবদূত, মায়ের পেট থেকে সদ্য টুপ করে পরা এক একটা নিষ্পাপ শিশু। কিন্তু আসলেই কি তা-ই? বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এই বইয়ে নেই। ইলমহাউস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত চিন্তাপরাধ [২১২] বইটির শ্বেতসন্ত্রাস আর্টিকেলটি পড়ার অনুরোধ রইল।

চীনের ব্যাপারেও আমরা অনেকেই এই ধারণা করে রাখি। ভাবি যে শুধু নাস্তিক কমিউনিস্ট চীনা সরকার উইঘুর-কাযাখদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ চীনারা খায়দায়, ফুর্তি করে, ঘুমায়, প্রজনন করে। বিষয়টা এমন না। অপরিসীম আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে সাধারণ হান চীনারাও নেমেছে মুসলিমদের শেকড় উপড়ে ফেলার এই একতরফা যুদ্ধে। এর অনেক প্রমাণ এরই মধ্যে পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে আপনারা পড়ে এসেছেন।

হান চীনাদের হাতে উইঘুর, কাযাখ বা হুই মুসলিমরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়—উন্নাসিক মানসিকতার চীনারা মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে রেখেছে বহুযুগ আগে থেকেই। আমরা আগেই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

চীন সরকার রেডিও, টেলিভিশন বা পত্রপত্রিকা ব্যাপকমাত্রার সেন্সর করে। তাই বছরের পর বছর জুড়ে হান চীনাদের মনে মুসলিমদের প্রতি পুষে রাখা বিদ্বেষ, ঘৃণার কথা মিডিয়াতে তেমন একটা আসেনি। অফলাইনেই থেকে গেছে।

কিন্তু ইন্টারনেট আর সোশ্যাল সাইটগুলোর উত্থান মুসলিমবিদ্বেষী হান চীনাদের হাতে তুলে দেয় আলাদীনের জাদুর চেরাগ। মনের মধ্যে পুষে রাখা সবটুকু ঘৃণা তারা উগড়ে দেয় সোশ্যাল সাইটে।

আমরা আগেই দেখেছি উইঘুরদের ভাষা আর হান চীনাদের ভাষা এক নয়। উইঘুররা আরবি হরফে তাদের ভাষাকে লিখিত রূপ দেয়। হান চাইনিযদের মতো উইঘুররাও শুরু করে ইন্টারনেট ব্যবহার। হান চাইনিযরা দেখল ইন্টারনেট ভরে গিয়েছে আরবি হরফে। উইঘুররা ইসলামী আলিমদের লেকচার শেয়ার করছে, নামায-রোযা-হাজ্জ নিয়ে কথা বলছে, দৈনন্দিন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েলের খোঁজ করছে।[২১৩] ব্যস! শোরগোল শুরু হয়ে গেল। 'দেশটা এবার আফগানিস্তান-পাকিস্তান হয়ে যাবে। চীনে তালিবান শাসন শুরু হবে। তাদের দেশ ভরে যাবে জঙ্গিতে!'

---

[২১২] চিন্তাপরাধ, আসিফ আদনান, ইলমহাউস পাবলিকেশন

[২১৩] ইন্টারনেট সহজলভ্য হবার পরে আমাদের দেশেও একই ব্যাপার ঘটছে।

অথচ পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলিমরা আগন্তুক না। শত শত বছর ধরে মুসলিমরা সেখানে বসবাস করছে। বরং হান চীনারাই এই দুদিন হলো সেখানে আবাস গড়েছে।

মুসলিমদের নিয়ে বানানো নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্বে ভরে গেল হান চীনাদের সোশ্যাল মিডিয়া—'উইঘুররা সবাই একটা একটা সন্ত্রাসী, এরা বর্বর, অসভ্য। ইসলাম চীনকে ১৪০০ বছর পেছনে নিয়ে যেতে চায়।'

অনলাইন অফলাইনে ছড়ানো হলো, 'রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। কারণ মুসলিমদের প্রত্যেকের জন্য কোটা ঠিক করা আছে—প্রত্যেক বছর অন্তত ৩ জন হান চীনাকে পরপারে পাঠাতে হবে।'

হালাল রেস্টুরেন্ট নিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বানানো হলো। বলা হলো জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হালাল রেস্টুরেন্টগুলো আসলে মুসলিমদের শক্তিশালী ঘাঁটি। এর মাধ্যমে তারা দিনদিন তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।

ঝড়ের গতিতে লাইক-কমেন্ট-শেয়ার হলো। ব্যাপকমাত্রার ঘৃণার চাষাবাদ করা হলো কমেন্ট সেকশনে।

শুধু যে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সাধারণ হান চীনাদের মধ্যেই মুসলিমবিদ্বেষের চাষাবাদ হয় তা না। অনেক অনেক উচ্চশিক্ষিত, লিবারেল হান চীনারাও মুসলিমদের ব্যাপারে ঠিক একই ধারণা পোষণ করে—যেমন করে একজন সাধারণ শ্রমিক টাইপের চাইনিয। উইঘুরদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হবে, কীভাবে পূর্ব তুর্কিস্তানের ধনসম্পদ লুটেপুটে নিতে হবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ক্লাসে সেই সবকও দিয়ে বেড়ান।[২১৪]

উইঘুর সহকর্মীদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য যাচাই করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে হান চীনারা। প্রায়ই রমাদানের দুপুরে হান চীনারা তাদের মুসলিম সহকর্মীদের লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করে। কড়া চোখে নজর রাখা হয়, কে খাবার খাচ্ছে আর কে খাচ্ছে না। এমনকি অনেক সময় উইঘুর মুসলিমদের টয়লেটে সেহেরী খেতে হয়। কারণ, শেষরাতে সেহেরী খাবার জন্য ঘুম থেকে উঠলে লাইট অন করতে হবে। ঘরে আলো দেখে বাইরের হান চাইনিযরা সন্দেহ করবে এই উইঘুররা বোধহয় রোযা রাখার জন্য সেহেরী খাচ্ছে। আর তখন উইঘুরদের সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হবে

[২১৪] DOAM - Documenting Oppression Against Muslims ফেইসবুক পেইজে ১৯ মে ২০২০ সালে প্রকাশিত ভিডিও, Professor Zheng Qiang teaches his students the strategic importance of East Turkestan for #China. He argues that East Turkestan are crucial for the Chinese to be rich in the next 100 years - https://tinyurl.com/yxmro2en

ক্যাম্পে।[২১৫]

ভার্সিটির ছাত্র, মিডিয়ার প্রভাবশালী সাংবাদিক বা ব্যবসায়ী সবার কাছেই মুসলিমরা বর্বর। ইসলাম ধর্ম কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

আসলে নির্দোষ নয় কেউই, প্রত্যেকের হাতেই লেগে আছে রক্ত। প্রত্যেক হান চীনা দায়ী উইঘুরদের কান্নার জন্য![২১৬] অনলাইনে অফলাইনে যে ঘৃণা, যে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেটার ওপরই গড়ে উঠেছে এক একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প।[২১৭]

---

[২১৫] DOAM - Documenting Oppression Against Muslims ফেইসবুক পেইজে ১৮ মে ২০২০ সালে প্রকাশিত ভিডিও, #Uyghur Muslims who secretly fast have to do Suhur in the toilet to avoid being detected by Chinese offcials. #Ramadan #Uyghurs - https://tinyurl.com/y2l8ndyc

[২১৬] Islamophobia in China on the rise fuelled by online hate speech। Gerry Shih. The Independent. April ১০th, ২০১৭. https://tinyurl.com/sbtlyhj

I researched Uighur society in China for 8 years and watched how technology opened new opportunities – then became a trap. Darren Byler. The Conversation, September 18th, 2019. https://tinyurl.com/snah8x8

Where Does Chinese Islamophobia Come From? Eliot Evans. Sup China, June 16th, 2017. https://tinyurl.com/u8op3oc

[২১৭] উইঘুরদের ওপর কিয়ামত কায়েমের আগে যেমন অনলাইনে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে, ঠিক একই ভাবে, একই মডেল ফলো করে ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ববিখ্যাত জেনোসাইড এক্সপার্ট ড. গ্রেগরি স্ট্যানটন বলছেন ভারতজুড়ে গণহত্যার প্রস্তুতি চলছে। ড. স্ট্যানটনের মতে কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালানো হয় পর্যায়ক্রমে, ১০টা ধাপের মাধ্যমে। ভারত এখন গণহত্যার ১০ ধাপের ৬ নম্বর ধাপে অবস্থান করছে। এটা হলো প্রোপাগ্যান্ডার মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক মেরুকরণের ধাপ। ভারতীয় ম্যাস মিডিয়া, আরএসএস আইটি সেল, হাজার হাজার হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ, ফেইসবুক গ্রুপের মাধ্যমে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। তবে আসাম ও কাশ্মীরের মতো কিছু প্রদেশ অবস্থান করছে গণহত্যার ১০ ধাপের ৮ নম্বর ধাপে (নির্যাতন, নিপীড়ন)। ঠিক এর পরের ধাপটাই হলো পাইকারি গণহত্যার ধাপ। Preparation for a genocide under way in India: Dr. Gregory Stanton. Sabrang India, December 14th, 2019. https://tinyurl.com/rzxkqpa

মানবতার ফানুশ

সকাল থেকে চীন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান জিওফ্রি নাইসের মনের অবস্থা খুব খারাপ। অথচ আজ তার মন খারাপ হবার কথা ছিল না। সমীকরণ অনুসারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার কথা তার, বিশাল একটা কাজ শেষ করার তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার কথা তার। প্রায় ১ বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তার টিমের প্রত্যেক সদস্যকে। রাত-দিন এক করে খেটেছেন তিনিও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ৫০ জনেরও বেশি মানুষের অভিজ্ঞতা শুনতে হয়েছে। গাদাগাদা তথ্য-প্রমাণ নিয়ে তার টিমের সামনে হাজির হয়েছে বিশ্বের আনাচে-কানাচে থেকে আসা ইনভেস্টিগেটর, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, লেখক, গবেষক। যাচাই-বাছাই করতে হয়েছে তাদের কাছ থেকে পাওয়া নানান তথ্য। অনেক দীর্ঘ রাতজাগা, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চীন ট্রাইবুনাল নিশ্চিত করেছে আসলেই এক মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। চেয়ারম্যান হিসেবে জিওফ্রি নাইসের কাঁধে পড়েছে একুশ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করার দায়িত্ব! এর আগেও এমন কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন নাইট উপাধি পাওয়া জেনোসাইড বিশেষজ্ঞ নাইস। ব্যারিস্টার হিসেবে কাজ করেছেন ৪৮ বছর, ৩৪ বছর কাজ করেছেন বিচারক হিসেবে। কিন্তু আজ তার মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। মন দিতে পারছেন না কিছুতেই। বারবার মাথার মধ্যে ঘাই মারছে একটাই প্রশ্ন—

এমনও কি হওয়া সম্ভব?

লন্ডন।

জুন ১৭, ২০১৯।

প্রশস্ত হলরুম গিজগিজ করছে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবীতে। একটু এলোমেলোভাবে যে যার সিট খুঁজে নিচ্ছে। চীন ট্রাইবুন্যালের লিগ্যাল কাউন্সেল হামিদ সাবাই মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলেন, 'জিওফ্রি নাইস আসছেন, উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করুন।'

সবাই আসন গ্রহণ করার পর মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন জিওফ্রি। মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল হলরুমের গুঞ্জন। পিনপতন নীরবতার মাঝে জিওফ্রি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে গেলেন একুশ শতকের সবচেয়ে নির্মম, অস্বস্তিকর, চেপে রাখা সত্য...

'দ্যা চায়না ট্রাইবুনাল এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছে যে, চীন সরকার বছরের পর বছর ধরে ফালুন গং, উইঘুর, কাযাখ বন্দীদের থেকে ব্যাপকমাত্রায় জোরপূর্বক অর্গান হারভেস্টিং করাচ্ছে। জীবন্ত বন্দীদের দেহ থেকেই কিডনি, লিভার, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কর্নিয়া, স্কিন কেটে নিয়ে বিক্রি করছে চীন। অসংখ্য লোক কেন নিখোঁজ হচ্ছে, তারা কেন রহস্যময়ভাবে মারা যাচ্ছে তার সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা চীন সরকারের কাছে নেই। যেমন নেই এত কমসংখ্যক দাতা, চিকিৎসা অবকাঠামো থাকার পরেও কীভাবে তারা এত বেশিসংখ্যক অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছে তার জবাব।

হান চাইনিয পুরুষদের সাথে উইঘুরদের জোর করে বিয়ে দেয়া, গুম, খুনসহ বিভিন্ন কারণে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, চীনের বিরুদ্ধে অর্গান হারভেস্টিংয়ের এই অভিযোগে ভয়াবহ বাস্তবতার খুব সামান্য এক অংশ উঠে এসেছে। চীনে যা চলছে তা আধুনিক সময়ে মুসলিমদের ওপর সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক গণহত্যা। আমাদের হাতে আসা তথ্য-প্রমাণ এটাই নিশ্চিত করে, চীনের অর্গান হারভেস্টিং গত শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্য অপরাধগুলোর সমমাত্রার অপরাধ। গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের গণহত্যা, রুয়ান্ডার গণহত্যার মতোই ভয়াবহ এই অপরাধ।

চীন সরকার, চীনের ডাক্তার, চিকিৎসা কর্মী, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান–বিশেষ করে এয়ারলাইন, ট্রাভেল কোম্পানী, ফিনান্সিয়াল এজেন্সি, ইন্স্যুরেন্স, ল ফার্ম, ট্যুরিস্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান–এদের সাথে কথা বলার সময় প্রত্যেকেরই মাথায় রাখতে হবে, তারা একদল অপরাধীর সাথে কথা বলছে।'[২১৮]

---

[২১৮] China Tribunal Final Judgment Film - 2019 (English). End Transplant Abuse. August 27th, 2019. https://tinyurl.com/tm76f4r

ট্রাইবুনাল চীন সরকারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তারা যেন লন্ডনের শুনানিতে প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু চীন সরকার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তারা সেই একই গীত গেয়ে গেছে বারবার—'চীনের বিরুদ্ধে অর্গান হারভেস্টিংয়ের যে অভিযোগ উঠেছে তা সর্বৈব মিথ্যা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত'।

এ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রমাণগুলোর কোনো খণ্ডন হাজির করতে পারেনি চীন সরকার।[২১৯]

অর্গান ডোনারের সংখ্যা এবং অপারেশন সংখ্যার যে বিশাল গড়মিল ছিল তা জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করতে চেয়েছিল সরকার। কিন্তু সেই জোচ্চুরি কঠিন ধরা খেয়ে গেছে গবেষকদের কাছে। অসংখ্য গবেষক জানিয়েছে ব্যাকক্যালকুলেশন করে, অর্থাৎ উত্তর মিলিয়ে উল্টো হিসেব কষে চীন সরকার হিসাব মেলাতে চেয়েছে।[২২০]

এত জঘন্য অপরাধ করার পরেও বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে চীন। চীনের গায়ে ফুলের টোকাটা পর্যন্ত দিচ্ছে না কেউ। খুবই কম প্রেস কাভারেজ পেয়েছে চীন ট্রাইবুনাল। অথচ দেখুন ট্রাইবুনালের সদস্যরা কত বাঘা বাঘা পণ্ডিত ব্যক্তি। চেয়ারম্যান জিওফ্রি নাইস কিউসি ৪৮ বছর ধরে ব্যারিস্টারি করেছেন, বিচারক ছিলেন ৩৪ বছর, পেয়েছেন 'নাইট' উপাধি। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে যুগোস্লোভিয়া ইস্যুতে সারবিয়ান প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের বিচার পরিচালনা করেছিলেন এই জিওফ্রি নাইস। ট্রাইবুনালের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অ্যামেরিকা, ইংল্যান্ড, মালেয়শিয়া, ইরান থেকে আসা নামজাদা প্রফেসর, মানবাধিকার আইনজীবী। কেউ যখন সামনে আসছিল না তখন একুশ শতকে মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য, নিয়মতান্ত্রিক অপরাধের ফিরিস্তি তুলে ধরেছিলেন তারা; কিন্তু বিশ্বের তাবৎ বড় বড় সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে তেমন কোনো মাতামাতিই হয়নি। এই প্রবন্ধ লেখার আগে আমাদের যেমন কোনো ধারণা ছিল না চায়না ট্রাইবুন্যাল নিয়ে, তেমনি আমরা শতভাগ নিশ্চিত আপনাদেরও কেউই বোধহয় নাম শোনেননি চায়না ট্রাইবুনালের![২২১]

---

[২১৯] New Horrors: #China Harvesting Muslim Organs in Concentration Camps. Indo-Pacific News. https://tinyurl.com/u3gqc3k

[২২০] আগ্রহী পাঠকদের জন্য :

চায়না ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইট লিংক- https://chinatribunal.com/

ফাইনাল জাজমেন্ট রিপোর্ট- https://chinatribunal.com/final-judgement-report/

রিডিং ম্যাটেরিয়ালস- https://chinatribunal.com/reading-material/)

[২২১] Bloody Harvest—How Everyone Ignored the Crime of the Century. Aaron Sarin. Quillette, January 3rd, 2020. https://tinyurl.com/te6lshr

অভিমান ভরা গলায় হামিদ সাবাই বলছিলেন, 'যারা চীনকে সব সময় সমর্থন করে আসে—এই ব্যাপারে তারা মুখে তালা দিয়ে আছে। ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন সোসাইটি দেখেও না দেখার ভান করছে।'

স্যার জিওফ্রি নাইস ব্যথিত গলায় জানালেন,

> *'আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর কর্তব্য ছিল হতভাগ্য মানুষগুলোকে রক্ষা করার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অনেকেই চীনের অর্গান হারভেস্টিংয়ের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছে। কারণ এই 'সন্দেহ' তাদের উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ব্যাপারে উদাসীন থাকার লাইসেন্স দিচ্ছে—অর্ডার পাওয়ামাত্রই যাদের জীবন্ত শরীর থেকে অর্গান কেটে নেয়া হয়।'*[২২২]

শুধু অর্গান হারভেস্টিং নয়, আরও কত অসংখ্য উপায়ে উইঘুরদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে চাইনিযরা।

উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনের অত্যাচারের ক্ষেত্রে জেনোসাইড বিশেষজ্ঞরা সবাই বলছে, এটা একুশ শতকের সবচেয়ে নৃশংস, সবচেয়ে ঠান্ডা মাথার বীভৎস হত্যাযজ্ঞ। ইহুদীদের যেভাবে গ্যাস চেম্বারে মেরেছিল হিটলার ঠিক একই রকম বর্বর অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমরা। ইহুদীদের রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিল প্রায় পুরো বিশ্ব। মুসলিম উইঘুরদের জন্য বিশ্ব কী করল?

ইংল্যান্ড ২২টা দেশ সাথে নিয়ে জাতিসংঘে চীন সরকারের সমালোচনা করেছে। ২৬টা দেশের ২৭০ জন অ্যাকাডেমিক যৌথ বিবৃতি দিয়েছে চীনের বিরুদ্ধে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চীনে মহামারি আকারে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। সুপরিকল্পিতভাবে সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে।

অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, সুইডেন ইত্যাদি দেশ অল্পবিস্তর মুখ খুলেছে চীনের বিরুদ্ধে। অ্যামেরিকান কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ 'চায়না বিল' পাস করে বলছে চীন সরকারের সদস্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আহ্বান করে বলছে, 'মি. প্রেসিডেন্ট উইঘুরদের ওপর অত্যাচার চালানোর জন্য আপনি চীন সরকারের নিন্দাজ্ঞাপন করে বক্তব্য দিন'।[২২৩] কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য চীনের

---

[২২২] China Tribunal Final Judgment Film - 2019 (English). End Transplant Abuse. August 27th, 2019. https://tinyurl.com/tm76f4r

[২২৩] China sanctions: US House passes bill over treatment of Uighurs. BBC News, December 4th, 2019. https://tinyurl.com/v29rud6

UK joins 22 other UN nations in condemning China's detention of Uighur Muslims.

ওপর অবরোধ আরোপের প্রস্তাব পাশ করতে দেয়নি ডোনাল্ড ট্রাম্প।[২২৪]

শুনে হয়তো মনে হতে পারে পশ্চিমা বিশ্ব অনেক কিছু করছে। কিন্তু এগুলো আসলে উঁচুমানের কিছু স্টান্টবাজি আর হাতসাফাই ছাড়া আর কিছু না। ২০১৪ সালে অ্যামেরিকা ইরাক ও সিরিয়ার আক্রমণ করেছিল। অজুহাত কি দিয়েছিল জানেন? কয়েক হাজার ইয়েযিদিকে বাঁচানোর জন্য ওরা যুদ্ধ করছে। মানবতার জন্য যুদ্ধ করছে। একইভাবে প্রায় বিশ বছর ধরে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করার পুরোটা সময়জুড়ে অ্যামেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্ব নারী স্বাধীনতা আর অধিকারের মন্ত্র জপে গেছে। 'আফগানিস্তানে আমাদের উপস্থিতি জরুরি, তা না হলে ওখানকার নারীদের স্বাধীনতা আর অধিকার খর্ব হবে।'

গত প্রায় আট দশকে অ্যামেরিকা আর পশ্চিমা বিশ্ব যতগুলো যুদ্ধ করেছে, যতগুলো অভ্যুত্থান কিংবা 'বিপ্লব' সমর্থন করেছে, সবগুলোর অজুহাত হিসেবে আওড়েছে মানবতা, স্বাধীনতা আর অধিকারের বুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীদের ওপর চালানো নাৎসিদের হত্যাযজ্ঞের অজুহাত দিয়ে, ইহুদীদের অধিকারের কথা বলে প্রায় আট দশক ধরে পশ্চিমা বিশ্ব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যায়নবাদী, দখলদার, খুনী, গণহত্যাকারী ইস্রাইলকে। কিন্তু যখন মুসলিমদের ওপর অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ চলছে–তখন পশ্চিমা বিশ্বের মানবতার জযবা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে নিন্দাপ্রস্তাব আর সমালোচনার মধ্যে।

অন্যদিকে বিস্ময়কর মাত্রার উদাসীনতা দেখিয়েছে বিশ্ব মিডিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী গণহত্যার বিরুদ্ধে মিডিয়া অত্যন্ত সরব ভূমিকা পালন করেছে। অসংখ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, ডকুমেন্টারি বানানো হয়েছে। বিশ্বের আনাচে-কানাচে গণহত্যার কথা পৌঁছানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছে। অথচ সেই একই মাত্রার গণহত্যার শিকার হওয়া উইঘুরদের ব্যাপারে মিডিয়ায় আশ্চর্য নীরবতা নেমে এসেছে। যতটুকু দায়িত্ব পালন করা দরকার ছিল মিডিয়ার, উইঘুরদের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর যতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার ছিল–তার একাংশও করেনি মিডিয়া। মুসলিমদের

Zamira Rahim. The Independent, October 20th, 2019. https://tinyurl.com/wtdubfs

[২২৪] China sanctions: US House passes bill over treatment of Uighurs. BBC News, December 4th, 2019. https://tinyurl.com/v29rud6

UK joins 22 other UN nations in condemning China's detention of Uighur Muslims. Zamira Rahim. The Independent, October 20th, 2019. https://tinyurl.com/wtdubfs

Trump Says He Avoided Punishing China Over Uighur Camps to Protect Trade Talks. Michael Crowley. The New York Times, June 21st, 2020. https://tinyurl.com/ybgae8v6

হাতে দুই-একজন লোক নিহত হলেও মিডিয়াতে কালবৈশাখী ঝড় ওঠে, কিন্তু উইঘুর মুসলিমদের ওপর ওপর চীনের এত নৃশংসতার পরেও মিডিয়া শান্ত হয়ে আছে।

অদ্ভুত নীরবতা নেমে এসেছে বিশ্বের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও। ইহুদীদের গণহত্যার ওপর অজস্র গান, কবিতা লেখা হয়েছিল, বানানো হয়েছিল হৃদয়কাড়া অসংখ্য চলচ্চিত্র—আজ ৭০ বছর পরও বানানো হচ্ছে। একটার ওপর একটা বেস্ট সেলিং বই লেখা হয়েছে, নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে লেখকদের। অথচ উইঘুরদের ব্যাপারে চুপ এরাও। তেমন কোনো সাড়াশব্দ নেই। 'মানবধর্ম বড় ধর্ম', 'মানবতাই আমার ধর্ম', 'দিনশেষে আমরা সবাই মানুষ' ইত্যাদি স্লোগান দেওয়া সুশীলরাও নিশ্চুপ। দুই একজন সেলিব্রেটি যারা উইঘুরদের পক্ষে কথা বলেছেন, কঠিন সমালোচনার শিকার হয়েছেন তাঁরা।[২২৫]

ব্যস, এই হলো একুশ শতকের সবচেয়ে ভয়ংকর গণহত্যা থামানোর জন্য সমগ্র বিশ্বে মানবতা, নারীস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ফেরি করে বেড়ানো মোড়ল, মিডিয়া আর বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার শিকার উইঘুরদের ব্যাপারে এরা নিশ্চুপ!

কেন?

উইঘুরদের ব্যাপারে জাতিসংঘ কী করল?

চীন সরকার একটার পর একটা রেজুলেশন ভেঙেছে জাতিসংঘের[২২৬], তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে জাতিসংঘ? মানবাধিকার রক্ষার যে সংকল্প নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ, মানবাধিকার রক্ষার যে ঘোষণা তারা দিয়েছে, মানবতার এই চরম দুর্দিনে

---

[২২৫] Mesut Özil, the playmaker who spoke out when football stayed silent. Andrew Anthony. The Guardian, December 21st, 2019. https://tinyurl.com/yxyvz75v

[২২৬] পুরো বই তো পড়েই এ পর্যন্ত এসেছেন পাঠক। কাজেই আশা করি মাথায় আছে হান চাইনিযরা কী কী অপরাধ করেছে? এবার একটু কষ্ট করে নিচে দেয়া লিংকগুলো থেকে ঘুরে আসুন। গুনে শেষ করতে পারবেন না, চীনারা জাতিসংঘের কতগুলো নিয়ম ভেঙেছে। এতকিছুর পরেও জাতিসংঘের নীরবতা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। পড়ুন :

International standards on freedom of religion or belief. United Nations Human Rights Office Of The High Commissioners. https://tinyurl.com/sgwujcl

List of Human Rights Issues. United Nations Human Rights Office Of The High Commissioners. https://tinyurl.com/y5esuy8r

United Nations Universal Declaration of Human Rights. https://tinyurl.com/y7eczy4j

কী ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘ?

UN Committee on Elimination of Racial Discrimination চীনকে আহ্বান জানিয়েছে দ্রুত উইঘুর মুসলিমদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে মুক্ত করে দেবার জন্য। সেই সাথে উইঘুর, কাযাখ মুসলিমদের হয়রানি করা বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছে।[২২৭]

সভা-সেমিনার করা, কিছুদিন পরপর 'আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন', 'সব উইঘুর বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে', 'আমরা চীনকে এই গণহত্যা বন্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছি' এই টাইপের ডায়ালগ ঝাড়া ছাড়া আর কিছুই করেনি জাতিসংঘ। কিছুদিন ঝিম মেরে থাকা, তারপর উঠে উইঘুরদের পক্ষে দু-চারটা বিবৃতি দিয়ে আবার ঝিম মেরে যাওয়া। একদম ধরাবাঁধা রুটিন ফলো করছে জাতিসংঘ।

নাফ নদীর পানি যখন রোহিঙ্গাদের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল, বাচ্চাদের সামনে যখন ন্যাড়া মাথার বৌদ্ধরা মায়েদের ধর্ষণ করছিল, মায়েদের সামনেই যখন বেয়নেট দিয়ে বাচ্চাদের পেট চিরে ফেলা হচ্ছিল, অর্ধমৃত শিশুকে ছুড়ে ফেলা হচ্ছিল অগ্নিকুণ্ডে, যখন পাইকারি হারে রোহিঙ্গা পুরুষদের জবাই করছিল নাসাকা বাহিনী–তখনো একই রুটিন ফলো করেছে জাতিসংঘ। সকাল-বিকাল দুবেলা নিয়ম করে বিবৃতি দিয়েছে–

'আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন!'

মোদী সরকার ক্যাব, এনআরসি করে অসংখ্য মুসলিমকে ভিটেমাটি ছাড়া করছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুরো ভারতজুড়ে গণহত্যার ময়দান তৈরি করেছে, ছুতো খুঁজছে গণহত্যা শুরু করার। কেবল গরু খাবার কারণে মুসলিমদের পিটিয়ে মারছে, সবার সামনে মসজিদ পোড়াচ্ছে, কুরআন পোড়াচ্ছে, মসজিদের মিনারে হনুমানের পতাকা উড়াচ্ছে, প্রতিবেশী বাংলাদেশ দখল করে নেবার হুমকি দিচ্ছে নিয়মিত; কিন্তু জাতিসংঘ দেখেও দেখছে না।

গোমূত্রখোর ভারতীয় সেনাদের হাতে গত ২৭ বছরে ১ লাখ মুসলিম মরেছে কাশ্মীরে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে দশ হাজারের বেশি মুসলিম নারী। সবার সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে পাড়ার মাস্তানদের মতো গুন্ডামি করে করে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিলে করেছে মোদী সরকার।[২২৮] জাতিসংঘের অসংখ্য রেজুলেশন ভেঙে দখল করে নিয়েছে

---

[২২৭] House overwhelmingly passes bill to sanction Chinese officials over abuse and detention of Muslims in Xinjiang, further spiking tensions with China. Rosie Perper. December 4th, 2019. https://tinyurl.com/tuvq94t

[২২৮] 'ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ২৭ বছরে এক লাখ মুসলিম হত্যা'। দৈনিক ইনকিলাব, এপ্রিল ১২, ২০১৬। https://tinyurl.com/rntfrod

কাশ্মীর; কিন্তু জাতিসংঘ এ ক্ষেত্রেও বাধ্য ছেলের মতো রুটিন ফলো করে কেবল বলে গেছে–

'আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন!'

২০০৩ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে অভিযোগ তোলা হলো। সাদ্দাম হোসেনের কাছে নাকি মারাত্মক গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে! দানব সাদ্দাম হোসেনের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার মহান ব্রত নিয়ে অ্যামেরিকা অ্যান্ড কোং আক্রমণ করে বসে ইরাক। ছারখার হয়ে যায় দেশটা। আবু গ্বুরাইব কারাগারে অ্যামেরিকান সৈন্যরা ইরাকী বন্দীদের নগ্ন করে একজনের ওপর আরেকজনকে শুইয়ে পিরামিড বানায়। গোপনাঙ্গে শক দেয়।[২২৯] পরিবারের সামনেই গণধর্ষণ করে মেরে ফেলে ১৪ বছরের আবির আল জানাবীর মতো অসংখ্য মুসলিম কিশোরী আর নারীদের। মারা যায় কমপক্ষে পাঁচ লাখ মানুষ।[২৩০]

পরে জানা গেল ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল তা সর্বৈব মিথ্যা।

বলা হলো 'সরি'।[২৩১]

ব্যস!

জাতিসংঘ এখানেও নীরব থাকল।

মুসলিমের প্রথম কিবলা দখল করে নিল ইহুদীরা। নিজভূমেই পরবাসী বানিয়ে ফেলল লাখ লাখ ফিলিস্তিনীকে। সার্বিয়াতে গণহত্যা হলো। ছারখার হয়ে গেল আফগানিস্তান, সোমালিয়া, লিবিয়া, মালি, সুদান। লাখ লাখ মানুষ মারা গেল, লাখ লাখ বোন ধর্ষিত

Call the crime in Kashmir by its name: Ongoing genocide. Binish Ahmed. The Conversation, August 9th, 2019. https://tinyurl.com/vv5d86x

[২২৯] Shocking Stories of Abu Ghraib Prisoners. Journeyman Pictures, August 1st, 2007. https://tinyurl.com/h5kkafu

Iraqi recounts Abu Ghraib abuse. Al Jazeera English, July 23, 2009. https://tinyurl.com/uo2kqyn

[২৩০] Iraq: the Human cost. - https://tinyurl.com/y8sh4g4

Iraq study estimates war-related deaths at 461,000. BBC News, October 16th, 2013. https://tinyurl.com/utag4y4

U.S. soldier convicted of Iraq rape, murders found hanged in prison. Reuters, February 19th, 2014. https://tinyurl.com/s7mjedn

[২৩১] Tony Blair Says 'Sorry' For The Invasion Of Iraq. AJ+, October 26th, 2015. https://tinyurl.com/qnkye82

হলো সিরিয়ায়। সমানে নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হলো, কোটি কোটি মানুষ রিফিউজি হলো, আয়লান কুর্দিরা সাগরে ডুবে মারা গেল, কিছুই করল না জাতিসংঘ।[২৩২] বিছানা থেকে উঠে মাউথস্পিকারের সামনে এসে 'আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন' বলে আবার চলে গেল ঘুমুতে।

কিন্তু সব সময় এভাবে দুবেলা বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে না জাতিসংঘ, নববিবাহিতা লাজুক বউয়ের মতো একহাত লম্বা ঘোমটা টেনে থাকে না। মাঝে মাঝে কোমরে আঁচল বেঁধে ঠিকই নেমে পড়ে মিলিটারি অ্যাকশনে।

বেয়াড়া সাদ্দাম হোসেনকে শায়েস্তা করতে নব্বইয়ের দশকে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ ইরাকের ওপর অবরোধ আরোপকে 'হালাল' বলে ফতোয়া দেয়। জাতিসংঘের ফতোয়া নিয়ে ইরাকের ওপর অবরোধ আরোপ করে অ্যামেরিকা, ইংল্যান্ড। এর এর ফলে না খেতে পেয়ে, চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় প্রায় ১০ লাখ ইরাকী শিশু।[২৩৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে জাতিসংঘ সব সময় চুপ করে থাকছে না, বিবৃতি দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছে না। কিছু কিছু সময় বিভিন্ন দেশে মিলিটারি অ্যাকশনে নেমেছে। 'শান্তিরক্ষা' বাহিনী পাঠিয়েছে। কিছু কিছু অপরাধকে জাতিসংঘ অমার্জনীয় অপরাধ মনে করছে, কিছু কিছু মানুষের জীবন জাতিসংঘের কাছে অমূল্য। এদের একজনের জীবনের ওপর আঘাত এলেও জাতিসংঘের লেজে আগুন ধরে যায়। আবার কিছু কিছু মানুষের জীবনের মূল্য জাতিসংঘের কাছে পিঁপড়ার মতো। পায়ের নিচে একগাদা পিষে মারলেও কোনো কিছু যায় আসে না।

১০ লাখ ইরাকী শিশু হত্যার প্রতিবাদ হিসেবে টুইন টাওয়ারে টেনেটুনে হাজার তিনেক অ্যামেরিকান মারা জাতিসংঘের মতে হারাম, কিন্তু বছরের পর বছর জুড়ে লাখ লাখ জীবন্ত উইঘুরের শরীর থেকে অর্গান কেটে নিয়ে ওদের সিমেন্টে মুড়িয়ে পুঁতে ফেলা খুব আরাম!

মুসলিম নারীদের বোরখা পরানো অপরাধ, এর মাধ্যমে নারীকে বন্দী করে রাখা হয়।

---

[২৩২] এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ধারণা পেতে পড়া যেতে পারে এই বই, 'শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়'। লেখক : সাইদ মুহাম্মাদ আবরার, প্রকাশনী : গ্রাফিটি।

[২৩৩] Unworthy victims: Western wars have killed four million Muslims since 1990. Nafeez Ahmed. Middle East Eye, April 18th, 2016. https://tinyurl.com/yxs8wpkx

Paying the Price: The Killing of the Children of Iraq (John Pilger Documentary). Real Stories, December 14th, 2015. https://tinyurl.com/uy8tjfo

কাজেই এদের বিরুদ্ধে ড্রোন পাঠানো জায়েজ। কিন্তু মুসলিম উইঘুর নারীদের বিছানায় ১০ লাখ হান চাইনিয পুরুষ তুলে দেয়া তেমন কোনো অপরাধ নয়! একটা ধমক দেবারও দরকার নেই চীনকে। মুসলিম স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা 'বৈবাহিক ধর্ষণ', নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; কিন্তু কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে অজস্র মুসলিম নারীকে গণধর্ষণ করা, যৌনাঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়া কোনো অপরাধ নয়! কিচ্ছু করার দরকারই নেই। যুদ্ধকৌশল হিসেবে ইরাকের নিরপরাধ, নিষ্পাপ শিশুদের পাইকারি হত্যা জায়েজ; কিন্তু একুশ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যার শিকার উইঘুরদের রক্ষার জন্য চীনকে কড়া করে একটা ধমক দেয়াও জায়েজ নয়!

একবুক আশা নিয়ে আমরা বসে থাকি—জাতিসংঘ মানবতা রক্ষার যে কথা দিয়েছিল প্রতিষ্ঠালগ্নে, মানবতা রক্ষার যে বুলি তারা আউড়ে বেড়ায় প্রতিটি সম্মেলনে, তা তারা রক্ষা করবে। উইঘুর, সিরিয়া, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আরাকানের সব সমস্যার সমাধান তারা করবে। রক্ষা করবে মুসলিমদের। কিন্তু আসলেই কি তারা কিছু করেছে?

মুসলিমদের জন্য বারবার কি সেই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়নি? সেই একই প্যাটার্ন বারবার ঘুরেফিরে আসেনি? চরিত্র পাল্টাচ্ছে, সময় পরিবর্তিত হচ্ছে; কিন্তু গল্প পাল্টাচ্ছে না—পাল্টাচ্ছে না জাতিসংঘের ভূমিকা। মুসলিম নারীরা ধর্ষিত হয়ে যাচ্ছে, পুরুষদের লাশের পাহাড় জমছে; আর ওদিকে জাতিসংঘ দুই-দশটা বিবৃতি দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে ফেলছে। চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

কিন্তু আমাদের সঙ্গেই কেন বারবার এমন হয়? আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু রক্ষার সময় জাতিসংঘ কেন নীরব ভূমিকা পালন করে? ওইদিকে আমাদের বোনেরা ধর্ষিত হতে থাকে, শিশুরা খাবারের অভাবে মরতে থাকে, আমাদের ভাইয়েরা জবাই হতে থাকে। যুগের হুবাল অ্যামেরিকার ড্রোন হামলায় মারা পড়ে বাবাকে খুঁজতে আসা ১৬ বছরের আব্দুর রহমান আর ৮ বছরের নাওয়ার; আর এদিকে জাতিসংঘ সেমিনার-শুনানি-বিবৃতির মধ্যেই নিজেদের গুটিয়ে রাখে।

কেন সব সময় এমন হয়? আমরা মুসলিম এটাই কি কারণ?

সমীকরণ মেলানোটা কি খুব বেশি কঠিন?

জ্যান্ত মানুষের শরীর থেকে অর্গান কেটে নিচ্ছে—এর চাইতে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন আর কী হতে পারে?

তবুও জাতিসংঘ নিশ্চুপ।

তবুও সভ্যতার ধারক-বাহক ফিরিঙ্গিরা নিশ্চুপ।

অথচ এরাই না মানবতার কথা বলে আফগানিস্তানে টনকে টন বোমা ফেলে? ইরাকের

লাখ লাখ শিশু হত্যা করে? ৭৩ বছরে ৩ কোটি মানুষ মেরে মানবতা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বেড়ায় পৃথিবীজুড়ে?[২৩৪]

এই মানবতা রক্ষা আর প্রতিষ্ঠা যে কিছু ফাঁপা বুলি সেটা কি প্রমাণিত হয়ে যায়নি? উইঘুরদের চেয়ে বড় কোনো প্রমাণ আর কী আছে? আর কোনো প্রমাণের কি দরকার আছে?

মানবতা, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়–এরা মুসলিমদের কখনো কোনো উপকারে আসেনি, আসবেও না।

পুরোটাই এক বিরাট তামাশা!

এক অসুস্থ পাতানো খেলা।

---

[২৩৪] US Has Killed More Than 20 Million People in 37 "Victim Nations" Since World War II, James A. Lucas, January 20, 2019. https://tinyurl.com/y2jfas2p

অমার্জনীয় অপরাধ

১৪০০ বছর আগের জাজিরাতুল আরব।

মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতনের মুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের নিয়ে হিজরত করে গেলেন নতুন এক শহরে—মদীনায়। মুসলিমরা পেছনে ফেলে গেলেন পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, পশুপাল, নিজেদের ভিটেমাটি। মদীনার আওস আর খাযরায গোত্রের মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ আর তাঁর সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-দের গ্রহণ করে নিলেন এক মহাকাব্যিক ভালোবাসা নিয়ে। পৃথিবীবাসীর সামনে স্থাপন করলেন ভ্রাতৃত্ববোধের এমন এক দৃষ্টান্ত, যা এর আগে কেউ দেখেনি—দেখবেও না।

পৃথিবীবাসীকে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, দেখো! মুসলিম ভাইদের ভালোবাসতে হয় এভাবেই।

কী করেননি তাঁরা মক্কার মুহাজিরদের জন্য? রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু হিজরত করে আসা মুসলিম ভাই—নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমান দুভাগ করে এক ভাগ দিয়ে দিতে চাইবার জন্য এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট ছিল আওস এবং খাযরায গোত্রের জন্য।

রাদিআল্লাহু আনহুম।

মুহাম্মাদ ﷺ আর তাঁর সাহাবীদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-দের আশ্রয় দেবার কারণে তাদের মাথার ওপর ঝুলছিল বাকি আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাঁদের ওপর ছিল অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের শঙ্কা। আশঙ্কা ছিল ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁদের শিশুদের তিলে তিলে মরার, বাইরের শত্রুর আক্রমণে শহর তছনছ হয়ে যাওয়ার। এতকিছুর পরেও মুহাজির ভাইদের বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল তাঁরা।

রাদিআল্লাহু আনহুম।

হতভাগ্য উইঘুররা তো এত কিছু চায়নি। এত দাবি-দাওয়া জানায়নি তাদের মুসলিম ভাইদের কাছে। সৌদি, মিশর, পাকিস্তান বা অন্যান্য মুসলিম দেশের কাছে চায়নি আওস আর খাযরায গোত্রের মতো আত্মত্যাগ। চাহিদা ছিল অনেক কম। শুধু একটু আশ্রয়। ছোট্ট একটা ঘর, প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ানো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বিভীষিকাগুলোর সাথে যে ঘরে বোঝাপড়া করতে পারবে ওরা নিরাপদে। ভারী বুটের আওয়াজ, কড়া নাড়ার শব্দে ক্ষণে ক্ষণেই কলজে শুকিয়ে যাবে না। ব্যস, এতটুকুই ছিল তাদের চাওয়া।

যাদের ভাই ভেবেছিল উইঘুররা, তারাই বেঈমানী করে বসল ওদের সাথে। কুকুর বিড়ালের মতো খেদিয়ে খেদিয়ে হাতে হাতকড়া পরাল ওদের। তারপর তুলে দিলো নাস্তিক কমিউনিস্ট সরকারের হাতে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য। যেখানে ৩৫ বছরের নিচের নারী-পুরুষদের নির্বিচারে ধর্ষণ করা হয়, মহিলাদের লজ্জাস্থানের পশম উপড়ে ফেলা হয় একটা একটা করে, অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া গর্ভপাত করা হয়। জীবন্ত বন্দীর শরীর থেকে কেটে নেয়া হয় কিডনি, লিভার, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলা হয় চোখ। যেখানে বন্দীরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আকুল আবেদন জানায়— ‘আমাকে মেরে ফেলো, প্লীজ মেরে ফেলো!’

উইঘুরদের চীনের হাতে তুলে না দিলে মুসলিম দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত বাকি বিশ্ব, একঘরে করে দিত, ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরত, ড্রোন নিয়ে গণতন্ত্র আর শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ছুটে যেত—এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বরং উল্টোটা হবার সম্ভাবনাই ছিল প্রবল। পৃথিবীবাসীর কাছ থেকে ‘সাবাশি’ পেতে পারত। নিজেদের মানবিকতার ইমেজ বিক্রি করে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে পারত তথাকথিত ‘মুসলিম শাসকরা’। কিন্তু কিছু নগদ নারায়ণ পাওয়ার আশায় নরক থেকে পালিয়ে আসা মুসলিম ভাইদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওরা তুলে দিচ্ছে চীনের হাতে। ‘উইঘুরদের ফেরত পাঠাব, ওদের নিয়ে টুঁ শব্দটি করব না; বিনিময়ে আমাদের অর্থনৈতিক সুবিধা দেবে।’ মুসলিম ভাইদের পণ্যে পরিণত করে চীনের সাথে কী চমৎকার ব্যবসায়িক চুক্তি করে ফেলল উম্মাহর কথিত অভিভাবকরা!

কই, কেউ হাততালি দিলেন না যে?

তাদের দেশে পড়তে আসা উইঘুর ছাত্রদের গ্রেফতার করে করে চীনের হাতে তুলে দিচ্ছে মিশর। ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন অনুসারে কোনো দেশ তাদের দেশে থাকা বিদেশি নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যদি ফেরত গেলে

সেই ব্যক্তির অত্যাচারের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে। রিফিউজি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছিল মিশরও। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঠিকই উইঘুর ছাত্রদের ফেরত পাঠিয়েছে মিশর।

আরেক মুসলিম দেশ মালেয়শিয়াও অনুসরণ করেছে মিশরকে। তারাও চীনের হাতে তুলে দিয়েছে উইঘুর ছাত্রদের। ব্যতিক্রম করেনি সৌদি আরবও। সেখানেও হুমকির মুখে পড়েছে উইঘুররা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মভূমি সৌদির মাটিতেও নিরাপদ নয় উইঘুর মুসলিমরা। কী করুণ এক অবস্থা![২৩৫]

পূর্ব তুর্কিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত আছে এমন দেশগুলোও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে উইঘুরদের দিক থেকে। হিন্দুত্ববাদী ভারত তো বটেই, কথিত 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' পাকিস্তানও একেবারেই উদাসীন উইঘুরদের ব্যাপারে। কাযাখস্তানের সঙ্গে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা ইত্যাদি দিক দিয়ে অনেক মিল। একটা সময় পর্যন্ত উইঘুর-কাযাখদের সাহায্য সহযোগিতা করলেও এখন আর চীনকে রাগাতে চাচ্ছে না কাযাখস্তান। কিরগিস্তান, তাজিকিস্তান, মঙ্গোলিয়া, আশরাফ গনির আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার দেশগুলো–কোথাও নিরাপদ নয় উইঘুর-কাযাখ মুসলিমরা। কিছু কিছু দেশের সাথে লিখিত চুক্তি করেছে চীন, আবার কোনো কোনো দেশের সাথে মৌখিক চুক্তি করেছে–'উইঘুর-কাযাখ কেউ সেই দেশে পালিয়ে গেলে অবশ্যই চীনে ফিরিয়ে দিতে হবে'। মধ্য এশিয়ার অনেক দেশ পালিয়ে যাওয়া উইঘুরদের তুলে দিয়েছে চীনের হাতে।[২৩৬]

---

[২৩৫] Egypt hands Uighur Muslim students to China. Ilke News Agency. July 8th, 2017. https://tinyurl.com/trbexqj

Uighurs arrested in Egypt face unknown fate. Linah Alsaafin. Al Jazeera, July 27th, 2017. https://tinyurl.com/tajqlwl

Uyghur Students in Egypt Detained, Sent Back to China. Radio Free Asia, July 7th, 2017. https://tinyurl.com/uta9hr4

Egypt detains Chinese Uighur students, who fear return to China: rights group. Lisa Barrington. Reuters, July 7th, 2017. https://tinyurl.com/tpfw4lw

Uyghurs in Saudi Arabia facing an impossible choice. Middle East Monitor, January 27th, 2020. https://tinyurl.com/urybmpa

[২৩৬] কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে চীন থেকে পালানো খুবই কঠিন। তারপরও চরম ঝুঁকি নিয়ে, খুনরাঙা পথ পাড়ি দিয়ে উইঘুরা যে দেশগুলোতেই যাচ্ছে দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে সবাই তাঁদের তুলে দিচ্ছে চীনের হাতে। মানব পাচারকারীদের হাত ধরে কিছু উইঘুর কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছিল। এই দেশগুলোও উইঘুরদের তুলে দিয়েছে চীনের হাতে। ইউরোপ-অ্যামেরিকার তথাকথির সভ্য দেশগুলোও স্বাগতম জানাচ্ছে না উইঘুরদের। কানাডার মতো দেশও সেখানকার উইঘুর রিফিউজিদের চীন ফেরত পাঠানোর পাঁয়তারা কষছে। জার্মানি,

ঈমান ভঙ্গের অন্যতম কারণ হলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির-মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।[২৩৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন :

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"[২৩৮]

এবং তিনি বলেছেন :

"অতএব (হে রাসূল) আপনি কোনো অবস্থাতেই কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না।"[২৩৯]

"সেসব মুনাফিক্বকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক

সুইডেন, অ্যামেরিকা কিছু কিছু উইঘুরদের আশ্রয় দিয়েছে। তবে সেখানেও উইঘুররা নিরাপদ নয়। চীন সেখানেও উইঘুরদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। মুসলিম হবার কারণে উইঘুরদের অ্যামেরিকা নিজেদের ভূখণ্ডে না রেখে বারমুডার মতো জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। আবার ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলো আশ্রয় দিলেও রিফিউজিদের ব্রেইন ওয়াশ করার চেষ্টা করে। অনেককেই খৃস্টান বানিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে, সাহায্য সহযোগিতার নাম করে যেমন পাশ্চাত্যের দেশগুলো রোহিংগাদের গনহারে খৃস্টান বানাচ্ছে।

Germany is trying to teach refugees the right way to have sex- https://tinyurl.com/guuub68

'Finding a relationship is the best way to integrate': Germany's 'Mr. Flirt' is teaching refugees how to approach women- https://tinyurl.com/yawzxea9

Muslim refugees are converting to Christianity in Germany- https://tinyurl.com/y9ex976g

সাহায্যের আড়ালে খ্রিষ্টান বানানো হচ্ছে রোহিঙ্গাদের- https://tinyurl.com/ychm8mgs

Dushanbe and Beijing sign extradition deal with Uighurs in mind - https://tinyurl.com/y9vghu9d

Uighur Refugees On The Rise Internationally - https://tinyurl.com/yay7o3xg

Uyghur Asylum Seekers - https://tinyurl.com/yau2wwf4

China to neighbours: Send us your Uighurs- https://tinyurl.com/yasswm5x

[২৩৭] Is there scholarly consensus on all ten things which nullify Islam that were mentioned by Imam Muhammad ibn 'Abd al-Wahhaab? IslamQA. https://tinyurl.com/rnea5gv

[২৩৮] সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত : ৫১

[২৩৯] সূরা আল কাসাস, আয়াত : ৮৬

আযাব–যারা মুসলমানদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়। তারা (মুনাফিক্বরা) কি তাদের (কাফিরদের) কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান শুধু আল্লাহরই জন্য।"[২৪০]

কাফির নাস্তিক চীন সরকার মানবাধিকারের সকল চুক্তি ভঙ্গ করে উইঘুরদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। উইঘুর নারী ও পুরুষদের ধর্ষন করছে, উইঘুর ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করছে, রোযা রাখতে দিচ্ছে না, নামায পড়তে দিচ্ছে না, কুরআনও শিখতে দিচ্ছে না। ঘোষণা দিয়ে কুরআনকে বিকৃত করছে।

যেসব শাসক এই চীনাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে তাদের বিধান কী? যেসব শাসক উইঘুর মুসলিমদের আশ্রয় না দিয়ে উল্টো গ্রেফতার করে চীনের হাতে তুলে দেয় তাদের বিধান কী? তাদের ঈমানের অবস্থা কী?

মুসলিম ভূখণ্ডের শাসকেরা শুধু উইঘুরদের উপেক্ষা করেনি। তারা অনেকে সরাসরি চীনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সমর্থন জানিয়েছে চীনের জেনোসাইডের পলিসিকে।

যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে চীনের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করে জাতিসংঘে চিঠি লেখে ২২টা দেশ।[২৪১] বলতে খুবই খারাপ লাগছে এই ২২টা দেশের মধ্যে একটাও মুসলিম দেশ নেই। নব্য ক্রুসেইডার বাহিনী ন্যাটোভুক্ত অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স আছে; কিন্তু একটাও মুসলিম দেশ নেই।[২৪২] একটাও না! উইঘুরদের দুঃখে কাফিররাও ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে; কিন্তু আফসোস আমাদের তথাকথিত 'মুসলিম শাসকরা' কিছু করছে না।

এর ঠিক কয়েকদিন পরেই আরেকটা চিঠি পৌঁছায় জাতিসংঘে। রাশিয়া, ভেনিজুয়েলা, মায়ানমারসহ ৩৭টা দেশ চীনের সমর্থনে চিঠি পাঠায়। চীনাব্লক বা অ্যামেরিকা-বিরোধী ব্লকের দেশগুলো চীনকে সমর্থন দিতেই পারে এই নষ্ট পৃথিবীতে। কিন্তু হৃদয়ভাঙা ব্যাপার হচ্ছে এই ৩৭টা দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা মুসলিমপ্রধান দেশ আছে। এই

---

[২৪০] সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩৮-৩৯

[২৪১] UK joins 22 other UN nations in condemning China's detention of Uighur Muslims. Zamira Rahim. The Independent, October 20th, 2019. https://tinyurl.com/wtdubfs

সেই চিঠি পড়তে পারেন এখান থেকে- https://tinyurl.com/whb8z53

[২৪২] Which Countries Are For or Against China's Xinjiang Policies? Catherine Putz. The Diplomat, July 15th, 2019. https://tinyurl.com/rk2tfu3

৩৭টা দেশের মধ্যে আছে :

সৌদি আরব
পাকিস্তান
আরব আমিরাত
ওমান
কুয়েত
বাহরাইন
কাতার।[২৪৩]

সেই চিঠিতে বলা হচ্ছে, 'সন্ত্রাসবাদী, উগ্রবাদীদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে সিরিজ আকারে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কার্যক্রম চালাচ্ছে চীন। এই কাউন্টার টেরোরিযম কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে কারিগরি শিক্ষা এবং ট্রেইনিং সেন্টার স্থাপন করা। প্রত্যেক গোত্রের মানুষেরই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে চীন পূর্ব তুর্কিস্তানে। গত ৩ বছর ধরে পূর্ব তুর্কিস্তানের মানুষ পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট, খুশিমনে, নিরাপদ বোধ নিয়ে ঘুমুতে যাচ্ছে।'[২৪৪]

পাঠক দেখুন, কী এক নির্মম ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে আমাদের জীবদ্দশায়। উইঘুরদের ওপর এত এত নির্যাতন করা হচ্ছে। কাফির দেশগুলো জাতিসংঘে উইঘুরদের পক্ষে চিঠি পাঠাচ্ছে। কিন্তু কোনো মুসলিম দেশ সেখানে থাকছে না। উইঘুর ভাইদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে উল্টো যারা ওদের কচুকাটা করছে তাদের পক্ষে চিঠি লিখছে দলবেঁধে। আজ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতেন তাঁর উম্মাহর এই অবস্থা, তাহলে কল্পনা করুন তিনি কতটা কষ্ট পেতেন।

ঐতিহাসিক, সামরিক বা অন্য কোনো 'এক্স' ফ্যাক্টরের কারণে সৌদি, তুরস্ক বা পাকিস্তানের শাসকদের ব্যাপারে উম্মাহর অনেকের আশা থাকে যে এরা মুসলিমদের জন্য কিছু করবে। মুসলিমদের যেকোনো ইস্যুতে আমরা এই দেশগুলোর দিকে আশায় বুক বেঁধে চেয়ে থাকি। আশা যেহেতু বেশি তাই কিছু না করলে আশাভঙ্গের কষ্টও বেশি পেতে হয়। এই তিন দেশই হতাশ করেছে আমাদের।

---

[২৪৩] কাতার পরে অবশ্য এই চিঠি থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। Uyghur activists welcome Qatar withdrawal from support for China crackdown. Middle East of Monitor. August 22nd, 2019. https://tinyurl.com/wqrt6u8

[২৪৪] Uyghur: Saudi Arabia and Russia among 37 states backing China's policy. Middle East Monitor, July 12th, 2019. https://tinyurl.com/vtqsgsw

ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান বেইজিং সফরে এসে গলাগলি বন্ধুত্ব করেছে শি জিনপিং এর সাথে। বলছেন, চীনের অবশ্যই অধিকার আছে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্রবাদ-বিরোধী পদক্ষেপ নেবার। সৌদি আরব চীনের এই পদক্ষেপকে সমর্থন এবং সম্মান করে। সেই সাথে চীনের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক মজবুত করতে সৌদি আরব খুব আগ্রহী।[২৪৫]

এই হলো উম্মাহর অবস্থা! দুই হারমাইনের খেদমতকারী সৌদি তো চীনের আরও অনেক খেদমত 'আঞ্জাম' দিয়েছে। ছয় মাস ধরে চীন সরকার কোমর বেঁধে ক্যাম্পেইন করেছে ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মুখ বন্ধ করার জন্য। জটিল এবং কুটিল কূটনৈতিক চাল, ঘুষ, হুমকি-ধমকি–বাদ রাখেনি কোনো পন্থাই। যেভাবেই হোক ওআইসির সদস্য ৫৭টা মুসলিম দেশগুলোকে দিয়ে বলাতে হবে–উইঘুরদের বিষয়টা চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। ৫৭টা দেশ না হলেও অন্তত প্রথম সারির কয়েকটা দেশের মুখ থেকে বের হলেও হবে। বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো এই ক্যাম্পেইনে চীনকে সাহায্য করে গিয়েছে সৌদি আরব এবং সৌদির পুরোনো বন্ধু আরব আমিরাত। ওআইসির বাকি দেশগুলোকে সৌদি বুঝিয়েছে, চীনে উইঘুরদের ওপর কোনো নির্যাতন হয় না। ৩০ লাখ উইঘুর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী নয়। আর এর পুরোটাই চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমাদের নাক গলানো ঠিক হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মভূমিতে কর্তৃত্ব গেড়ে বসা শাসকদের এই অবস্থান দেখে অন্য দেশগুলোও এগিয়ে আসতে চাচ্ছে না। উইঘুরদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না কেউ।

চীনও সবাইকে বলার সুযোগ পেয়েছে, দেখো আসলে পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলিমদের ওপর কোনো অত্যাচারই হচ্ছে না। সৌদি আরবই তো বলেছে যে উইঘুর মুসলিমরা নিরাপদ। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।[২৪৬]

উম্মাহর অনেকের আরেক ভরসার মানুষ এরদোগান। হতাশ করেছেন তিনিও।

---

[২৪৫] China wages relentless crackdowns on its Muslims. But Saudi Arabia stays quiet as it bolsters ties with Beijing. Anna Fifield & Kareem Fahim. The Washington Post, May 27th, 2019. https://tinyurl.com/ts87958
Saudi Arabia's Mohammed Bin Salman Defends China's Use of Concentration Camps for Muslims during Visit to Beijing. Cristina Maza. Newsweek, February 22nd, 2019. https://tinyurl.com/y5b5ww48

[২৪৬] China wages relentless crackdowns on its Muslims. But Saudi Arabia stays quiet as it bolsters ties with Beijing. Anna Fifield & Kareem Fahim. The Washington Post, May 27th, 2019. https://tinyurl.com/ts87958

চীন সরকার মুসলিমদেরকে বলেছিল মানসিক রোগী, ইসলামকে বলেছিল ভাইরাস। বন্ধ করে দিয়েছে মাদ্রাসা, ধ্বংস করেছে অসংখ্য মসজিদ। রোযা রাখা, পর্দা করা নিষিদ্ধ করেছে। নতুন করে লিখতে চেয়েছে কুরআন। অথচ 'কুরআনের পাখি' এরদোগান ২০১৯ সালের জুলাইয়ে চীন সফরে এসে হাসি হাসি মুখে ছবি তুলছেন শয়তান শি জিনপিং এর সাথে। এরদোগান বলেছেন, 'তুরস্ক ওয়ান চায়না পলিসিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। পূর্ব তুর্কিস্তানের সকল জাতির মানুষ চীনের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির মাঝে সুখী জীবনযাপন করছে। দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে কাউকে প্রশ্রয় দেবে না তুরস্ক।'

প্রেসিডেন্ট এরদোগান তুরস্কের সাথে নিরপত্তা এবং কৌশলগত সহযোগিতা জোরদারেরও ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিনিময়ে চীনের প্রেসিডেন্ট ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে, 'তুরস্কে চীন-বিরোধী বা কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশ্রয় না দেবার অঙ্গীকার বারবার ব্যক্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট এরদোগানের নিকট চীন কৃতজ্ঞ।'[২৪৭]

তুরস্কের পার্লামেন্টে পূর্ব তুর্কিস্তানের অবস্থা অনুসন্ধানের প্রস্তাব তোলা হয়। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে এরদোগানের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভোলেপমেন্ট পার্টি (AK Party) এবং ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট পার্টি ভোট দেয়। প্রস্তাবটি আর পাশ হয়নি।[২৪৮]

এখানেই শেষ না। অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে উইঘুরদের চীনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে তুরস্ক[২৪৯]। পঞ্চাশ হাজারের মতো উইঘুরদের আশ্রয় দিয়েছিল তুরস্ক। তুরস্ক সরকার প্রথমে সেইসব উইঘুরদের খুঁজে বের করছে যাদেরকে চীন ফেরত চায়। তারপর পাঠিয়ে দিচ্ছে তৃতীয় কোনো দেশে (যেমন: তাযিকিস্তান)। সেখান থেকে চীন ওদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

৯২ পৃষ্ঠার একটা গোপন নথি ফাঁস হয়েছে। এই নথি থেকে দেখা যাচ্ছে ২০১৬ সালের মে মাসে চীন তুরস্ককে ইনভার তুরদি (Enver Turdi)-কে তাদের হাতে

---

[২৪৭] Trust highlighted in Turkey ties. An Baijie, ChinaDaily, July 3rd, 2019. https://tinyurl.com/y5u3oqcc
Chinese state media: Erdogan says people live happily in Xinjiang- https://tinyurl.com/y3mlan8p

[২৪৮] 'Uygur Türklerinin sorunları araştırılsın' önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Halil ATAS. Sozcu. https://tinyurl.com/y3us82kl

[২৪৯] How Turkey is sending Muslim Uighurs back to China without breaking its promise. Gareth Browne. The Telegraph, July 26th, 20202. https://tinyurl.com/yyq6odwa

তুলে দেবার আহ্বান জানাচ্ছে। ইনভার তুরদি চীন থেকে পালিয়ে তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই উইঘুর ভদ্রলোক হান চাইনিযদের নির্যাতনের খবরাখবর রেডিং ফ্রি এশিয়া, উইঘুর এক্সাইল গ্রুপস ইত্যাদিকে জানাতেন। সেই গোপন নথি থেকেই দেখা যায় ২০১৭ সালে তুরস্ক সরকার চীনের এই আহ্বানে সম্মত হয়। ইনভার তুরদিকে চীনের হাতে তুলে দেবার কার্যক্রম শুরু করে।[২৫০]

ইনভার তুরদির মতো কেসের সংখ্যা অজস্র। উইঘুর নারী জিন্নেতগুল তারসুন এবং তার দুই ছোট্ট মেয়েকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি তাযিকিস্তান হয়ে চীনা সরকারের হাতে তুলে দেয় তুরস্ক সরকার। তাদের ভাগ্যে ঠিক কী ঘটেছে তা এখন সুস্পষ্ট করে কেউ বলতে পারে না।

তৃতীয় দেশের মাধ্যমে চাইনিযদের হাতে উইঘুরদের তুলে দেওয়ার ঘটনা নিয়ে টুইট করেছেন আব্দুওলী আয়ুপ। মন্তব্য করেছেন উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট আরসলান হিদায়াতও।[২৫১] মন্তব্য করেছে ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসও।[২৫২] তুরস্কে থাকা উইঘুরদের চীনের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে বেইজিং এর আবেদনের বিভিন্ন দলিলপত্রও প্রকাশিত হয়েছে।[২৫৩]

প্রখ্যাত উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট ইসমাইল চেঙ্গিস বলছেন,

> *‘সেখানে (তুরস্কে) হুমকি আছে এবং সেগুলো খুবই হিসেবি ও নিয়মতান্ত্রিক। তারা (চীন) আমাদের বোঝাতে চায়, তোমরা যেখানেই যাও না কেন আমরা তোমাদের নাগাল পাবই।’*[২৫৪]

---

[২৫০] Documents show China’s secret extradition request for Uighur in Turkey. Bethany Allen-Ebrahimian. AXIOS, May 20th, 2020. https://tinyurl.com/y79n2c83
ফাঁস হওয়া সেই গোপন নথি- https://tinyurl.com/y55glaup

[২৫১] Uyghur Mother, Daughters Deported to China From Turkey. Radio Free Asia, September 8th, 2019. https://tinyurl.com/y3flk8cy
Why Erdogan has decided to extradite Uighurs to China | WION, July 27th, 2020. https://tinyurl.com/yy8bg94v
উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট আরসালান হিদায়াতের বক্তব্য - https://tinyurl.com/y42djgqx
How Turkey is sending Muslim Uighurs back to China without breaking its promise. Gareth Browne. The Telegraph, July 26th, 20202. https://tinyurl.com/yyq6odwa

[২৫২] World Uyghur Congress এর মন্তব্য - https://tinyurl.com/y3n3wbkk

[২৫৩] Documents show China’s secret extradition request for Uighur in Turkey. Bethany Allen-Ebrahimian. AXIOS, May 20th, 2020. https://tinyurl.com/y79n2c83

[২৫৪] How Turkey is sending Muslim Uighurs back to China without breaking its promise- https://tinyurl.com/yyq6odwa

তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমেত দাভুতগুলুও স্বীকার করেছেন, তুরস্ক উইঘুর রিফিউজিদের চীনে ফেরত পাঠাচ্ছে।[২৫৫]

২০১৭ সালে বেইজিং এবং আংকারার মধ্যে একটি খসড়া Extradition treaty (পলাতক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেয়ার চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়। খোদ প্রেসিডেন্ট এরদোগান তুরস্কের সংসদে এই চুক্তি পাশের জন্য জমা দেন ২০১৯ সালে। এই চুক্তি এখনো সংসদে পাশ হয়নি; এবং অনেকেই এর বিরোধিতা করছেন। এই চুক্তি পাশ হলে আর লুকোছাপা নয়; সরাসরি তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া উইঘুরদের চীনে ফেরত পাঠাতে পারবে তুরস্ক।[২৫৬]

ইহুদীদের ইসরায়েলে আগুন লাগলে সেই আগুন নেভানোর জন্য তুরস্কের এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে বিমান ওড়ে; কিন্তু উইঘুর মুসলিমরা একুশ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হলেও এরদোগান কোনো বিমান পাঠান না তার ভাইদের জন্য।[২৫৭]

পরমাণু শক্তিধর কথিত 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' পাকিস্তানের খান সাহেব তো আরেক কাঠি সরেস। চীন উইঘুরদের সাথে যে ব্যবহার করছে সে সম্পর্ক মন্তব্য জানতে চাওয়া হয় ইমরান খানের কাছে। আকাশ থেকে যেন পড়েন খান সাহেব। সহজ সরল স্বীকারোক্তি দেন, 'আসলে আমি এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারছি না, কারণ উইঘুরদের ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না।' ফিনান্সিয়াল টাইমসের সাংবাদিক চেপে ধরল, '... আপনি তো বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের নিয়ে কথা বলেন। চীনের ব্যাপারে কিছু বলবেন না?' খান সাহেবের স্মার্টনেস কিছুটা ধাক্কা খেলো সাংবাদিকের এই প্রশ্নে, কিছুটা আমতা আমতা করে সেই একই কথা বললেন, 'এটা সত্য যে উম্মাহ খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উইঘুরদের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না। পত্রিকায় ওদের নিয়ে তো তেমন কোনো সংবাদ আসে না।'

---

[২৫৫] Former Turkish PM acknowledges Turkey policy of returning Uighur Muslims to China. Emily Judd. Al Arabiya English, July 29th, 2020. https://tinyurl.com/y5w5nl7j

[২৫৬] Extradition Treaty That Could Deport Uyghurs From Turkey to China Faces Uncertainty in Ankara. Radio Free Asia, May 21st, 2020. https://tinyurl.com/y34srf3w

[২৫৭] PM Netanyahu thanks Turkey for plane to fight Israel's wildfires. Daily Sabah, November 24th, 2016. https://tinyurl.com/tdmrdj3

আব্দুওলী আয়ুপের এই লেখাটি পড়ার বিনীত অনুরোধ রইল :

Mr. Erdogan, Uyghurs you met in Urumqi were arrested- https://tinyurl.com/y3sshpkn

'কিন্তু এক পাকিস্তানীই তো দাবি করেছে, চীন তার স্ত্রীকে বন্দী করে রেখেছে' তুরুপের তাস ছাড়ল সাংবাদিক। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে খান সাহেব উত্তর দিলেন, 'এ ব্যাপারেও আমি কিছু শুনিনি! আপনাকে ধন্যবাদ!'[২৫৮]

এই হলো আমাদের উম্মাহর তথাকথিত নেতাদের অবস্থা! নিজ হাতে উম্মাহর এপিটাফ লিখছেন সেইসব নেতারা, যাদের দায়িত্ব ছিল উম্মাহকে রক্ষা করা!

কিন্তু কেন উইঘুরদের সাথে এতটা গাদ্দারি করল মুসলিম দেশগুলো? কেন নীরব থাকল?

পাকিস্তানের কথাই ধরুন। পাকিস্তানের পুরোনো মিত্র চীন। সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই যুগ যুগ ধরে পাকিস্তানকে সাহায্য করে যাচ্ছে চীন। পাকিস্তানের অস্ত্রের জোগানের বেশির ভাগ আসে চীন থেকে। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে চীন থেকে ৬ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের অস্ত্র কিনেছে পাকিস্তান। ইমরান খান উইঘুরদের ব্যাপারে কিছু না বলার পেছনে দায়ী করেছিলেন নিজের অজ্ঞতাকে। সেই সাথে পরোক্ষভাবে এটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি চীনের সমালোচনা করছেন না কারণ, '...চীনারা আমাদের প্রচুর সাহায্য করে। ওরা কীভাবে আমাদের সাহায্য করে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করে তার সবকিছু আমি হয়তো আপনাদের বলতে পারছি না। এগুলো গোপন তথ্য, চীন চায় এগুলো গোপন থাকুক। কিন্তু চীন আমাদের ব্যাপক সাহায্য করে। চীন আমাদের বদ্ধ হয়ে আসা জীবনে যেন এক ঝলক মুক্ত বাতাস নিয়ে আসে।'[২৫৯]

তুরস্ক চায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়াতে। এরদোগান, শি জিনপিং দুই নেতাই একমত হয়েছে, তুরস্ক আর চীনের মধ্যেকার বাণিজ্য দ্বিগুণ করে ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাবার। এরদোগান চীনা ব্যবসায়ীদের তুরস্কে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এরদোগান বলেছেন, 'AK Party সরকার প্রতিবছর ১০ লক্ষ চীনা টুরিস্টকে তুরস্কে স্বাগত জানাতে চায়। এর মাধ্যমে দুদেশের মধ্যকার পারস্পরিক বন্ধন শক্তিশালী

---

[২৫৮] Pakistan's Khan dodges questions on mass Chinese detention of Muslims. Ben Wescott. CNN, March 29th, 2019. https://tinyurl.com/yyyvdafa

[২৫৯] প্রাগুক্ত

PM Imran Khan Says He Doesn't Know Much About Uyghurs, Facebook Post By World Uyghur Congress, January 9th, 2019. https://tinyurl.com/rrhhqgs

How dominant is China in the global arms trade? CSIS, China Power. https://tinyurl.com/to2zjr7

হবে।'[২৬০]

আর চীনের সাথে সৌদির সম্পর্ক পুরো অন্য মাত্রার। সৌদি আরবের তেলের বিশাল এক ক্রেতা চীন। ২০০৯ সাল থেকে অ্যামেরিকাকে টেক্কা দিয়ে চীন সৌদি তেলের ১ নম্বর ক্রেতা। চীনা পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৌদি আরবে। সৌদির কন্সট্রাকশন সেক্টর চীনাদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ২০১৮ সালে এই দুই দেশের মধ্যে মোট বাণিজ্য হয়েছে প্রায় ৬৩ বিলিয়ন ডলারের।[২৬১]

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে চীন সফরে এসে ক্রাউন প্রিন্স সালমান ১০ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের চুক্তি করেছে চীনে একটা রিফাইনিং এবং পেট্রোকেমিকেলস কমপ্লেক্স স্থাপন করার জন্য। Saudi Arabian General Investment Authority বলছে এনারজি, মাইনিং, ট্রান্সপোর্ট, ই-কমার্স ইত্যাদি খাতে ২৮ বিলিয়ন ডলারের ৩৫টা চুক্তি করেছে তারা চীনের সাথে।[২৬২]

সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে হত্যা করে সৌদি আরব যখন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছিল তখন চীনের সাথে সুসম্পর্ক বিশ্বদরবারে ব্যাকআপ দিয়ে গিয়েছে সৌদিকে।[২৬৩]

আরেকটা বড় কারণ আছে কয়েকটি মুসলিম দেশের এভাবে বেঈমানী করার।

বেল্ট রোড ইনেশিয়েটিভ!

এর মাধ্যমে পাকিস্তান, তুরস্ক, মিশর, সৌদি, বাংলাদেশ, মালেয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া... লালে লাল হবার সম্ভাবনা অনেকগুলো দেশের সরকার আর আমলাদের। কাজেই উইঘুরদের ব্যাপারে মুখে তালা দিয়ে রাখার জন্য মোটিভেশনের কোনো অভাব নেই।[২৬৪]

রোহিঙ্গা, উইঘুর, কাশ্মীর সব ক্ষেত্রেই দেখুন জাতীয়তাবাদী চিন্তার কাছে পরাজিত হচ্ছে উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ। যেই জাতীয়তাবাদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতার লজ্জাস্থান

---

[২৬০] 'A New International Order to Serve the Interests of Humanity': Erdogan - Xi Jinping Meeting. Politics Today, July 3rd, 2019. https://tinyurl.com/y5359uhb

[২৬১] China wages relentless crackdowns on its Muslims. But Saudi Arabia stays quiet as it bolsters ties with Beijing. Anna Fifield & Kareem Fahim. The Washington Post, May 27th, 2019. https://tinyurl.com/ts87958

[২৬২] Saudi crown prince defends China's right to fight 'terrorism'. Al Jazeera, February 23rd, 2019. https://tinyurl.com/y52kze42

[২৬৩] China wages relentless crackdowns on its Muslims. But Saudi Arabia stays quiet as it bolsters ties with Beijing. Anna Fifield & Kareem Fahim. The Washington Post, May 27th, 2019. https://tinyurl.com/ts87958

[২৬৪] প্রাগুক্ত

কামড়ে ধরে থাকার সাথে তুলনা করেছিলেন।[২৬৫]

একবার চিন্তা করুন তো, যদি এমন আচরণ সৌদিদের সাথে করা হতো, তাহলে কি বিন সালমানরা চুপ থাকত? যদি পাকিস্তানের নাগরিকদের সাথে হতো, তাহলে কী খান সাহেব অজ্ঞতার ভান করে যেতেন এভাবে নির্লজ্জের মতো? যদি বাংলাদেশের নাগরিকদের সাথে হতো, তাহলে আমরা কি এভাবে অলস অবহেলায় দিন কাটাতে পারতাম?

উইঘুররা তো আমাদের দেশের কেউ না। আমাদের দেশের নাগরিক না। ওরা ভিনদেশি। ওদের ওপর চীন অত্যাচার করছে দেখে আমরা ব্যথিত। কিন্তু অত্যাচারের ব্যাপারে মুখ খুললে আমাদের লস হয়ে যাবে, চীনের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে আমাদের দেশের জনগণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে লালবাতি জ্বলে যাবে—তাই উইঘুরদের ব্যাপারে চুপ থাকাই ভালো। এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার! চীন তার নাগরিকদের নিয়ে যা খুশি করুক।

তা ছাড়া উইঘুরদের রক্ষা করা, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়া, এগুলো কী একা আমার দায়িত্ব নাকি? আরও অনেক মুসলিম দেশ আছে। ওরা তো আমার পাশে দাঁড়াবে না, কাজেই আমি আর একা কী করব? সবাই আমরা এমন ভেবে ভেবেই বসে আছি—কেউ তো আমার পাশে দাঁড়াবে না, আমি একা আর কতটুকু সাহায্য করতে পারব নির্যাতিত মুসলিমদের। এই ভেবে ভেবে কেউ অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াচ্ছে না।

এদিকে গণহত্যার শিকার হচ্ছে একের পর এক মুসলিম জনপদ।

মদীনার বাজারে এক ইহুদীর দোকানে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন একজন মুসলিম নারী। সেই ইহুদীর ইচ্ছে হয় এই মুসলিম নারীকে দেখার। ইহুদী মুসলিম মহিলার চেহারা অনাবৃত করতে বলে, কিন্তু মুসলিম নারী রাজি হননি। এতে সেই অভিশপ্ত ইহুদী চুপিসারে মুসলিম নারীর কাপড়ের একাংশ তাঁর পিঠের সাথে গিঁট বেঁধে দেয়। মুসলিম নারী দাঁড়ানোর সাথে সাথে তাঁর শরীর অনাবৃত হয়ে যায়। এতে ইহুদীরা খিলখিল করে হেসে ওঠে। সেখানে ছিলেন একজন মুসলিম পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে সেই ইহুদীকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন তিনি। আশেপাশে উপস্থিত অন্যান্য ইহুদীরা এসে শহীদ করে ফেলে সেই মুসলিম পুরুষকে। রাদিআল্লাহু আনহুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খবর পৌঁছানোমাত্র তিনি ﷺ যুদ্ধের পোশাক গায়ে চাপিয়ে মুসলিম

[২৬৫] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ২১২৩৬

সেনাবাহিনী নিয়ে শায়েস্তা করতে যান ইহুদীদের। চাচা হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহু-র হাতে তুলে দেন যুদ্ধের পতাকা। মুসলিম বাহিনী ১৫ দিন ধরে অবরোধ করে রাখে ওদের দুর্গ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইহুদীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন। ওরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। পিছমোড়া করে বেঁধে ধরে নিয়ে আসা হয় ওদেরকে। মুনাফিক নেতারা কৌশলে কঠোর শাস্তির হাত থেকে বাঁচায় ইহুদীদের। এ ইহুদীরা ছিল বনু কায়নুকা গোত্রের। পুরো গোত্রকে বের করে দেয়া হয় মদীনা থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ জারি করেন, 'এরা মদীনা বা মদীনার আশেপাশের কোনো অঞ্চলে থাকতে পারবে না।'[২৬৬]

'একজন মুসলিম মহিলার কাপড় সরিয়ে অপমান করা হয়েছে' এ জন্য যুদ্ধ করতে যাওয়া, মুসলিম নারীর সম্মান বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়া—এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, এই ছিল সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-দের আদর্শ! অথচ আমাদের নেতারা আরও সুবিধা করে দিচ্ছে যেন কাফির-মুশরিকরা নির্বিঘ্নে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করতে পারে। ঘাঁটি গাড়ার জায়গা দিচ্ছে, লজিস্টিক সাপোর্ট দিচ্ছে।

নারীর সম্মান রক্ষার জন্য মুহাম্মাদ বিন কাসিম বা মু'তাসিমের যুদ্ধের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বন্দী মুসলিমদের উদ্ধার করতে হবে এই চিন্তা, এই দায়িত্ববোধ আমাদের পূর্ববর্তী শাসকদের রাতে ঘুমুতে দিত না। অথচ পূর্ব তুর্কিস্তানের কারাগারে আজ ৩০ লাখ মুসলিম বন্দী, চরম অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার; কিন্তু তবু কোনো মাথাব্যথা নেই আমাদের শাসকদের। উল্টো চীনের সাথে গিয়েই মাখামাখি, ঘষাঘষি, দোস্তি করছে তারা!

মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম অনেক উৎসাহ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> *'বন্দীদের মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, আর অসুস্থদের দেখতে যাও।'*[২৬৭]

মালিকি এবং হাম্বলী মাযহাবে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা বাধ্যতামূলক। আর শাফেঈ মাযহাবে কাফিরদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে।[২৬৮]

---

[২৬৬] আর রাহীখুল মাখতুম, সফিউর রহমান মুবারকপুরি, বনু কাইনুকার অঙ্গীকার ভঙ্গ অধ্যায়।
[২৬৭] বুখারি : ৫৬৪৯
[২৬৮] মাশারী আল-আশওয়াক্ব ইলা মাসারী আল-উশাক্ব, ইমাম ইবনু নুহাস (মৃত্য. ৮১৪ হিজরি)

উমার বিন আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ কনস্টান্টিপোলে কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলিমদের কাছে চিঠি লিখলেন,

'আসসালামু আলাইকুম,

তোমরা নিজেদের বন্দী ভাবো, অথচ তোমরা বন্দী নও। জেনে রাখো, সাধারণ মুসলিমদের আমি যতটা সাদাকার অর্থ দিই, তার চাইতেও অনেক বেশি আমি তোমাদের পরিবারকে দিই। আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠালাম। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ওদের হাতে ৫ দিনার করে দিয়েছি। যদি এই ভয় থাকত না যে, রোমান যালিমরা তোমাদের কাছ থেকে পাঠানো অর্থ কেড়ে নেবে, তাহলে আমি আরও অনেক বেশি অর্থ পাঠাতাম। আর আমি অমুক অমুক লোককে পাঠিয়েছি যেকোনো মূল্যে তোমাদের মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য। সুতরাং, আনন্দিত হও।'[২৬৯]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

'মুসলিমদের অবশ্যই অন্য মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করতে হবে—তাদের সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও।'

উমার বিন আবদুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

'যদি একজন মুসলিম যুদ্ধবন্দী তার মুক্তির জন্য মুসলিমদের কাছে অর্থ চায়, তাহলে তা প্রদান করা মুসলিমদের জন্য ফরজ হয়ে যায়।'

ইমাম আবু বাকর ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

'...(যদি মুসলিম বন্দীরা নির্যাতিত হয়) তাহলে আমাদেরকে তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের একটি হলেও চোখ খোলা থাকবে (অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত), যতক্ষণ আমাদের খরচ করার মতো সম্পদ থাকবে ততক্ষণ এ জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'[২৭০]

সৌদি, কুয়েত, আরব আমিরাতের কি টাকার অভাব আছে? উম্মাহর কি টাকার অভাব আছে? আছে সামরিক শক্তির অভাব? অভাব আছে অস্ত্রশস্ত্র, জনবল, পারমাণবিক বোমার?

কোনো কিছুরই অভাব নেই। অভাব শুধু একটা জিনিসেরই—ঈমানের। 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' এর। ভ্রাতৃত্ববোধের। একটু তুলনা করে দেখুন সালাফদের সাথে আমাদের

---

[২৬৯] প্রাগুক্ত
[২৭০] প্রাগুক্ত

নেতাদের আচরণের। এত বেঈমানী করার পরেও, এতবড় অপরাধ করার পরেও কী এরা আমাদের নেতা হবার যোগ্যতা রাখে? মুসলিম শাসক হিসেবে আখ্যা পাবার যোগ্যতা রাখে?

এই কি তাদের উম্মাহর প্রতি ভালোবাসা? এরাই কি তবে উম্মাহর অভিভাবক? এদের হাত ধরেই কি উম্মাহ বিজয়ী হবে? এদের সম্মান করতে হবে? এদের আনুগত্য করতে হবে? যারা নির্লজ্জের মতো এদের সাফাই গায় তাদেরকে 'আল্লামা' আর 'স্কলার' বলে সম্মান করতে হবে?

বিশ্বাস করতে বলেন এই কথা?

মুসলিম ভাই-বোনদের হত্যা করা হচ্ছে এটার চাইতেও উইঘুরদের ব্যাপারে কিছু বললে, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে যাবে এই চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বলেছিলেন মুসলিমরা এক দেহের মতো, দেহের এক অংশে ব্যথা পেলে অন্য অংশও সেই ব্যথার তীব্রতা অনুভব করবে। আমাদের কথিত মুসলিম শাসকরা, আর আমরা নামধারী গরু খাওয়া মুসলিমরা কি হতে পেরেছি সেই উম্মাহর অংশ? সেই এক দেহের অংশ?

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে এলেন মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে। তখন যদি মদীনার আওস আর খাযরায গোত্র ভাবত এই লোককে আশ্রয় দিলে বাকি আরব গোত্রগুলো আমাদের ওপর অবরোধ আরোপ করবে। আমরা ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হব। কাজেই দরকার নেই মুহাম্মাদকে আশ্রয় দেবার। প্রয়োজন নেই সাহায্য করার। তাহলে কী হতো চিন্তা করুন। যদি তাঁরা আমাদের স্বার্থপর নেতাদের মতো চিন্তাভাবনা করতেন, তাহলে হয়তো উনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তুলেই দিতেন কুরাইশদের হাতে। ইসলাম থেমে যেত সেখানেই।

আসলে সারাদিন 'ইয়া উম্মাহ!' 'ইয়া উম্মাহ!' বলে বুক চাপড়ালেও, মুখে ফেনা তুলে ফেললেও দিনশেষে সালমান, ইমরান বা এরদোগানদের কাছে বড় হলো রাজনীতি আর 'ক্ষমতা'। ক্ষমতার কাছে, নিজের স্বার্থের কাছে হেরে যায় উম্মাহবোধ। উম্মাহর প্রতি ভালোবাসার দাবি মাথা নিচু করে বিদায় নেয়, দুচোখ মুছতে মুছতে।

সহীহ আকিদাহ, খিলাফত পুনরুদ্ধার, কাশ্মীরা কা আজাদি এসব রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে খুব ভালো, মানুষ আবেগাপ্লুত হয়। ভোটব্যাংক হৃষ্টপুষ্ট হয় কিংবা সিংহাসন মজবুত হয়; কিন্তু উম্মাহর নারীদের গণধর্ষণ ঠেকানো যায় না।

খান সাহেব কাশ্মীর নিয়ে জাতিসংঘে বক্তব্য দেন। আমরা স্ক্রীনের সামনে কাত হয়ে যাই। কাত হতে হতে মুগ্ধ হয়ে তব্দা খেয়ে যাই–'বাবারে বাবা! কী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা!

এর হাত ধরেই কাশ্মীরের মুসলিমরা মুক্ত হবে!'

সৌদি সরকার 'হালাল' নাইটক্লাব খোলে, 'হালাল' সিনেমা হল খোলে, 'হালাল' কনসার্টের আয়োজন করে, 'হালাল' ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করে। আমরা মারহাবা মারহাবা বলে চেঁচিয়ে উঠি রাজা, রাজপুত্রের প্রশংসায়। বাহরে বাহ! উম্মাহ এবার শিখে যাবে প্রগতি। ক্ষ্যাত, মধ্যযুগীয়, বর্বর ট্যাগ ঝেড়ে-মুছে ফেলে উম্মাহ এবার আধুনিক হবে! এবার স্বাধীন হবে ফিলিস্তিন, সিরিয়া। ড্রোন হামলায় মারা পড়বে না শিশুরা। আফগান আর ইয়েমেনে ধর্ষিত হবে না বোনেরা। সমাধান হয়ে যাবে উম্মাহর সকল সমস্যার।

ওদিকে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শোনান রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। নয়া খলিফার তিলাওয়াত শুনে আমরা আশায় বুক বাঁধি, এই তো ক'দিন পরেই খিলাফাতের ঘোষণা চলে আসবে বুঝি! আবারও মুসলিম উম্মাহ ফিরে পাবে তার হারানো গৌরব!

আমরা কিউট কিউট মুসলিমরা কিউট কিউট আশায় বুক বেঁধে মুগ্ধ হয়ে তব্দা খেয়ে দিন পার করি; কিন্তু রোহিঙ্গাদের জন্য পাঠানো এরদোগানের জাহাজভর্তি সৈন্য আর নোঙর ফেলে না আরাকানে। আসিফারা হিন্দুদের হাতে নির্যাতিত হতে হতে খুন হয়ে যায়। আফিয়া সিদ্দিকী অ্যামেরিকান কুত্তাদের হাতে ধর্ষিত হতেই থাকে। সহীহ, সহীহ বোমার আঘাতে লাশের পাহাড় জমে ইয়েমেনে...

বাবা-মা হারিয়ে রহমাতুল্লাহ শেরবিকেরা মারা যায় বরফে জমে।

পাঁচ লাখ শিশু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে বোর্ডিং স্কুল নামের কারাগারে!

জীবন্ত উইঘুরদের শরীর থেকে কেটে নেওয়া হয় কিডনি, ফুসফুসস, কর্নিয়া।

আব্দুওলীরা বিশ জন হান পুরুষের হাতে গণধর্ষিত হয়।

১০ লাখ হান চাইনিয পুরুষ জিভ চাটতে চাটতে ওঠে উইঘুর বোনদের বিছানায়।

ডানাভাঙা একটা প্রজাপতি মরে পড়ে থাকে ল্যাভেন্ডারের নষ্ট বাগানে!

সরল অংক

'উইঘুরসহ বিশ্বের আনাচে-কানাচে নির্যাতিত সকল মুসলিমের জন্য আমাদের করণীয় কী?' খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নের জবাবে আমরা প্রায় একটা কথা শুনতে পাই,

'দু'আ করতে হবে'।

বড় বড় সেলিব্রেটি শায়খরাও আবেঘন লেকচারে বলেন, ফেইসবুক পোস্ট দেন, 'আমরা তোমাদের ভুলিনি, তাহাজ্জুদের দু'আ আর চোখের পানি নিয়ে ঠিকই আছি তোমাদের পাশে'...

আরাফার ময়দান।

পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন মুসলিমরা। দু'আ কবুলের এই বিশেষ সময়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছেন সবাই একসঙ্গে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম ঘণ্টার পর ঘণ্টা জুড়ে আল্লাহর কাছে চোখের পানিতে ফরিয়াদ করে যাচ্ছেন–

'ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, তুমি আল-আকসা আমাদের ফিরিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, ইহুদীদের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করো। ইয়া আল্লাহ, উম্মাহর মুসলিমদের তুমি যুলুমের হাত থেকে বাঁচাও।'

উম্মাহ গত পঞ্চাশ বছর ধরে করেই যাচ্ছে এই দু'আ। ফিলিস্তিনকে ইহুদীরা আরও বেশি চেপে ধরছে! কাশ্মীর, আরাকান, সিরিয়া, ওয়াযিরিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সোমালিয়া, মালি, চেচনিয়া, কম্বোডিয়া[২৭১], ফিলিপাইন... মুসলিমদের রক্ত

---

[২৭১] Cambodia: The Forgotten Genocide Of The Muslim Minority. AFP, Spetember 8th, 2015. https://tinyurl.com/y5wlmsqa

ঝরছে এমন ভূখণ্ডের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

কেন হচ্ছে এমন?

মুসলিমরা নির্যাতিত-নিপীড়িত হবে, তাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায়-অবিচার করা হবে, আমরা কিছু না করে চেয়ে চেয়ে দেখব আর আল্লাহর কাছে দু'আ করব—ব্যস তাতেই হয়ে যাবে?

হুজাইফা বিন ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

'আমার প্রাণ যার হাতে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করবে, না হয় শিগগিরই আল্লাহ তোমাদের ওপর নিজ আযাব পাঠাবেন। এরপর তোমরা তার কাছে দু'আ করবে; কিন্তু তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করবেন না।'[২৭২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের জন্য কি শুধু দু'আই করে যেতেন? সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুম-রা কি কেবল দু'আই করে যেতেন? শুধু দু'আই করে যেতেন উমার বিন আবদুল আযীয, নুরউদ্দীন যিংকি, সালাহউদ্দীন আইয়ুবীরা? মু'তাসিম বা মুহাম্মাদ বিন কাসিমও কি মুসলিম বোনের সম্মান রক্ষার জন্য শুধু দু'আই করে গিয়েছিলেন? আর কিছু করেননি? শুধু কি দু'আ করে গিয়েছিলেন ইযযুদ্দিন আল-কাসসাম, উমার আল-মুখতার, শামিল বাসায়েভ, মুল্লাহ উমার?

আসলে আমরা এগুলো জানতে চাই না, ভাবতে চাই না। যদি জানি তাহলে হয়তো আগের মতো নির্বিঘ্নে, নির্ভাবনায় জীবনযাপন করতে পারব না। যদি ভাবি তাহলে মন একটু হলেও খচখচ করবে। একটু হলেও দায়িত্ববোধ পোড়াবে আমাদের।

আচ্ছা একটা দৃশ্যের কথা চিন্তা করুন তো, আপনার মা-বোনকে কাফিররা পাশাপাশি বিছানায় ধর্ষণ করছে—যেমনটা নাসাকা করেছিল রোহিঙ্গাদের, যেমনটা গুজরাটে করেছিল বজরঙ্গ দল আর বিজেপির গুন্ডারা। আপনার ছোট ভাইকে বেয়নেট দিয়ে চিরে ফেলেছে, আপনার বাবাকে জবাই করে মাথা ঝুলিয়ে রেখেছে। ঘরে আগুন দিয়েছে, আপনার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, দিনে রাতে অসংখ্যবার ধর্ষণ করছে তাকে পুলিশ...। এই অবস্থায় আপনি পাগলের মতো সাহায্য চাইছেন আমার কাছে। আমি আপনার প্রতিবেশী, আপনার মুসলিম ভাই। কালিমার বাঁধনে আমরা আটকা, রক্তের বন্ধনের চাইতেও সে বন্ধন অনেক বেশি শক্তিশালী।

---

[২৭২] তিরমিজি।

আমি কিছুই করলাম না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। কিছুই করছি না। না, কিছু করছি না বলা ঠিক হবে না। আমি দু'আ করছি। অনেক, অনেক দু'আ করছি। তারপর ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি নিজের কাজে। নিজের জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায় সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকছি...

আপনি আমাকে কী বলবেন?

এখন ভাবুন তো রোহিঙ্গা, উইঘুর, কাশ্মীরি, পাকিস্তানি, আফগানি, সিরিয়ান, ইরাকীরা আমাদের মতো নিষ্ক্রিয় ভাইদের নিয়ে কী ভাবে? কী ভাবা উচিত তাদের? কতটা অভিমান জমেছে তাদের বুকে?

আবেগঘন ভাষায় আমাদের আলিমরা জানান মুসলিম উম্মাহর জন্য দু'আ করা ছাড়া উনাদের আমাদের কিছুই করার নেই। আসলেই কি কিছু করার নেই? তাতারদের ফিতনাহর সময় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কী শুধুই দু'আ করেই গিয়েছিলেন? ক্রুসেইডারদের আগ্রাসনের সময় কি শুধু দু'আই করে গেছেন উম্মাহর আলিমগণ?

আমাদের আলিমরা সৌদির সরকাদের দিকে আঙুল তুলে বলুক, কেন তুমি এমন করলে? প্রশ্ন তুলুক মিশর, আরব আমিরাতের আর পাকিস্তানের সরকারের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও। উম্মাহকে শুনিয়ে দিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করলে তাদের বিধান কী। উম্মাহ জানুক মোহরের প্রলোভনে পড়ে মুসলিমদের কাফির-মুশরিকদের হাতে যারা তুলে দেয় তাদের বিধান কী। উম্মাহ জানুক বন্দী মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব কী। নির্যাতিত মুসলিম নারীদের ব্যাপারে দায়িত্ব কী। মুসলিমদের নাযায, রোযা, হাজ্জ এমনকি কুরআন তিলাওয়াত করতে না দেয়া কাফিরের বিরুদ্ধে করণীয় কী। কুরআনকে বদলে ফেলার সদম্ভ ঘোষণা দেয়া কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করার হুকুম কী।

পূর্বসূরি আলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ তারা নাই-বা করতে পারলেন, অন্তত এটুকু তো করতে পারেন নবীর ওয়ারিশ হিসেবে। কিন্তু কই? কে আছেন তা করার মতো?

প্রিয় পাঠক, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি না, আমরা উম্মাহর নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমদের জন্য দু'আ করব না। আমরা অবশ্যই অবশ্যই দু'আ করব। তাহাজ্জুদে দু'আ করব। দু'আ মুমিনের হাতিয়ার। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মাথাতে রাখব, এই যে আমরা দু'আ করছি চোখের পানিতে ভিজিয়ে—সেই দু'আ যেন আল্লাহর দরবার থেকে ফিরে না আসে। সেই দু'আ যেন আল্লাহ কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনে নিয়ে দু'আ কবুল করার যে শর্ত আমাদের জানিয়ে দিলেন হুজাইফা বিন

ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহু, সেই শর্ত যেন আমরা পূরণ করতে পারি।

উম্মাহকে ভালোবাসেন, উম্মাহর রক্তক্ষরণে নিজেদের হৃদয়েও অহর্নিশি রক্ত ঝরে এমন অনেক ভাই আছেন যারা প্রতিবাদের পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেন মিটিং-মিছিল। রাজপথের স্লোগানে স্লোগানে মুক্তি চান নির্যাতিত মুসলিমদের। সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অবশ্যই এগুলোর দরকার আছে। কিন্তু এগুলো কখনো চূড়ান্ত সমাধান দেবে না। একই চক্রে ঘুরপাক খাবে।

ইরাকে যখন অ্যামেরিকা আগ্রাসন চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন খোদ পশ্চিমেই এর বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল মিছিল হয়েছিল। তাতে কি কিছু বদলেছে? লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ দিয়ে কি একজন ইরাকি শিশুর জীবনও বাঁচানো গেছে? আরাকানে যখন রোহিঙ্গাদের কচুকাটা করা হচ্ছিল, যখন কাশ্মীর দখল করে নিচ্ছিল মোদী বাহিনী, তার আগে-পরে অনেকে জায়গা অনেক মিটিং-মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন হয়েছে। ফলাফল কী? শেষমেশ কী পেয়েছি আমরা? আমাদের হয়তো আশ্বাস দেয়া হয়েছিল– সমস্যার সমাধান করা হবে। সেই আশ্বাস আটকে গিয়েছে জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংস্থার মিটিং আর সেমিনারে। কূটনৈতিক জটিলতায়। এদিকে ঠিকই ধর্ষিত হয়েছে আমাদের বোনেরা, মায়েরা, মেয়েরা। ঠিকই খুন হয়েছে আমাদের বাবা আর ভাইয়েরা। আমরা পারিনি আমাদের বোনদের রক্ষা করতে। আমরা পারিনি আমাদের ভাইদের বাঁচাতে।

একজন সুস্থ স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির মানুষ কি এখনো বিশ্বাস করবে যে এভাবে সমস্যার সমাধান হবে? জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিংবা অন্য কোনো অসংজ্ঞায়িত রক্ষাকর্তা উড়ে এসে আমাদের রক্ষা করবে? এভাবে কি ক্রুসেইডারদের হাত থেকে জেরুসালেম উদ্ধার হয়েছিল? এভাবে কি তাতারদের তরবারি থেকে উম্মাহ রক্ষা পেয়েছিল?

তাহলে উম্মাহর সমস্যার সমাধান কিসে?

আল্লাহর সত্য নবী, উম্মাহর আসল অভিভাবক রাসূলুল্লাহ ﷺ ১৫০০ বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছেন সমস্যা আর সমস্যার সমাধান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘শীঘ্রই মানুষ তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে অন্যকে আহ্বান করে।’

জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হব?’

তিনি বললেন, ‘না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত; কিন্তু তোমরা সমুদ্রের

ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায়। এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দেবেন।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আল-ওয়াহ্হান কী?'

حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'[২৭৩]

আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! আমাদের অন্তরে আসলেই ওয়াহ্হান ঢুকে গিয়েছে। দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসায় ছেয়ে গিয়েছে আমাদের অন্তর। আমরা কোনোমতেই কিছুতেই দুনিয়ার একটু সুখ, একটু সুবিধা ছাড় দিতে রাজি না। একচুলও না।

উইঘুর বোনদের ধর্ষণ করা হচ্ছে তাতে আমাদের কী, আমার বোনকে তো আর ধর্ষণ করা হচ্ছে না।

কাশ্মীরে পেলেটগান দিয়ে কিশোর-যুবকদের চোখ ঝাঁজরা করে দেয়া হচ্ছে আমার কী, আমার চোখ তো ভালো আছে।

ভারতজুড়ে মুসলিমদের গরু খাওয়ার অভিযোগে পিটিয়ে মারা হচ্ছে তাতে আমার কী, আমি তো সুখেই আছি। রোহিঙ্গাদের জবাই করে লাশ নদীতে ভাসানো হচ্ছে, এনআরসি আর ক্যাব করে হাজার হাজার মানুষকে বাংলাদেশে ঢোকানোর পাঁয়তারা হচ্ছে, তাতে আমার কী। আমার স্বজনদের তো আর পিটিয়ে মারা হচ্ছে না, জবাই করা হচ্ছে না, ঘরছাড়া করা হচ্ছে না।

এগুলো নিয়ে বলতে গেলে বা কিছু করতে গেলে বিসিএসের পুলিশ ভেরিফিকেশনে তো আটকে যাব, সরকারি চাকরিটা তো আর হবে না, বেলা বোসও অন্য কোনো ক্যাডারের হাত ধরে চলে যাবে...!

কী দরকার বাপু এতসব ঝামেলা পোহানোর! জান বাঁচানো ফরজ!

আফগানিস্তানে যখন জর্জ বুশ টনকে টন বোমা ফেলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছিল তখন ইরাকের ওরা ভেবেছিল আমাদের কী, আমরা তো নিরাপদেই আছি। কিছু করতে গেলে অযথা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছন্দপতন ঘটবে। তার চাইতে বরং শুধু দু'আ করি। কিছুদিন পর ইরাক যখন ছারখার হচ্ছিল অ্যামেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর হাতে তখন সিরিয়া, ইয়েমেনের মুসলিমরা ভেবেছিল আমাদের কী? আমাদের দেশ তো আর

---

[২৭৩] সুনানু আবি দাউদ ও মুসনাদু আহমাদ।

ধ্বংস হচ্ছে না। ব্যারেল বোমার আঘাতে হাজার হাজার শিশুর লাশ দেখে হয়তো ভুল ভেঙেছিল সিরিয়ানদের। বুঝেছিল যখন আফগানিস্তান, ইরাক জ্বলছিল তখন তাদেরও অনেক কিছুই এসে গিয়েছিল। বুঝেছিল অনেক দায়িত্ব ফাঁকি দিয়ে এসেছে তারা। রোহিঙ্গাদের গণহত্যা, কাশ্মীরিদের গণহত্যা বা উইঘুরদের গণহত্যা দেখে আমরা চুপ করে আছি। কোনো একরাতে ভিনদেশি শত্রুরা আমাদের মা-বোনদের বিছানায় উঠলে বা আমাদের ভাই আর বাবারা অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের মেশিনগানে ঝাঁজরা হয়ে গেলে হয়তো আমাদের ভুল ভাঙবে সিরিয়ান-ইরাকীদের মতো। কিন্তু তখন কিছুই করার থাকবে না।

ইতিহাস পড়ে দেখুন, যখন আমাদের অন্তরে ওয়াহ্‌হান ছিল না, যখন আমরা মুসলিমরা আদি ও আসল ইসলামের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলাম। 'ঠান্ডা রক্ত' কিংবা রাজনৈতিক হিকমাহর দোহাই টেনে আপসকামিতা যখন ছিল না আমাদের মধ্যে, যখন 'শুনলাম এবং মানলাম' এই ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য, যখন আমরা পুরুষ ছিলাম–তখন আমাদের নারীদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর আগেও দশবার চিন্তা করত কাফিররা।

নববী আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি, আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ–আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর আল্লাহর জন্য ঘৃণা–ভুলে গেছি আমরা। যাদের সাথে আমাদের বারাহ–বিদ্বেষ ও শত্রুতা–করা উচিত ছিল তাদেরকে বুকে টেনে নিয়েছি আর দূরে সরিয়ে দিয়েছি তাদেরকে যাদের টেনে নেওয়া উচিত ছিল বুকে।

উম্মাহর প্রকৃত বীরদের আমরা চিনতে ভুল করেছি। যাদের কাছে মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জতের কোনো মূল্য নেই, দাম নেই মুসলিম শিশুর চোখের জলের, যারা মুসলিমদের রক্ত নিয়ে বাণিজ্যিক লেনদেনকে রুটিন ব্যাপার বানিয়ে ফেলেছে–কিছু রাজনৈতিক স্টান্টবাজি আর আবেগী বক্তব্য শুনে আমরা উম্মাহর অভিভাবকের আসনে বসিয়েছি তাদেরকেই। তাদের নিয়েই আমরা স্বপ্ন দেখি আল-আকসা একদিন আমাদের হবে, একদিন কাশ্মীর উপত্যকা মুক্ত হবে, সিরিয়ার উড়বে কালেমার পতাকা, ছোট্ট শিশু কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চাইবে না 'জান্নাতে কি রুটি পাওয়া যায়', কাফির-মুশরিকদের কারাগারে আফিয়া সিদ্দিকীরা আর ধর্ষিত হবে না...

মিথ্যের ভিত্তিরও ওপর গড়ে ওঠা এই স্বপ্ন চিরকাল অধরাই থেকে যাবে। কখনো বাস্তব হবে না।

অন্যদিকে আমরা আগন্তুক বানিয়ে রেখেছি সেইসব মানুষদের যারা কেবল মুসলিম মায়ের বুকে তার হারানো সোনা মানিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য, বোনের চোখের জল মুছে দেয়ার জন্য, বাবার জায়নামাজের যমিন শ্বেতশুভ্র করার জন্য জীবন বাজি

ধরেছেন। সকল আরাম-আয়েশ, স্বাদ-আহ্লাদ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কেবল মুসলিমদের সম্মান ফেরানোর জন্য আল্লাহকে সাক্ষী করে বেরিয়ে পড়েছেন পৃথিবীর পথে। ইনসাফের ফুল ফোটানোর জন্য, শিশুর ফোকলা দাঁতের একটা হাসির জন্য যারা হেঁটে চলেছেন কাঁটাভরা বন্ধুর পথে। যারা আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর কালেমার পতাকাতে উড্ডীন করার জন্য দুনিয়ার সব সুখ-শান্তি-নিশ্চয়তাকে পায়ে ঠেলেছেন।

তাঁদেরকে আমরা বানিয়েছি অচেনা, অপরিচিত, অনাকাঙ্ক্ষিত। অবহেলা, ঘৃণা, ক্রোধে অভিযোগের আঙুল তুলেছি তাঁদের দিকে, যারা পৃথিবীর কোনো প্রান্তে যেন একজন মুসলিমের একফোঁটা রক্তও না ঝরে তার জন্য হাসিমুখে নিজেদের দেহের সব রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছেন।

উম্মাহর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি বোধহয় এটাই!

প্রিয় পাঠক, আরও অনেক কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। কষ্টের অনেক কথা অকথিতই থেকে গেল। কিন্তু আপাতত থামতে হচ্ছে এখানেই। কত গল্প আসছে মনের মাঝে। আকিকাত, নুরলান, গুলসান, আফিয়া, আসিফা, ফাতিমা... কত নাম ঘুরছে মাথার ভেতর। কত ব্যথাতুর চেহারা ভেসে উঠছে চোখের সামনে, কত বিধবা আর অসহায় মা-বোনদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কাশগড়, উরুমচি, আরাকান, দিল্লী-গুজরাট, আসাম, কাশ্মীর, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক... রক্তাক্ত কত মুসলিম জনপদ! থাক সেসব কথা। মনের ভেতরেই লুকিয়ে থাক। অপ্রিয়, অস্বস্তিকর সত্যের সাথে বোঝাপড়া করতে গেলে স্রেফ পাগল হয়ে যেতে হবে।

আব্দুওলীকে বিশ জন পুরুষ মিলে ধর্ষণ করার পরদিন সকালে ৩ জন পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমরা তোদের সাথে এ রকম করছি, তোরা যদি কখনো ক্ষমতায় যাস কী করবি আমাদের সাথে?'

প্রশ্নটা ভাবার মতো...

আসলেই, কী করা উচিত ওদের সাথে?

যতটা জল ঝরেছে উরুমচি-কাশগড়-ঘুলঝার রাজকন্যাদের চোখে, যতটা কেঁদেছে উইঘুর মা আর শিশুরা, যতটা ভীষণ আক্ষেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে উইঘুর বাবারা—তার হিসেব চীনারা কীভাবে চুকোবে?

কীভাবে?

আমাদের মতো কাপুরুষের দলে ভরে গেছে উম্মাহ। জাতীয়তাবাদের ফিল্টারে আটকে গেছে আমাদের মানবতাবোধ। আমরা চুড়ি পরে বসে আছি ঘরে, আমাদের নেতারা রাজনৈতিক চাল চেলে, হিকমাহর দোহায় দিয়ে, আর মৌসুমী আবেগের ব্যবসা করে মুখে তালা দিয়ে বসে আছে। চিরকালই কি এমন থাকবে? নোনাজল কি কখনোই ঘুমুতে দেবে না উইঘুর রাজকন্যাদের?

চীন যা করেছে মুসলিমদের সাথে তারপর পৃথিবী আর আগের মতো থাকবে না। থাকবে না কখনোই। এই উম্মাহ পুরোপুরি পুরুষশূন্য হয়ে যায়নি এখনো। এমন কিছু মানুষ আছে এখনো যাদের অন্তরে ওয়াহ্হান রাজত্ব করে না। আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করে নিয়েছেন। যারা আল্লাহকে ভালোবাসেন আর আল্লাহও যাদেরকে ভালোবাসেন। যারা মুসলিমদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর। কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া যারা করেন না। যারা মানুষের মনগড়া তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। মানচিত্রের আঁকিবুঁকি আর লাল-নীল-সবুজ বিচিত্র রঙের পতাকার গোলামি যারা করে না। যাদের ভ্রাতৃত্ব আর মানবতাবোধ কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা না।

এইসব অপরিচিত, অচেনা, আগুন্তুকদের বুকের সেই আগুনে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে চীন। আজ না হয় কাল। কাল না হয় পরশু।

ওরা আসবে। রক্তের সমুদ্র সাঁতরে, ধ্বংসপাহাড় পাড়ি দিয়ে, দ্রোহের আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে, মাটিকে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করে...ওরা আসবে।

..রহমাতুল্লাহ, আফিয়া, আসিফাদের জন্যে...

আজ হোক, কাল হোক...ওরা আসবে

সীমান্ত ভেঙে আবার নতুন করে সীমান্ত গড়া হবে। ইতিহাসের মূল্য চুকাতেই হবে চীনাদের। একদম কড়ায় গন্ডায়।

মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া, কাশ্মীর থেকে জেরুসালেম, কাশগড় থেকে কাচিন, বাবরি থেকে আকসা–আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল ﷺ-এর পতাকার নিচে এমন এক বাহিনী প্রস্তুত হবে যাদের হাতে সব ঋণ পরিশোধিত হবে।

ইন শা আল্লাহ!

ওরা আসবে...